ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের ইতিবৃত্ত

লেখক

অধ্যাপক শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই চৈত্র, ১৪০০
২৯শে মার্চ, ১৯৯৪

মুদ্রাকর ঃ বসাক প্রিণ্টার্স, ১৯নং প্রসাদ নিয়োগী লেন, ভদ্রেশ্বর।

ব্লক নির্মাতা ঃ এস এন স্টুডিও, কলিকাতা।

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ চন্দন বসু, ভদ্রেশ্বর।

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ

অধ্যাপক শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তপন কুমার সাহা

অজয় বসু

ভূপতি ঘোষ

সুরেশচন্দ্র খাঁ

শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পাঁচু সাধুখাঁ

ইতিহাস গ্রন্থ উপ-সমিতি ঃ

সভাপতি—অধ্যাপক শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আহ্বায়ক—তপন কুমার সাহা

শিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অজয় বসু

ভবতোষ পাল

ভূপতি ঘোষ

সুরেশচন্দ্র খাঁ

ভগবান দাসগুপ্ত

পাঁচু সাধুখাঁ

রাধানাথ নিয়োগী

দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

শঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সমীর ঘোষ

মুখবন্ধ

নিজেকে ও নিজ পরিবেশকে জানার আগ্রহ বোধ করি সকল মানুষেরই আছে। আর তা জানার চেষ্টা করতে গিয়ে অতীতকে জানার কথাও এসে পড়ে। আমাদের ছোট শহর ও তাকে ঘিরে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্মবৃত্তান্ত ও তার ক্রমবিকাশের ধারাকে আমরা "ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের ইতিবৃত্ত" নামক এই গ্রন্থে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

ভদ্রেশ্বর পৌরসভার ১২৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাক্ষরতা, সম্প্রীতি ও গণউদ্যোগ প্রসারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা গত ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সারা বছর ধরে ধাপে ধাপে বিভিন্ন কর্ম্মসূচী পালন করেছি। এই গ্রন্থ প্রকাশনার উদ্যোগও ঘোষিত কর্ম্মসূচীর অঙ্গীভূত।

আমাদের এই জনপদ একদিকে যেমন সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জনক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত তেমনি অন্যদিকে বৈষ্ণব ধর্মের উদ্গাতা শ্রীচৈতন্যদেব ও কুসংস্কারবিরোধী উদার ধর্মের প্রচারক এ্যান্টনি কবিয়ালের স্মৃতিও আমাদের প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান। এই জনপদের ভৌগলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক অবস্থার আলোচনা যেমন গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে, তেমনি ঐতিহাসিক কারণে এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে যে জনবিন্যাসের পরিবর্তন হয়েছে তাও এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই গ্রন্থটি যদি কৌতুহল সৃষ্টিতে সাহায্য করতে সক্ষম হয় তবে আমাদের প্রয়াস সার্থক হল বলে মনে করব। প্রতিটি প্রয়াসের ক্ষেত্রেই যেমন পরিমার্জন ও উন্নয়নের

সুযোগ থেকে যায় আমাদের এই প্রয়াসও তা থেকে ব্যতিক্রম নয়। পাঠকদের পরামর্শে আগামী দিনে এই গ্রন্থটিকে সমস্ত রকম অপূর্ণতার ঊর্দ্ধে তুলতে পারব এই আশা রাখি।

এই গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং ইতিহাস গ্রন্থ--উপসমিতির সমস্ত সদস্যসহ অন্যান্য বিদগ্ধ মানুষ যাঁদের পরামর্শে ও তথ্যে এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের সকলকে জানাই সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। উৎসব উদ্‌যাপন সমিতির সদস্য ও সকল পৌরকর্ম্মীকে তাঁদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

ফটো

ক. ভদ্রেশ্বরনাথ মন্দির, ভদ্রেশ্বর।

খ. শিবমন্দির, মানকুণ্ডু।

গ. অন্নপূর্ণা মন্দির, তেলিনীপাড়া।

ঘ. বড় মসজিদ, তেলিনীপাড়া।

দলিলের ছবি

ক. কৃষ্ণপটীর প্রাচীন নাম শ্যামবাটি সংক্রান্ত

খ. কেদার রায়ের গৃহদেবতা সংক্রান্ত

গ. তেলিনীপাড়ার পশ্চিম বাহিনী ঘাট সংক্রান্ত

মানচিত্র

ক. ষোড়শ শতকের মানচিত্র

খ. দ্বারিক জাঙ্গাল ও চৈতন্যপথের মানচিত্র

ভদ্রেশ্বর নাথের মন্দির,
ভদ্রেশ্বর।
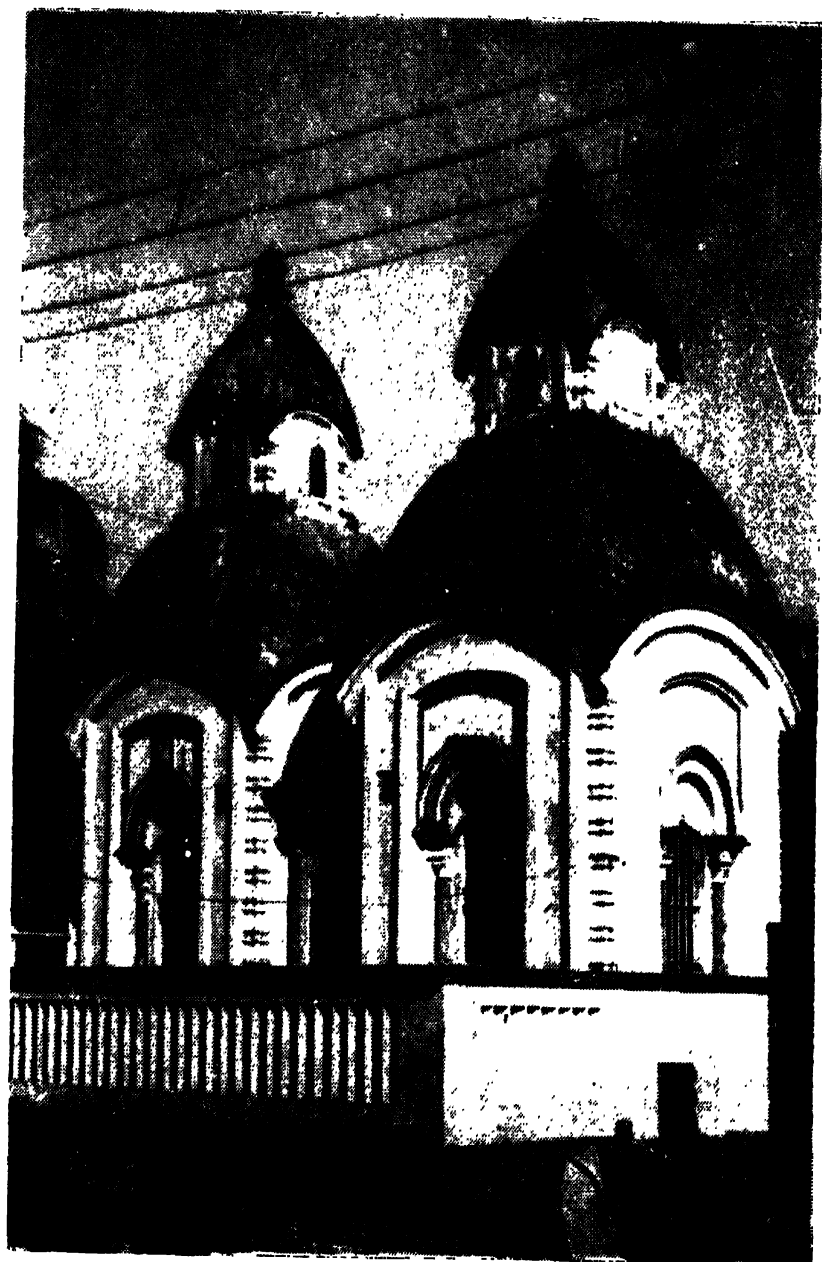
মহাকালেশ্বর ও অর্ধ-নাভীশ্বর শিবমন্দির,
মানকুণ্ডু।
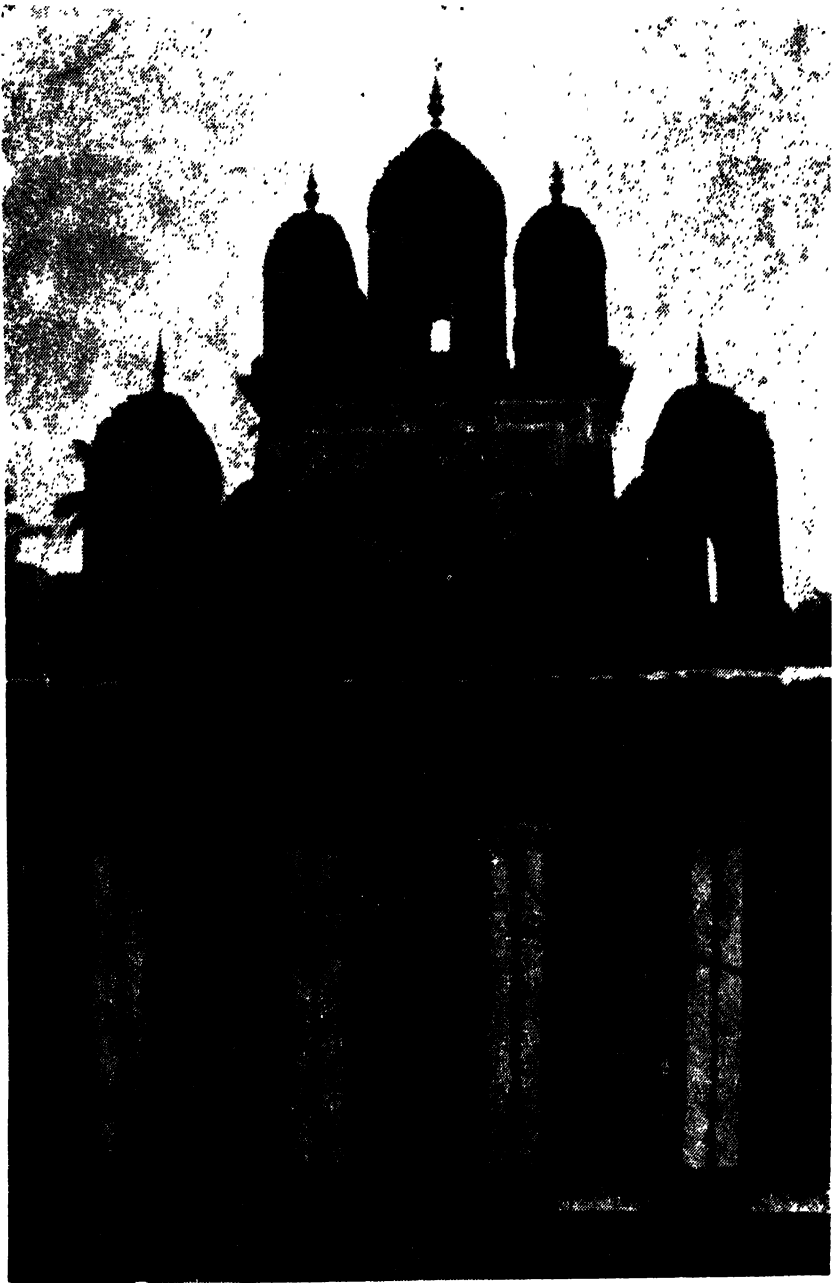
অন্নপূর্ণা মন্দির,
তেলিনীপাড়া।

বড় মসজিদ,
তেলিনীপাড়া।

3) 4 family idols in the house of the well known khan family of Vill - Mankundu, District Hooghly (viz. Sree Sree Durgamata, Sree Sre Sreedhar Jew, Sree Sree Maha Kaleswar and Sree Sree Ardha Naviswar) happened to be the benificiaries of this Trust Estate.

The cheation of this Trust had a solid back ground in history.

These 4 idols happened to belong to the house-hold of Raja Kedar Roy. After his defeat at the hands of the muslim invaders, Kedar Roy distributed his covated family idols amongst his trusted friends to avoid desercreation of the idols as well as to ensure the seva puja of the said idols in safe hands.

A forefather of the khan family of Mankundu after obtaining the 4 idols from Raja Kedar Roy had them brought to Mankundu and installed in separate temples constructed for the said purpose. Since then the idols had continued to be worshipped by the khan family with due pomp and grandeur coupled with great devotion without any devia--tion and break.

কৃষ্ণপাটীর প্রাচীন নাম শ্যামবাটি সংক্রান্ত

কেদার রায়ের গৃহদেবতা সংক্রান্ত

১১। তেলিনীপাড়া গ্রামের মধ্যে ঁ ভাগীরথির পশ্চিম ধারে পশ্চিম বাহিনী
নামক স্থানে আমাদের পূর্ব্ব বংশোদ্ভব মথুরা মোহন খাঁ মহাশয়ের কৃত বাঁধা
ঘাট ও চাঁদনি ও ঁ ঈশ্বরবাসের ঘর যাহা বহুপূর্ব্বে ঁ ভাগীরথির ভাঙ্গনে
একেবারে শূন্য হইয়া পরে ক্রমশঃ ঐ স্থান হইতে চড়া পড়িয়া ঁ ভাগীরথির বেগ
অর্থাৎ বহোতাস্রোত বহু দূরস্থ হইয়া এক্ষণে ঐ ঘাটের উপরিভাগে কোন কোন
জায়গায় ঐ বাঁধাঘাট আদি থাকায় চিহ্ন মাত্র আছে সুতরাং বহুকাল হইতে
ঐ বাঁধাঘাট অভাবে ঁ স্নানাদির জন্য সাধারণের যাতায়াত যে হইতেছে
তাহা সময়ে সময়ে অত্যন্ত ক্লেশজনক হইয়াছে, এক্ষণে ঐ ঘাট পুনঃস্থাপনের
নিমিত্ত নিম্নলিখিত হইতে চেষ্টা করিয়া ঐ মথুর মোহনের উত্তরাধিকারি ঐ
ঘাটের জায়গার সত্ব ত্যাগ করিলে আমাদের ঐ এজমালি ইষ্টেটের আয় হইতে
ঐ পশ্চিম বাহিনী নামক জায়গার উপর পূর্ব্ববৎ বাঁধাঘাট ও চাঁদনি ও
ঁ ঈশ্বরবাসের ঘর তৈয়ার করাইয়া আমি ঁ রামধনুর খাঁ আমার পিতা ও
আমি শ্রীকানাই লাল খাঁ ও আমি শ্রীবলদেব খাঁ আমাদের পিতামহ ঁ ভবানি
চরণ খাঁ মহাশয়ের স্বর্গার্থে ঐ ঘাট আদি প্রতিষ্ঠা করাইতে হইবেক ।

তেলিনীপাড়ার পশ্চিম বাহিনী ঘাট সংক্রান্ত

ষোড়শ শতকে গঙ্গা ও সরস্বতী নদীর প্রবাহপথ।

মানচিত্রে তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর ও গরুটির উল্লেখ আছে
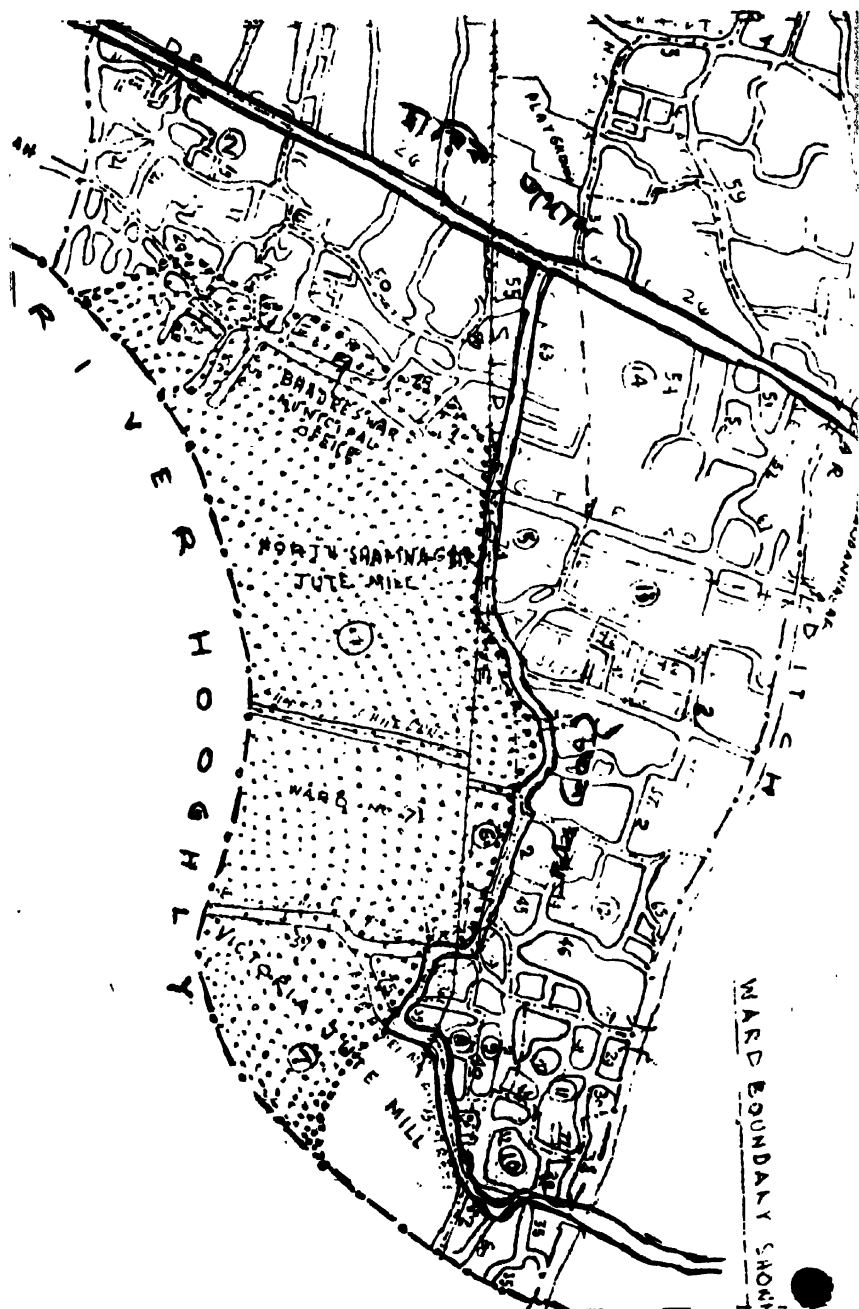
দ্বারিক জাঙ্গাল, চৈতন্য পথ ও গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ পথ।

প্রথম অধ্যায়

ভৌগোলিক পরিচয়

হুগলী জেলার চন্দননগর মহকুমার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্ভুক্ত তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর ও মানকুন্ডু একটি প্রাচীন জনপদ। পার্শ্ববর্তী চন্দননগরের চাপে পড়ে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য হারাতে বসেছে। ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে অবস্থানের দরুন এর ভূমিখণ্ড মূলত নদীবাহিত পলিমাটিতে গঠিত। ভাগীরথী নদী এই স্থানের পূর্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত। এই অঞ্চলের ভূমি সে কারণে আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে এসে নদীতে মিশেছে। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচয় দিতে গিয়ে এ ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। আমরা চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর ও সিঙ্গুর থানার ভূ-প্রকৃতি আলোচনা করে এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির পরিচয় দেব। আলোচ্য তিনটি থানারই সমস্ত অংশ বিভিন্ন নদীবাহিত পলিমাটিতে গঠিত। ভাগীরথী, সরস্বতী ও দামোদরের বিভিন্ন শাখা এই অঞ্চল গঠনে সাহায্য করেছে। নদীগুলির গতিপথ বিভিন্ন দিকে হওয়ার জন্য এই অঞ্চলের ভূমির ঢালও বিভিন্নমুখীন। ভাগীরথী ও সরস্বতী দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম পথে বয়ে গেছে। অপরদিকে দামোদরের বিভিন্ন শাখা পূর্ব ও পূর্বোত্তর মুখে প্রবাহিত হয়েছে। প্রায় বিপরীতমুখীন নদীবাহিত পলিমাটিতে এই অঞ্চল গঠিত হওয়ার জন্য সমগ্র অঞ্চলের ভূমি সর্বত্র সমতল নয় এবং জমির ঢালও ভাগীরথী অভিমুখীন নয়।

সিঙ্গুর থানার উত্তরপূর্ব দিকে চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর থানার

পশ্চিমদিকে বেশ কিছুটা নিম্নভূমি এ অঞ্চলের জলনিকাশী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। দামোদরের শাখা নদী কানা দামোদর, কুন্তী, ঘিয়া ইত্যাদি নদী বারবার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। তাদের পরিত্যক্ত খাত পরবর্তীকালে জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। প্রায় সারা বৎসর ঐ অঞ্চল শুষ্ক থাকলেও বর্ষাকালে জল জমে গিয়ে ঝিল বা বিলে রূপান্তরিত হয়। ঐ নিম্নাঞ্চলকে বিভিন্ন ভেড়ী নামে অভিহিত করা হয়। আবদ্ধ জলনিকাশী ব্যবস্থা নানা সময়ে নানাভাবে করা হলেও এখনো সম্পূর্ণভাবে ঐ অঞ্চল জমা জলের সমস্যা থেকে মুক্তি পায়নি। বৈদ্যবাটীর খাল এবং কিছুদিন পূর্বে কাটা ডি. ভি. সি.'র খাল বৈদ্যবাটী ষ্টেশনের উত্তর দিকে রেলপথ অতিক্রম করে গৌরহাটী গ্রামের মধ্য দিয়ে ভাগীরথী নদীতে এসে মিশেছে।

একদা প্রবলস্রোতা সরস্বতী দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম বাণিজ্যপথ ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী থেকে এর জলপ্রবাহ ক্ষীণ হতে হতে বর্তমানে ক্ষুদ্র পরিসর নালায় পরিণত হয়েছে। বর্ষাকাল ছাড়া সরস্বতী নদীতে অনেক অংশে জল থাকে না। সরস্বতী নদী মৃতপ্রায় হওয়ার ফলে এ অঞ্চলে শুধু জলনিকাশী ব্যবস্থাই নয়, স্বাস্থ্য ও জনবিন্যাসের ক্ষেত্রেও গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। অবরুদ্ধ মৃতপ্রায় সরস্বতী নদী সংস্কারের জন্য একটি প্রাদেশিক সমিতি গঠিত হয়। সমিতির সভাপতি ছিলেন হুগলী জেলার সুসন্তান স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও আমাদের জেলার আরও অনেক সমাজসেবী ঐ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমাদের অঞ্চলের সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঐ নদী সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রচুর অর্থ ও স্বেচ্ছাশ্রম দান করেও সরস্বতী নদীর প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব হয়নি। ভাগীরথী নদী পূর্বে অনেক শক্তিশালী নদী ছিল। কিন্তু দামোদরের গতি পরিবর্তিত হবার ফলে ভাগীরথী নদীর জলের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। আমাদের আলোচ্য অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির উপরে প্রত্যক্ষভাবে ভাগীরথী নদীর জলহীনতা প্রভাব বিস্তার করেছে। তেলিনীপাড়া

ও ভদ্রেশ্বরের এক তৃতীয়াংশ পূর্বে নদীগর্ভে ছিল। এখন থেকে মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্বে নদী ক্রমশ সংকুচিত হয়ে তেলিনীপাড়ার দক্ষিণ অংশে এক বিরাট চরভূমির সৃষ্টি করে। কালক্রমে সেই চরভূমি আরো উন্নত হয়ে জনবসতিতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এখনো পার্শ্ববর্তী উচ্চখণ্ড হতে ঐ অঞ্চল যে বেশ নিম্ন তা বোঝা যায়।

ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের জমির ঢাল সরাসরি পূর্বমুখী হয়ে ভাগীরথী নদীতে মিশেছে। চন্দননগর অঞ্চলের ভূমির ঢাল বেশ কিছুটা বৈচিত্র্য-পূর্ণ। শহরের নদীতীরবর্তী অংশের পূর্ব দিকে ঢাল কিন্তু শহরের মধ্যবর্তী অংশের ঢাল পশ্চিম মুখে। চন্দননগর শহরের তিনদিকের সীমানা পরিখার দ্বারা বেষ্টিত। সাধারণভাবে ঐ পরিখাকে গড় বলে অভিহিত করা হয়। চন্দননগরের বেশ কিছু অংশের জল পশ্চিমমুখী হয়ে ঐ গড়ে এসে মেশে। চন্দননগরের জলনিকাশী ব্যবস্থার এটি একটি সমস্যা। আমাদের মূল আলোচ্য অঞ্চলের ভূমি নদীবাহিত পলিতে গঠিত হবার জন্য প্রায় সর্বত্র সমতলভূমি। ভাগীরথীর পরিত্যক্ত নিম্নাঞ্চল ব্যতীত সর্বত্রই সমতল।

১৯৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভদ্রেশ্বর পৌরসভার প্রকাশিত পুস্তিকা হতে জানা যায় যে সমগ্র পুরসভার আয়তন ৬'৪৭৫ বঃ কিমি। ভদ্রেশ্বর পুরসভার উত্তর সীমানায় গড় নামক পরিখা এবং চন্দননগর শহর। পূর্বে ভাগীরথী নদী। দক্ষিণে চাঁপদানী পুরসভা অঞ্চল। পশ্চিমে বিঘাটি ও খলিসানী পঞ্চায়েত অঞ্চল। শহরটি উত্তর দক্ষিণে এক থেকে তিন কিলোমিটার লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিমে তিন, থেকে চার কিলোমিটার চওড়া।

এ অঞ্চলের সীমানা পরিবর্তন ও আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে দুটি কারণে। প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারণ। তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বরের গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে কখনও নদীর ভূমিক্ষয়ের ফলে আয়তনের হ্রাস আবার কখনও চর পড়ার জন্য আয়তনের বৃদ্ধি ঘটেছে। প্রাচীনকালে এই ঘটনা কতবার ঘটেছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে একথা বলা যায় যে প্রাচীনকালে হুগলী নদীর জলের পরিমাণ বেশি থাকার জন্য

নদীর গভীরতা ও প্রসারতা অনেক বেশি ছিল ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সময় গঙ্গার একবার ভাঙ্গন ও পরবর্তীকালে চর পড়ার প্রামানিক তথ্য পাওয়া যায় মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবারের একটি দলিল হতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্থায়ীভাবে ঐ চরভূমি বসবাসের যোগ্য হয়ে ওঠে। ভদ্রেশ্বরের উত্তরপূর্বে এবং তেলিনীপাড়ার দক্ষিণে বিস্তীর্ণ নবোত্থিত ভূমি আমাদের অঞ্চলের সীমা ও আয়তনের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

রাজনৈতিক কারণে যে পরিবর্তন হয়, তা ঘটে ব্রিটিশ ও ফরাসীদের মধ্যে সীমানা পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের ফলে। চন্দননগরের সীমানা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের প্রথম চেষ্টা করেন ফরাসী ডিরেক্টর -জেনারেল দিরোয়া। তিনি ১৭৩০ খ্রীঃ ফরাসী সীমানা পরিখা দ্বারা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে ফরাসী শাসক মঃ শেভালিয়ে ১৭৬৯ খ্রীঃ ফরাসী অধিকারের তিনদিকে পরিখা খনন করেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ ৩১শে মার্চ তারিখে ইংরেজ ও ফরাসী কর্তৃপক্ষ সীমানা রদবদল ঘটিয়ে এক চুক্তি করেন। ঐ সীমানা নির্ধারক চুক্তিপত্রে ফ্রান্সের প্যারী নগরে ফ্রান্সের রাজার পক্ষে দ্রুয়্যা দে লুই এবং ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পক্ষে মিঃ কাউলে চুক্তি সই করেন।

শেষোক্ত এই চুক্তির ফলে তেলিনীপাড়া, পাইকপাড়া, কৃষ্ণপটী ও মানকুণ্ডুর সীমানার গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে কৃষ্ণপটী ফরাসী অধিকারভুক্ত বারাসাত (চন্দননগর) অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষ্ণপটীর দক্ষিণে ফরাসী সীমানা বরাবর পরিখা ছিল। যার কিছু কিছু চিহ্ন আজও দেখা যায়। সীমানা বরাবর একটি পূর্বমুখী খাল যে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অবধি প্রসারিত ছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

চুক্তির ফলে সমগ্র কৃষ্ণপটী অঞ্চল ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। বিনিময়ে পাইকপাড়া ও তেলিনীপাড়ার উত্তরাংশ ফরাসী অধিকারভুক্ত হয়ে বারাসাত (চন্দননগর) ও গোন্দলপাড়ার অঙ্গীভূত হল। সমগ্র দিনেমারডাঙ্গা অঞ্চল তেলিনীপাড়ার অঙ্গহানি ঘটিয়ে ফরাসী এলাকাভুক্ত হল। মান-কুণ্ডুর পূর্ব দিকের বেশ কিছু অংশ ফরাসী সীমানাভুক্ত হল। চন্দননগরের

উত্তরাঞ্চলেও পরিবর্তন ঘটলো, তবে ঐ পরিবর্তনের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ-ভাবে জড়িত নই। সীমানা রদবদলে লাভ-লোকসান কার হল সেটা বড় কথা নয়। রাজায় রাজায় সীমানা বদল ঘটিয়ে নলখাগড়া রূপ পাইক-পাড়া ও তেলিনীপাড়ার প্রাণ গেল। পাইকপাড়া তেলিনীপাড়ার হস্তচ্যুত উত্তর অংশ তেলিনীপাড়ার জমিদার সত্যশান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমিদারী-ভুক্ত ছিল। জমিদারী সেরেস্তায় ঐ অঞ্চলের নাম ছিল শান্তিনগর মহল। জমিদারী কাগজপত্রে আজও ঐ নাম বজায় আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এবং সামরিক পটভূমিকার পরিচয়

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিচয় দিতে গিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত করতে হবে। কারণ কোন ক্ষুদ্র জনপদের নিজস্ব রাজনৈতিক পরিচয় থাকা সম্ভব নয়। প্রাচীনকালে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চল উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। অজয় নদের দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলকে বলা হত দক্ষিণ রাঢ় বা সুহ্ম দেশ। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে চোল বংশীয় রাজা রাজেন্দ্র চোল-এর দিগ্বিজয়ী বাহিনী ভাগীরথীর তীরবর্তী ত্রিবেণী অঞ্চল পর্যন্ত জয় করেছিল। দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূর ও ধর্মপালকে পরাজিত করে রাজেন্দ্র চোলের বাহিনী উড়িষ্যার সীমানা থেকে ভাগীরথীর পূর্বতীর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল দখল করে। কথিত আছে, রাজেন্দ্র চোল ত্রিবেণীর গঙ্গাতীরে একটি স্নানের ঘাট নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। অবশ্য বিজয়ী চোল বাহিনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ আবার স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন।

বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত টলেমির ভূগোলবৃত্তান্তে দক্ষিণ রাঢ়কে দুটি ভাগে ভাগ করে বলা হয়েছে—একটি গঙ্গারিডি এবং অপরটি তামালুতিস (তাম্রলিপ্ত)। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত বরাহ-

মিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' নামক গ্রন্থে বঙ্গভূমির অংশ হিসাবে সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত এবং বর্ধমান নামক অঞ্চলের নাম করা হয়েছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণীতে কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তির বিবরণ রয়েছে।

নবম-দশম শতাব্দী নাগাদ পাল ও সেন রাজবংশের সময়ে বাংলাদেশকে দুটি প্রশাসনিক বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। —পৌন্ড্রবর্ধনভুক্তি ও বর্ধমানভুক্তি। আমাদের আলোচ্য অঞ্চল বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভুক্তি বর্তমান যুগের বিভাগের সমতুল্য। ভুক্তির পরবর্তী প্রশাসনিক অঞ্চলকে বলা হত বিষয়। বিষয়কে ভাগ করা হত মণ্ডল ও বীথিতে। বীথির অন্তর্গত ছিল পাটক। পাটক বা পল্লী ছিল সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক অঞ্চল। পাল ও সেন রাজত্বে বাংলাদেশের নানা অঞ্চল থেকে নানা তাম্রশাসন ও শিলালিপি পাওয়া গেছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য ভূখণ্ডে হিন্দুযুগের শিলালিপি বা কোন তাম্রশাসন পাওয়া যায়নি।

মধ্যযুগে মুসলমানী আমলে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক বিভাগ ছিল সুবা। এবং তার অন্তর্গত ছিল সরকার। হুগলী জেলার সমগ্র পূর্বভাগ সরকার সাতগাঁওয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জেলার অপর দুটি সরকারের নাম সরকার সেলিমাবাদ ও সরকার মান্দারণ। ভাগীরথী নদীর উভয় তীর সরকার সাতগাঁওয়ের অন্তর্গত ছিল। এই সরকার উত্তরে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর অঞ্চল হতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বে নদীয়া জেলা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার পশ্চিমাংশ আর হুগলীর পূর্বাংশ সরকার সাতগাঁওয়ের অন্তর্গত ছিল। এই সরকারের প্রশাসন কেন্দ্র ছিল সাতগাঁও বা প্রাচীন সপ্তগ্রাম বন্দর-নগরী। পাঠান যুগে সপ্তগ্রাম ছিল দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক রাজধানী। মুসলমান-পূর্ব যুগে যেমন ত্রিবেণী বা বিজয়পুরে সেন রাজাদের জয়স্কন্ধাবার বা আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র ছিল।

কিংবদন্তীমূলক আঞ্চলিক ইতিহাসে সিঙ্গুর বা সিংহপুর অঞ্চলের কিছু রাজা ও রাজবংশের উল্লেখ আছে। 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক

গ্রন্থের "সপ্তম জাঙ্গাল বিবরণ" অংশে বর্ণিত হয়েছে—"দক্ষিণ রাঢ়ের ভাগীরথীর পশ্চিম তটে কুলপাল ও দেবপাল নামে দুই রাজা ছিলেন। হরিপাল ও অহিপাল নামে কুলপালের দুইটি পুত্র জন্মলাভ করে। অহিপালের বৈদ্যজাতীয়া এক পত্নী ছিলেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার কৃতধ্বজ, বিভাণ্ড ও কেশীধ্বজ নামে তিন পুত্র জন্মে। কৃতধ্বজ সপ্তগ্রামের রাজা হইয়া বৈদ্যগণের প্রতিপালক হইয়াছিলেন। কৃতধ্বজের পুত্র বিরল সুগন্ধা গ্রামে (চুঁচুড়া অঞ্চলে) বাস করেন। বিভাণ্ড বাণ রাজার মন্ত্রী হন। তাঁহার বংশধরগণ জগন্দলে বাস করিতেন।"

ধর্মমঙ্গল কাব্যে হরিপাল রাজার উল্লেখ আছে। হরিপাল রাজার নামানুসারেই হরিপাল গ্রামের নামকরণ। উপরোক্ত কাহিনী ঐতিহাসিক কিনা এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা বিচার বিবেচনা করুন। আমরা কিং-বদন্তীর অন্তরালে কিছুটা সত্য থাকে—এটা ধরে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি।

সিঙ্গুর বা সিংহপুর অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করে গেছেন। পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধদের 'মহাবংশ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে সিংহপুর বা সীহাপুরের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেন। অবশ্য বিজয়সিংহ আদৌ বাঙালী না গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন—এ নিয়ে আধুনিক যুগে তর্ক উঠেছে। তর্কের পূর্ণ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সিঙ্গুরকেই প্রাচীন সিংহপুর ধরে নিচ্ছি। সিঙ্গুর অঞ্চলে কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ঐ অঞ্চলের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে উল্লিখিত হরিপাল রাজা এবং 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে উল্লেখিত হরিপাল—একই ব্যক্তি কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু সিঙ্গুর অঞ্চলে হিন্দু যুগে নানা রাজবংশ যে রাজত্ব করেছিলেন—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পাঠান রাজদের যুগে ইলিয়াসশাহী বংশের উল্লেখযোগ্য সুলতান ছিলেন সিকান্দার শাহ। যাঁর সঙ্গে দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহের যুদ্ধ হয়। সিকান্দার শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রাগুলি সোনারগাঁও, সাতগাঁও, মুয়াজ্জামাবাদ প্রভৃতি স্থানের টাঁকশালে মুদ্রিত হয়। এ থেকে বোঝা

যায় ঐ যুগে সাতগাঁও বা সপ্তগ্রামে একটি টাঁকশাল ছিল। চুঁচুড়া শহরের পশ্চিমদিকে মোল্লাসিমলা গ্রামে সিকান্দার শাহের একটি শিলা-লিপি পাওয়া গেছে। মোল্লাসিমলা শিলালিপিতে অবশ্য সুলতানের নাম নেই। তবে মুখলিস্ খান নামে এক রাজকর্মচারীর উল্লেখ আছে। পাঠান যুগে সাতগাঁও শুধুমাত্র প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল না। মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তারের একটি প্রধান কেন্দ্রও ছিল।

পাঠান সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক শাহের শিলালিপি হুগলীর ত্রিবেণী অঞ্চলে পাওয়া গেছে।

পাঠান রাজত্বের শেষদিকে সরস্বতী নদী বৃহৎ বাণিজ্যতরণী বহনে অক্ষম হলে সপ্তগ্রাম বন্দরের পতন ঘটে। ঐ অঞ্চলের বণিককুল হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর অঞ্চলে তাদের ব্যবসাবাণিজ্যকে সরিয়ে নিয়ে আসেন। সপ্তগ্রাম নগর অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠলে ঐ অঞ্চলের আঞ্চলিক শাসনকর্তা তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র ভাগীরথী নদীতীরে হুগলীতে স্থানান্ত-রিত করেন। মোগল যুগে হুগলী ফৌজদারের শাসনকেন্দ্র ছিল। যদিও সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও যেভাবে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক রাজধানীর মত ছিল, সেই গৌরব হুগলী কোনদিন অর্জন করেনি। তবুও হুগলীর ফৌজদার বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ফৌজদার থেকে পৃথক সম্মানের অধিকারী ছিলেন। হুগলীর ফৌজদার সরাসরি সুবে বাংলার নায়েব-নাজিমের অধীন ছিলেন। দেওয়ান বা অন্যান্য উচ্চ রাজকর্মচারীরা ফৌজদারের কাজের জবাবদিহি করতে পারতেন না। হুগলীর ফৌজদার-গণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। হুগলীর সর্বশেষ ফৌজদার ছিলেন খান জাহান খাঁ। সংক্ষেপে খাঞ্জা খাঁ। তাঁর ব্যক্তিগত জমিদারী ছিল তেলিনীপাড়া ও গোন্দলপাড়া অঞ্চল। ফরাসী, দিনেমার ও ইংরেজ বণিকরা চন্দননগর ও তেলিনীপাড়া অঞ্চলে জমির ইজারা গ্রহণ করতেন হুগলীর ফৌজদারের কাছ থেকে।

পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশের দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হয়। তখনো

শাসন ও বিচারবিভাগ বাংলার নবাবদের হাতে ছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই শাসন ও বিচারবিভাগ ইংরেজদের অধীন হয় এবং মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। হুগলীর ফৌজদারের পদ লুপ্ত হয়। খান জাহান খাঁ-ই হুগলীর শেষ ফৌজদার।

ইংরেজ আমলে মুসলমানী যুগের প্রশাসনিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগ ভেঙে জেলা ও মহকুমা গঠিত হয়। সরকার সাতগাঁওয়ের বিরাট অঞ্চল ভেঙে দিয়ে নদীয়া, ২৪ পরগণা ও বর্ধমান জেলার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন—পূর্বে হুগলী বা হাওড়া পৃথক জেলা ছিল না। দুটি জেলাই বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ছিল। পরবর্তীকালে শাসনকার্যের সুবিধার্থে হুগলী ও হাওড়াকে নিয়ে একটি পৃথক জেলা করা হয়। আরো পরবর্তীকালে হুগলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হাওড়া একটি পৃথক জেলার মর্যাদা পায়। কিন্তু জেলার পরবর্তী স্তরে ভূমি ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় মুসলমানী আমলের বিভাগ আজো বর্তমান আছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জেলার পরবর্তী স্তরে মহকুমা ও থানা। কিন্তু ভূমিব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মুসল-মানী আমলের পরগণা ও মৌজা ইত্যাদি বিভাগ আজো চলে আসছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমাদের অঞ্চল হুগলী জিলার চন্দননগর মহকুমার ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত অঞ্চল। ভূমি ও ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে এ অঞ্চল বোর ও আর্শা পরগণার অন্তর্গত কয়েকটি মৌজা নিয়ে গঠিত। মৌজাগুলির নাম—তেলিনীপাড়া, পাইকপাড়া, মানকুণ্ডু, ভদ্রেশ্বর ইত্যাদি।

সামরিক পটভূমিকা

এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস ও জনবিন্যাসের প্রকৃতি ভালোভাবে অনুধাবন করে আমাদের ধারণা হয়েছে যে, তেলিনীপাড়ার উৎপত্তি মূলত সামরিক কারণে। প্রধান জলপথ ও রাজপথ

তেলিনীপাড়ার বুকের উপর দিয়ে যাওয়ার জন্য অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চল ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্র। তেলিনীপাড়া, পাইকপাড়া ও কৃষ্ণপটী নামকরণের পশ্চাতে সামরিক ইতিহাস লুকোনো আছে। বিভিন্ন সময়ে সৈনিকদের আবাস হিসেবে তেলিনীপাড়া, পাইকপাড়া ও কৃষ্ণপটীর খ্যাতি ছিল। কিন্তু এযাবৎ কোন পাকাপোক্ত বা প্রতিষ্ঠিত সামরিক কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিছুদিন পূর্বে একটি শব্দ হতে এযাবত অনালোচিত সামরিক ইতিহাসের একটি অধ্যায় খুঁজে পাওয়া গেছে। যে শব্দটি কিশোর বয়স থেকেই আমাদের মনে নানা প্রশ্নের উত্থাপন করেছিল, তা হল 'গড়ের ঘাট'। তেলিনীপাড়ার যে দুটি ফেরিঘাট আছে, তার একটিকে বলা হয় পাঁজারিপাড়ার ঘাট এবং অপরটি গড়ের ঘাট। তেলিনীপাড়ার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণের অক্ষয় তৃতীয়ার রথযাত্রা উপলক্ষে বেশ ঐতিহ্যপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান হয়। অন্নপূর্ণার মন্দির হতে প্রাতঃকালে শিব অন্নপূর্ণা মূর্তিকে রথে চাপিয়ে ঐ গড়ের ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। গড়ের ঘাটে রথ পুজো হয় ও সেই উপলক্ষে দীনদুঃখী কাঙালীভোজন হয়। রথটি যেখানে থাকে, সে স্থানটি কিন্তু গঙ্গাতীর হতে অন্তত দুশো গজ ভিতরে। অবশ্য জমির ঢাল ও পথের নিম্নাভিমুখীনতা দেখে একদিন যে গঙ্গা ঐখানে বইত, তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। রথযাত্রা ও ফেরিঘাট উপলক্ষে গড়ের ঘাট শব্দটি বহুকাল ধরেই প্রচলিত।

আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল—গড়ের ঘাটের গড় কোথায়? 'গড়' কথাটির প্রাথমিক অর্থ 'দুর্গ'। আমাদের অঞ্চলে অবশ্য গড় কথাটির দ্বিতীয় অর্থ গড়খাত বা পরিখা হিসাবে শব্দটির ব্যবহার আছে। ফরাসী সীমানার পরিখাকে আমরা সাধারণতঃ গড় বলে উল্লেখ করি। গড়ের ঘাটের কাছাকাছি কিন্তু ফরাসী সীমানা-পরিখা নেই। তাই আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এই গড় শব্দটি কীভাবে এল? অনুসন্ধান করতে করতে ইতিহাসের প্রায় অনালোচিত এক অধ্যায়ের সন্ধান মেলে।

ওম্যালি (O'Malley) সাহেব তাঁর "History of Bengal, Bihar & Orissa under British Rule" গ্রন্থে এই অঞ্চলের

ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"The Prussians established a factory a short distance south of Chandernagore. Their venture was short-lived, for they could not withstand the hostility of the other European Companies on whom, moreover, they were dependent for pilotage through the dangerous shoals of the Hooghly river and by 1760 the company was wound up."

প্রাশিয়ান তথা জার্মানরা 'ইস্টার্ণ জার্মান প্রাশিয়ান কোম্পানী' নাম দিয়ে এদেশে ব্যবসা করতে আসে এবং দিনেমারদের দিনেমারডাঙার কুঠির দক্ষিণে একটি কুঠি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে অস্ট্রিয়ান ও বেলজিয়ানদের মিলিত অস্টেণ্ড কোম্পানী ঐ অঞ্চলে কুঠি স্থাপন করে ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করে।

অস্টেণ্ড কোম্পানীর ব্যবসায়ীরা ইংরেজ, ফরাসী ও ডাচ বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে ইউরোপীয় মালপত্র বিক্রয় করতেন। আবার অপরদিকে এদেশীয় মালপত্র ন্যায্যমূল্যে কিনে বিদেশে রপ্তানী করতেন প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে। ব্যবসায়িক সততার জন্য অস্টেণ্ড কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্য দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে। এ অঞ্চলে ব্যবসারত অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরা ঈর্ষান্বিত হয়ে যাতে তারা ব্যবসা করার সনদ না পান সে ব্যাপারে নবাব দরবারে চেষ্টা চরিত্র করেন। সেই সময় বাংলার নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাই রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনায় তিনি অস্টেণ্ড কোম্পানীকে বাধা দেওয়া তো দূরের কথা তাদের উদারভাবে ব্যবসা চালাবার অনুমতি দেন। ইংরেজ ও ডাচ বণিকগণ প্রাথমিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলেও নিরুৎসাহিত না হয়ে জার্মান ব্যবসায়ীদের সর্বপ্রকার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেন। ইংরেজ ও ডাচ কোম্পানী কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ এনে জার্মানদের একটি মালবোঝাই জাহাজ অধিকার করে নেন।

১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর ফৌজদার হিসাবে পীর খাঁ কালোয়াৎ নিযুক্ত হন। তাঁকে ফরাসী ও ডাচ বণিকরা উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করে ফেলেন। ফৌজদার নবাব দরবারে অস্টেণ্ড কোম্পানীর দুর্গ নির্মাণের এক অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রেরণ করেন। মারাঠা বর্গীদের উৎপাতে সে যুগে ইউরোপীয় বণিকরা তাদের ব্যবসাস্থলে ছোটখাটো দুর্গ নির্মাণ শুরু করে দিয়েছিল। মারাঠা বর্গীদের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত নবাব সরকারের তাতে সায় ছিল। অস্টেণ্ড কোম্পানীও তেলিনীপাড়াস্থ তাদের কুঠিবাড়ি সুরক্ষিত করে একটি ছোটখাটো দুর্গ বানিয়েছিল। উৎকোচের মহিমায় কী না হয়! চুঁচুড়ায় ডাচেদের দুর্গ ছিল ফোর্ট গ্যাসটোভাস, চন্দননগরে ফরাসীদের ছিল ফোর্ট অরলেয়াঁ। সে ব্যাপারে ফৌজদার কোন উচ্চবাচ্য না করে জার্মানদের দুর্গ নির্মাণের ব্যাপারটিকেই গুরুত্ব দিলেন। তিনি নবাবকে জানালেন হুগলীর মোগল বন্দরের এত কাছে জার্মানদের দুর্গ রাখা নিরাপদ নয়। শুরু হয়ে গেল অস্টেণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে হুগলীর ফৌজদারের বিবাদ। জার্মানরা কিছুটা হঠকারিতা করে গঙ্গায় নবাবের নৌকো যাতায়াত বন্ধ করে দিল।

অস্টেণ্ড কোম্পানীকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য নবাব, নায়েব-ফৌজদার মীরজাফরের অধীনে একদল সৈন্য পাঠান। বিচক্ষণ সেনাপতি মীরজাফর দুর্গ অধিকার করা অসম্ভব বিবেচনা করে দুর্গের দুদিক ঘিরে সৈন্য সমাবেশ ঘটালেন। দুর্গের পূর্ব ও দক্ষিণ তীরে গঙ্গাবক্ষে নবাবী যুদ্ধজাহাজ অবরোধ সৃষ্টি করল। বিপদে পড়ে জার্মান সাহেবরা তাদের ইউরোপীয় জাতভাই ফরাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করল। ফরাসীরা 'দিচ্ছি দেব' করে সাহায্যের ভান করে সময় কাটাল কিন্তু কোন সাহায্য দিল না। খাদ্যাভাবে দুর্গবাসীরা বিপদে পড়ল। এদেশীয় পাইক সৈন্যরা কিছু-টা খাদ্যাভাবে আর কিছুটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। অদম্য জার্মানরা তবু আত্মসমর্পন না করে দুর্গের ভিতর থেকে কামান চালাতে লাগল। দুর্গমধ্যে মাত্র ১৩ জন জার্মান বণিক ছিলেন। তারা অত্যন্ত সুকৌশলে বেশ কয়েকদিন আত্মরক্ষা করে দুর্গ আঁকড়ে রইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের অধ্যক্ষের হাতে গোলা লাগায় তারা রাতের অন্ধকারে দুর্গ

ছেড়ে পালিয়ে গেল। পরদিন সকালে মীরজাফর অস্টেণ্ড কোম্পানীর কুঠি তথা দুর্গ অধিকার করে তা ধূলিসাৎ করে দেন। দুর্গের সামান্য ভিত্তিভূমি ছাড়া আর কোন চিহ্নই রইল না। অস্টেণ্ড কোম্পানীর তেলিনীপাড়ার দুর্গ ধ্বংস হবার ফলে জার্মানদের বাংলাদেশে ব্যবসা করার আশা চিরতরে ব্যর্থ হল।

রাত্রির অন্ধকারে অস্টেণ্ড কোম্পানীর কর্মচারীরা এ অঞ্চলে তাদের মূল ঘাঁটি বাঁকিবাজারে চলে গেলেন। ব্যারাকপুর ও পলতার উত্তরে বর্তমানে যেখানে ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি, সেই স্থানের পূর্ব নাম ছিল বাঁকিবাজার। অস্টেণ্ড কোম্পানী ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ স্থানটি দখল করে বারুদের কারখানা বানায়। হুগলীর ফৌজদারের বাহিনী কেবলমাত্র তেলিনীপাড়ার দুর্গ ধ্বংস করেই থামলেন না। তারা নদী পেরিয়ে অস্টেণ্ড কোম্পানীর মূল ঘাঁটি বাঁকিবাজার দখল করে নিলেন। জার্মান-অস্ট্রিয়ান বণিকরা বাঁকিবাজার ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁদের ফেলে যাওয়া ঘরবাড়ি, বারুদের কারখানা, ম্যাগাজিন নবাবী সৈন্য দখল করল।

তৎকালীন নবাবের সংগে ওলন্দাজ কোম্পানীর হৃদ্যতা ছিল। তাই ডাচেরা ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকিবাজারের মালিকানা পেল। ডাচেরাও ঐ পরিত্যক্ত দুর্গের জায়গায় নতুন করে একটি বারুদের কারখানা ও দুর্গ বানায়। পরবর্তীকালে পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর ওলন্দাজদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি নষ্ট করার জন বাঁকিবাজার দখল করে নেন। এরপর ঐ স্থান কয়েকবার হাত ফেরত হয়ে ইংরেজ ব্যবসায়ী ফারকুহার ঐ স্থানে নূতন করে বারুদ তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বারুদ তৈরির এজেন্ট ছিলেন। আরো পরে ঐ স্থানে বর্তমান ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি ও মেটাল এ্যাণ্ড স্টীল ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে বাঁকিবাজার নামটি পরিত্যক্ত হয়ে ইছাপুর নাম হয়েছে।

বাঁকিবাজারের উল্লেখ মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যে সমুদ্রগামী বণিকদের যাত্রাপথের পার্শ্ববর্তী স্থান হিসেবে উল্লেখ আছে। বাঁকিবাজারের ঠিক

বিপরীত দিকে গঙ্গার পশ্চিমতীরে গৌরহাটী বা গেরোটিতে ফরাসীদের একটি বাগানবাড়ি ছিল। গৌরহাটীর বেশ কিছুটা অংশ কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ফরাসীদের অধিকারে ছিল। আজো পূর্ব সম্পর্কের সূত্র ধরে স্থানটি চন্দননগর কর্পোরেশনের অংশ হয়ে আছে।

ভাগীরথী নদীপথের রাজনৈতিক, সামরিক ও বানিজ্যিক গুরুত্ব ছিল বলেই অতীতকালে এই নদীর উভয় তীরে বহু দুর্গ স্থাপিত হয়েছে ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি লাভের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে গেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় বারভুইঞাদের অন্যতম রাজা প্রতাপাদিত্য মোগল বাহিনী যাতে ভাগীরথী পেরিয়ে তার রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে, সে কারনে তিনি জগদ্দল-আঁটপুর অঞ্চলে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। প্রতাপাদিত্যের জগদ্দল দুর্গ স্থল ও নৌ-সৈন্যদের ঘাঁটি ছিল। শ্যামনগর স্টেশনের পূর্বদিকে কাউগাছি গ্রামে বর্ধমানের মহারাজারা একটি দুর্গ নির্মান করেছিলেন। বর্গীদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পরিবারের নারী ও শিশুদের সাময়িক আবাসস্থল হিসেবে কাউগাছি দুগ নির্মাণ করা হয়।

তেলিনীপাড়া—ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের নিকটে একটি যুদ্ধে ওলন্দাজদের বাংলাদেশে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যায়। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরকে নবাব করা হলেও ইংরেজ কোম্পানী তাকে শক্তিহীন করে রাখতে চেয়েছিল। মীরজাফর ইংরেজদের অভিসন্ধি বুঝতে পেয়ে গোপনে ডাচেদের সঙ্গে যড়যন্ত্র শুরু করেন। তিনি একটি ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে আরেকটি ইউরোপীয় শক্তির যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে চান। মীরজাফর ডাচেদের সর্বাঙ্গীন সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলে তারা যবদ্বীপের মূল ঘাঁটি থেকে সাতটি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে বাংলাদেশের উপকূলে থামে। ডাচেরা প্রচার করে দেয় আসলে জাহাজগুলি করমণ্ডল উপকূলে ডাচেদের অধিকৃত একটি ঘাঁটিতে যাবে। বিশেষ কারণে তারা বাংলাদেশের নদী জলপথে প্রবেশ করেছে। ঐ সাতটি জাহাজের তিনটিতে ছত্রিশটি করে কামান। বাকি তিনটিতে ছাব্বিশটি করে কামান এবং শেষ জাহাজটিতে ষোলটি কামান ছিল। ঐ জাহাজগুলিতে ১৫০০ ডাচ সৈন্য ছিল। ধুরন্ধর ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ ডাচেদের অভিসন্ধি

বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি কর্নেল ফোর্ডকে ডাচেদের নৌবহর ও সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করতে নির্দেশ দিলেন। মানকুণ্ডু গ্রামের মাত্র এক কিলোমিটার পশ্চিমে সরস্বতী নদীতীরে ব্যাজড়া গ্রামে ডাচ ও ইংরেজ সৈন্যদের যুদ্ধ হল। ম্যালকম সাহেব রচিত 'Decesive Battle of India' গ্রন্থে ব্যাজড়ার যুদ্ধের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। ম্যালকমের দক্ষিণ (ডান) বাহিনী ব্যাজড়ায় থাকে। বামবাহিনী একটি আম্রকুঞ্জে থাকে। সম্মুখবাহিনী সরস্বতী নদীর পাশে পরিখার মধ্যে অবস্থান করে। সবশেষে পশ্চাতে কামানগুলি সুরক্ষিত থাকে। ডাচেরা ইংরেজ সৈন্যের হাতে সম্পূর্ণ পরাভূত হল। এই পরাজয়ের ফলে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে ডাচেদের ব্যবসাবাণিজ্য ও রাজনৈতিক আধিপত্যের স্বপ্ন বিনষ্ট হয়। ম্যালকম সাহেব ব্যাজড়ার যুদ্ধের বিবরণ দিয়ে বলেছেন—"The action was short, bloody and decesive. In half an hour the enemy were completely defeated. The loss of the English on this occasion was comparatively trifling." এই যুদ্ধের জের টেনে শেষ পর্যন্ত ডাচেরা তাদের ভারতবর্ষের অধিকৃত স্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্র ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে যবদ্বীপ, সুমাত্রায় তাদের ব্যবসাবাণিজ্য সীমাবদ্ধ রাখল। ডাচেদের অধিকৃত চুঁচুড়া, বাঁকিবাজার (ইছাপুর), কালিকাপুর (কাসিমবাজার), বরানগর ও বালেশ্বর ইংরেজদের হাতে তুলে দিল। এই হস্তান্তর ঘটে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে।

জার্মান-অস্ট্রিয়ানদের ব্যবসাবাণিজ্য ও রাজনৈতিক আধিপত্যের স্বপ্ন তেলিনীপাড়ার অস্টেণ্ড কোম্পানীর দুর্গের পাদমূলে যেমন শেষ হয়ে যায়, তেমনি ব্যাজড়া গ্রামের যুদ্ধে ডাচেদের স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। এই যুদ্ধ দুটি ক্ষণস্থায়ী এবং যুদ্ধ হিসেবেও খুব উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু এই দুটি যুদ্ধের পরিণতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মান-অস্ট্রিয়ান, ওলন্দাজ ও দিনেমাররা অপসারিত হল। ইংরেজদের ভারত বিজয়ের পথ কণ্টকমুক্ত হল।

এ অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের সৈন্যবাহিনীর একাংশকে চাঁপদানীতে স্থায়ী শিবির নির্মাণ করে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করেন। সেযুগের ইংরেজ সৈন্যের অর্ধেক থাকত পাটনায় আর বাকি অর্ধেক থাকত চাঁপদানীতে।

বাংলার নবাব মীরজাফর ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল আয়ার কূটকে চাঁপদানী গ্রামটি দান করেন। কর্নেল কূট তাঁর পত্নী সুশানা হাচিনসনকে নিয়ে এখানে বাস করতেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাট যুদ্ধের সময় কর্নেল পিয়ার্সের নেতৃত্বে যে বিরাট সৈন্যদল হায়দার আলির বিরুদ্ধে পাঠানো হয়, তার শেষ দলটিকে ওয়ারেন হেস্টিংস পর্যবেক্ষণ করেন চাঁপদানীর সেনা নিবাসে।

গোঁরহাটীতে ফ্রেঞ্চ গার্ডেনের ফরাসী কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা ও স্থানীয় শান্তি রক্ষার জন্য একদল ফরাসী সৈন্যের স্থায়ী ছাউনি ছিল ফ্রেঞ্চ গার্ডেনে।

উপরোক্ত যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণী হতে বোঝা যায় যে আমাদের অঞ্চলের প্রশাসনিক ও সামরিক গুরুত্ব ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রামের নামকরণ ও বিভিন্ন পল্লীর পরিচয়

আমাদের অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের নামকরণ প্রসঙ্গে তেলিনীপাড়া গ্রামের নামকরণ নিয়ে একটা সমস্যা থেকেই গেছে। কেউ বলেন তেলেঙ্গী-পাড়া থেকেই তেলিনীপাড়া, আবার কেউ বলেন তিলি বা তৈল ব্যবসায়ী তেলিদের বাসভূমি হিসাবে তেলিনীপাড়া। প্রথম দলের মতের পিছনে কিছু ইতিহাসসম্মত যুক্তি আছে। কিন্তু দ্বিতীয় মতের পিছনে কোন তথ্যগত যুক্তি নেই। অতীতে বা বর্তমানে তিলি বা তৈল ব্যবসায়ীদের বাসভূমি তেলিনীপাড়া ছিল না। সে কারণে দ্বিতীয় মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। ফরাসী ও দিনেমারদের ব্যবসাবাণিজ্যের মূল ঘাঁটি ছিল দক্ষিণ ভারতে। ফরাসীদের পণ্ডিচেরীতে আর দিনেমারদের ত্রাঙ্কোবারে। ঐ দুই অঞ্চলেই তামিলভাষীদের বাস। ফরাসী ও দিনেমাররা তাদের কুঠি ও ব্যবসাবাণিজ্য রক্ষা করার জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে সৈন্য সংগ্রহ করত। সেযুগে বাংলাদেশে দক্ষিণ ভারতীয়দের সাধারণ নাম ছিল তেলেঙ্গী। তেলিনীপাড়ার সেগুনবাগান ও কৃষ্ণপটী অঞ্চলে তেলেঙ্গী সৈন্যদের ব্যারাক ছিল। কালক্রমে তেলেঙ্গী সৈন্যদের পাড়া থেকে তেলেঙ্গীপাড়া ও আরো পরে তেলিনীপাড়ায় রূপান্তরিত হয়। পূর্বেই বলেছি, এই মতের পিছনে কিছুটা ইতিহাসসমর্থিত যুক্তি আছে। অন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত আপাতত আমরা নামকরণের এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করলাম।

বাংলাদেশের গ্রাম নাম বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও ইতিহাসগর্ভ। সুকুমার সেন ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ বাংলাদেশের গ্রামের নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। তাতে দেখা যায় সমনামে একাধিক গ্রাম বা শহর আছে। কিন্তু তেলিনীপাড়া নামের এ যাবত দ্বিতীয় নামের গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সাম্প্রতিককালে আমরা জানতে পেরেছি ব্যারাকপুর-বারাসত রাস্তায় নীলগঞ্জের পশ্চিমদিকে অর্থাৎ ব্যারাকপুরের দিকে বড় কাঁঠালিয়া গ্রাম আছে। ঐ কাঁঠালিয়া গ্রামের লাগোয়া তেলিনী-পাড়া বলে একটি অঞ্চল আছে। ঐ তেলিনীপাড়া অঞ্চলটি ব্যারাকপুর-বারাসত রোডের উপরে অবস্থিত। শ্রীকমল চৌধুরী প্রণীত "উত্তর ২৪ পরগণার ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থে চক কাঁঠালিয়া, বড় কাঁঠালিয়া ও তেলিনীপাড়া গ্রামের উল্লেখ রয়েছে। এই তেলিনীপাড়া পূর্বে উল্লেখিত ব্যারাকপুর-বাবাসত রোডের উপরে অবস্থিত তেলিনীপাড়া একই গ্রাম। আপাতত তেলিনীপাড়া সমনামে দ্বিতীয় তেলিনীপাড়া ব্যতীত আর কোন তেলিনীপাড়ার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

তেলিনীপাড়া ক্ষুদ্র জনপদ, হট্টবাপীসমন্বিত মহাগ্রাম নয়। মহাগ্রাম-এর বৈশিষ্ট্য—সেখানে বিভিন্ন পাড়ায় বিভিন্ন বৃত্তির লোকেরা জোটবদ্ধ হয়ে বাস করে। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে গুজরাট নগরের বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাগ্রামের এই বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন মহাগ্রামের বৃত্তিভিত্তিক পাড়া বা অঞ্চলের পরিচয় দিয়েছেন। তেলিনীপাড়ায় কিছুটা বৃত্তিভিত্তিক পাড়া ছিল এবং এখনো আছে। ঐ পাড়াগুলির নাম ব্যাখ্যা করলে অতীতের ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের জনবসতি ও জনবিন্যাসের ইতিহাস আলোচনাকালে পাড়ার নামগুলি বেশ কিছু তথ্যের যোগান দেবে। জনবিন্যাস সম্বন্ধে পৃথক অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব।

মানকুণ্ডু মৌজার কৃষ্ণপটী, পাইকপাড়া ও তেলিনীপাড়া—এই তিনটি অঞ্চল নিয়ে তেলিনীপাড়া গ্রাম গঠিত। এর আশপাশে নানা

অঞ্চল তেলিনীপাড়ার সঙ্গে কখনো যুক্ত, কখনো বিযুক্ত হয়ে এর সীমাকে বাড়িয়েছে বা কমিয়েছে। আমরা তিনটি মৌজার বিভিন্ন অঞ্চলের যে সব পাড়া আছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। মালাপাড়া, পাঁজারিপাড়া, সেগুনবাগান, তাঁতিপাড়া, জেলেপাড়া, সাঁতরাপাড়া, বাগদীপাড়া. পাঠকপাড়া, পাত্রপাড়া, বেহারাপাড়া, গোয়ালাপাড়া ও পাইকপাড়া। এছাড়া বর্তমানে কৃষ্ণপটীর পশ্চিমাঞ্চলে পালপাড়া, চণ্ডীতলা ইত্যাদি কয়েকটি নূতন জনবসতি গড়ে উঠেছে। পাড়াগুলির নামকরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিভিন্ন বৃত্তির বসতি হিসাবে পাড়াগুলি গড়ে উঠেছিল। মাল্লা, পাঁজারি, তাঁতি, বেহারা, জেলে, পাইক ও গোয়ালারা বিভিন্ন বৃত্তিজীবী। তাঁদের জনবসতি যে যে অঞ্চলে ছিল, পরবর্তীকালে সেই বৃত্তিজীবীদের নামেই পাড়ার নামকরণ হয়েছে। বৃত্তি ছাড়া আঞ্চলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিছু পাড়া বা অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। যেমন সেগুনবাগান। ওখানে এককালে বিরাট সেগুনবাগান ছিল। বর্তমানে অবশ্য তার চিহ্নমাত্র নেই। মুসলমান পীর বুড়া দেওয়ানের নামে বুড়া দেওয়ানতলা অঞ্চলটির নামকরণ হয়েছে। বর্তমান সময়ে অবশ্য পাড়াগুলির নাম বজায় আছে বটে কিন্তু বৃত্তিভিত্তিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের আগমনে পাড়াগুলিতে আজকে মিশ্র জনবসতি গড়ে উঠেছে।

পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল 'তেলিনীপাড়া'র বয়স মাত্র আড়াইশো বছর। প্রাচীন ইতিহাসে তেলিনীপাড়া নামের কোন উল্লেখ নেই। বরং পাইকপাড়া নামের উল্লেখ পাই অন্তত পাঁচশত বৎসর পূর্বের সাহিত্য গ্রন্থে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের "The Changing Face of Bengal" গ্রন্থে এমন একটি মানচিত্র আছে যাতে আমাদের অঞ্চলের গঙ্গাতীরবর্তী পুরাতন স্থানের সঙ্গে তেলিনীপাড়ার উল্লেখ আছে। মানচিত্রের সময়কাল ষোড়শ/সপ্তদশ শতাব্দী। মানচিত্র অনুযায়ী অন্তত সপ্তদশ শতাব্দীতে তেলিনীপাড়ার অস্তিত্ব ছিল। সে হিসাবে আমাদের

তেলিনীপাড়ার বয়স অন্তত ৪০০ বৎসর।

বিপ্রদাস পিপলাই রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রা পথ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ অঞ্চলের ভাগীরথী তীরবর্তী বহু স্থানের উল্লেখ আছে। ঐ যাত্রাপথ বর্ণনায় ভাগীরথী নদীতীরের পাইকপাড়া গ্রামের উল্লেখ আছে। কিন্তু তেলিনীপাড়ার কোন উল্লেখ নেই। বিপ্রদাসের চাঁদ সওদাগর বাণিজ্যতরণী নিয়ে ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, কুমারহাট, ডাইনে হুগলী, বামে ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোরো, পূর্বে কাকিনাড়া, তারপর মূলাজোড়, গাড়ুলিয়া, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ডাইনে চাঁপদানী, বামে ইছাপুর, বাঁকিবাজার, নিমাইতীর্থ, চানক, মাহেশ, খড়দহ, ডাইনে রিষিড়া, বামে সুখচর, পশ্চিমে কোন্নগর, ডাইনে কোতরং, ক্রমে চিত্রপুর, কলিকাতা, বেতড় হয়ে সাগর সঙ্গম।

উপরোক্ত যাত্রাপথে যেসব স্থানের উল্লেখ আছে, তার অনেক স্থানই আজও একই নামের পরিচয় বহন করছে। আবার কোন কোন স্থানের নাম পরিবর্তিত হয়েছে। কোন কোন স্থান পার্শ্ববর্তী বড় নগর বা শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের পাইকপাড়ার উল্লেখ করা যায়। পাইকপাড়া বর্তমানে তেলিনী-পাড়ার একটি অংশ হয়ে নিজের স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। তেলিনীপাড়া অপেক্ষা পাইকপাড়া অনেক পুরাতন স্থান। বিপ্রদাসের গ্রন্থে পাঁচশত বৎসর পূর্বে এর উল্লেখ থাকলেও আমরা মনে করি এই নাম ও গ্রামের অস্তিত্ব আরো অনেক পূর্ব হতেই ছিল। ফরাসী ও দিনেমারদের তেলেঙ্গী সৈন্যের ছাউনি হিসাবে তেলিনীপাড়া নাম পাইকপাড়া অপেক্ষা অনেক নবীন।

দেশশ্রী হরিহর শেঠ মহাশয় চন্দননগরের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে বলেছেন —"ফরাসী শাসনের প্রথমদিকে ফরাসী কোম্পানী দেশীয় ইজারাদারদের উপর স্থানীয় খাজনা আদায় ও নবাব সরকারের খাজনা জমা দেওয়া ইত্যাদি কাজের ভার ছিল। উপনিবেশের শান্তি রক্ষার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক কর্মঠ পাইক, বরকন্দাজ, কোতোয়াল প্রভৃতি রাখিবার ব্যয় ইজারাদারদের।।" পাইকদের দিয়ে স্থানীয় শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা

ফরাসী আমলের বহু পূর্বেই এদেশে প্রচলিত ছিল। হিন্দু যুগে পাইকরা পদাতিক সৈনিক হিসেবে কাজ করত। পরবর্তীকালে মুসলমান আমলেও পাইক প্রথা প্রচলিত ছিল। ইংরেজরা এদেশে যখন প্রথম শাসনের অধিকার পেলেন তখন তারা পাইক প্রথা উচ্ছেদ করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জমিদারী পাবার পর তাঁরা পাইক প্রথার উচ্ছেদ শুরু করেন। পাইকরা নিয়মিত সৈনিক ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি কারণে সাময়িকভাবে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করত। আবার শান্তির সময় চাষবাস ইত্যাদি নিয়ে সময় কাটাত। পূর্বে পাইকদের কোন নির্দিষ্ট বেতন ছিল না। তারা রাজা বা জমিদারের কাছ থেকে 'পাইকান' নামে জমি পেতেন। সেই জমি চাষবাস করে তাদের জীবিকা নির্বাহ হত। এছাড়া হয়ত যুদ্ধবিগ্রহ-কালে বিশেষ ভাতা পেতেন। ইংরেজরা পাইক প্রথা তুলে দিয়ে পাইকান জমি বাজেয়াপ্ত করে। মেদিনীপুর অঞ্চলে অসন্তুষ্ট পাইকরা বিদ্রোহ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বেশ কিছুদিন বিব্রত করেছিল। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ "পাইক বিদ্রোহ" নামে পরিচিত। লাঠি, সড়কি হাতে পাইকরা ছিল পদাতিক। পাইক সৈন্যদের বেশভূষা ও আচার আচরণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে বেশ সুন্দর বর্ণনা আছে।

হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই পাইক নিযুক্ত করা হত। নানা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে, বৃহৎ নগরের আশেপাশে ও বাণিজ্যকেন্দ্রের বাণিজ্য পথের আশপাশে পাইকদের স্থায়ী বসতি ছিল। পাইকদের এই বসতি সাধারণভাবে পাইকপাড়া নামে পরিচিত ছিল। আমাদের পাইকপাড়া অতীতে ঐ ধরণের পাইকদের বসতি ছিল বলেই পাইকপাড়া নামে পরিচিত। সাধারণতঃ নিম্ন বর্ণের নানা সম্প্রদায় পাইক সৈন্যভুক্ত হত। ডোম, কৈবর্ত প্রভৃতি বর্ণের লোকেরাই অধিক মাত্রায় পাইকবৃত্তি গ্রহণ করত। ডোমেদের সামরিক খ্যাতির অজস্র নিদর্শন ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ছড়ানো আছে। একটি ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে ডোমেদের সামরিক ঐতিহ্যের নিদর্শন লুকানো আছে—

আগ ডোম, বাগ ডোম, ঘোড়াডোম সাজে

ঢাল, ঘাঘর, মেঘর বাজে।

কৈবর্ত সমাজের সামরিক নৈপুণ্যের কথা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। প্রবল পরাক্রমশালী পাল রাজবংশ পর্যন্ত কৈবর্তদের সামরিক নৈপুণ্যে পরাজিত হয়ে পিতৃভূমি বরেন্দ্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কৈবর্ত বীর দিব্যোক ও ভীমের নাম পালেদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেছিল। বাংলাদেশে আরেকটি রণনিপুণ সম্প্রদায় হচ্ছে বাগদীরা। বাগদী বা বর্গক্ষত্রিয়েরা সত্যই একদিন ক্ষত্রিয় নামের উপযুক্ত ছিল। বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের কথা, অতীত বাংলার এইসব রণনিপুণ সম্প্রদায় নিজেদের পূর্ব মহিমা ও কৌলীন্য হারিয়ে বর্তমানে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ হিসেবে গণ্য হয়েছেন। পাইক সৈন্যদের অধিকাংশ সংগৃহীত হত ডোম, কাহার, চণ্ডাল, বাগদী ও কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি পাইকদের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে পাইকরা তাদের সামরিক বৃত্তি হারিয়ে কেউ কেউ চাষবাস, কেউ মাছ ধরা, আবার কেউ কেউ লুণ্ঠন, ডাকাতি এইসব কর্মে জড়িয়ে পড়ে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম দিকে সারা বাংলাদেশ জুড়ে ডাকাতদের ভয়ঙ্কর উপদ্রব ছিল। এইসব ডাকাতদের অধিকাংশই ছিল বৃত্তিচ্যুত পাইক। 'ইছামতী' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদেরই একজনকে হলা পেকে বা হলধর পাইক রূপে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

পাঠান আমলের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পাইক সৈন্যেরা অনেক সময়েই 'কিং মেকার' এর ভূমিকা পালন করেছে। গৌড় দরবারের নানা ষড়যন্ত্রের মূলে থাকত পাইক সৈন্য ও তাদের দলপতিরা। সুলতানদের রাজ অন্তপুর ও দেহরক্ষীর কাজ করত পাইক সৈন্যেরা। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্য গৌড়ের শাসনকর্তা আলা আদিম পাইক সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিয়েছিলেন। স্টুয়ার্ট (Stewart) সাহেব তাঁর 'History of Bengal' এ (Page-127) বলেছেন—"One of the first act of Ala Adeem's Government was to reduce

the corps of Paiks, who had so frequently assisted in dethroning their sovereigns........ He also dismissed the whole of the Abyssinian troops."

ভেঙে দেওয়া পাইক সৈন্যদল বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এক একটি পাইকপাড়া গড়ে তোলে। আমাদের আলোচ্য পাইকপাড়া গুরুত্বপূর্ণ নদীপথ ও রাজপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। সমুদ্রপথে আগত বাণিজ্যতরণীসমূহ ভাগীরথী ও সরস্বতী নদীর উজান-পথে সে যুগের দক্ষিণবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর সপ্তগ্রামে ব্যবসাবাণিজ্য করতে আসত। ঐসব বিদেশী বণিকদলের উপর সতর্ক নজর রাখার জন্য ভাগীরথী ও সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি ছিল। আবার দক্ষিণবঙ্গ থেকে ভাগীরথীর দক্ষিণ তীর ধরে স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য, সৈন্য চলাচল, তীর্থযাত্রীদের উত্তর ভারতে গমনের প্রধান রাজপথের পাশে অবস্থিত ছিল আমাদের পাইকপাড়া গ্রাম। জলপথ ও স্থলপথের সংযোগস্থলে পাইকপাড়ার অবস্থান। শুল্ক আদায় ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের উপযুক্ত স্থান পাইকপাড়া।

কৃষ্ণপটী গ্রামের দেবনাম সূচক নামকরণ। বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামনামই নানা দেবতার নামে নামাঙ্কিত। কৃষ্ণপটী শব্দটির মধ্যে 'পটী' শব্দটি এসেছে পত্তন/পট্টন/পট্টী/পটী। 'পটী' শব্দটির মূল অর্থ বন্দর বা বাণিজ্যকেন্দ্র। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ সমুদ্র তীরবর্তী বন্দরের নাম পত্তন নামাঙ্কিত। যথা—বিশাখাপত্তনম, মছলিপত্তনম, নেগাপত্তনম ইত্যাদি। বাংলাদেশে ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে পট্টী শব্দটির প্রয়োগ আছে। চন্দননগরেই আছে চাউলপট্টী, ময়দাপট্টী, কাপড়েপট্টী। ওদিকে কলকাতার বড়বাজারে নানা অংশের নাম 'পট্টী' দিয়ে। আমাদের কৃষ্ণপটী কিন্তু বন্দর বা ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে কোন ঐতিহাসিক পরিচয় বহন করে না। সে কারণে পট্টী বা পত্তন নামকরণের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। এক হিসেবে নামটির ব্যাখ্যা হতে পারে, ফরাসী সরকারের দক্ষিণ ভারতীয় সৈন্যেরা কৃষ্ণপটী অঞ্চলে বাস করলেও করতে পারেন। অতীতে কৃষ্ণপটী ফরাসী

চন্দননগরের সীমাভুক্ত ছিল। সীমানা খাল কাটার সময় জমির লেনদেন হয়ে কৃষ্ণপটী অঞ্চল ব্রিটিশ শাসনাধীন হয়। সম্ভবত ফরাসীদের তেলেঙ্গী সৈন্যেরা নিজেদের মূল বাসভূমি দক্ষিণ ভারতের নামকরণের রীতিতে তাদের সাময়িক বাসস্থানটিকে কৃষ্ণপত্তন হিসেবে নামকরণ করেছিল। যা পরবর্তীকালে লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে কৃষ্ণপটীতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এটি আমাদের অনুমান।

কৃষ্ণপটীর বাগপাড়ার বাসিন্দা ভূপালচন্দ্র বাগ মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণপটীর অপর একটি নামের সন্ধান পাওয়া গেল। বাগ মহাশয় জানালেন—তাঁদের পরিবারের পুরাতন দলিলপত্রে কৃষ্ণপটীর নাম শ্যামবাটি রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যেসব দলিলপত্র পেশ করেন, তার মধ্যে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত কবুলতির সূচনা নিম্নরূপ ঃ

—"শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাগ শ্রীমাধবচন্দ্র বাগ সাং—শ্যামবাটী। কস্য ঠিকা পট্টক পত্র মিদং কার্যাঞ্চাগে বোর পরগণার মৌজা, শ্যামবাটী গ্রাম ...."।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত দ্বিতীয় কোবালার সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করা হল –

—"ক্রেতা শ্রীমতী রজনী দাসি, স্বামী শ্রীকালিচরণ বাগ সাং শ্যামবাটী, থানা ও সব-রেজিস্ট্রি শ্রীরামপুর।

কস্য মোকররি মৌরসী বহুকালের ভোগদখলি বাস্তুবাটি মায় বৃক্ষাদি বিক্রয় কোবালা পত্র মিদং কার্যাঞ্চাগে জেলা হুগলি, থানা ও সব রেজিস্ট্রি শ্রীরামপুর, মানকুণ্ডা মোঃ শ্যামবাটি গ্রামে........"।,

প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শ্রীকালিচরণ বাগ ও শ্রীসত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত দলিলে সাং—কৃষ্ণপটী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ আমাদের পূর্বে উল্লেখিত ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত কোবালায় সাং—শ্যামবাটি উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৮৯৬ এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাটী ও কৃষ্ণপটী উভয় নাম প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে ক্রমশ শ্যামবাটী নাম বিলুপ্ত হয় এবং কৃষ্ণপটী নাম প্রতিষ্ঠিত হয়। অথবা দ্বারিক জাঙ্গাল

রাস্তার পূর্বদিকে কৃষ্ণপটী এধং পশ্চিমদিকে শ্যামবাটী নাম প্রচলিত ছিল। দ্বারিক জাঙ্গালের পূর্বদিকে ফরাসী অধিকৃত অংশের নাম কৃষ্ণপটী এবং পশ্চিমদিকে ব্রিটিশ অধিকৃত অংশের নাম শ্যামবাটী ছিল।

আমাদের অঞ্চলের পরিচয় দিতে গেলে ভদ্রেশ্বর ও মানকুণ্ডু অঞ্চল দুটির দাবি সর্বাগ্রে। তেলিনীপাড়ার প্রশাসনিক পরিচয় ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। ভদ্রেশ্বর থানা ও ভদ্রেশ্বর পুরসভার অন্তর্গত তেলিনীপাড়া গ্রাম। ভদ্রেশ্বর বহু প্রাচীন কাল হতেই তীর্থভূমি ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসামঙ্গল' কাব্যে ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ আছে। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত পাইলট বা নাবিকদের চার্টে ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ আছে বুদেশি (Buddesy)। ভদ্রেশ্বরনাথ শিবের নাম হতেই স্থানের নাম ভদ্রেশ্বর। জনসাধারণের ধারণা—কাশীর বিশ্বেশ্বর ও দেওঘরের বৈদ্যনাথদেবের ন্যায় ভদ্রেশ্বরনাথও স্বয়ম্ভু।

ভদ্রেশ্বরের নামকরণ সম্পর্কে কেবলমাত্র ধর্মীয় উৎস অনুসন্ধান করলেই হবে না। কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার 'সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু উপনিবেশ' গ্রন্থে বলেছেন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার চম্পার (বর্তমান ভিয়েতনাম) হিন্দু রাজাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা ভদ্রবর্মণের নির্মিত একটি মন্দির ভদ্রেশ্বর স্বামীর নামে উৎসর্গীকৃত। ঐ মন্দিরে শিবের লিঙ্গমূর্তির সঙ্গে মনুষ্যমূর্তিও আছে। মাইসন নামক স্থানের ভদ্রেশ্বরনাথের এই মন্দির ৪৭৮ থেকে ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে নষ্ট হয়। পরবর্তীকালে একাদশ শতাব্দীতে রাজা শম্ভুবর্মণ মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন। রাজা ইন্দ্রবর্মণ ভদ্রেশ্বর স্বামীর মন্দিরটি রূপার এবং চূড়াগুলি সোনার পাতে ঢেকে দেন।

D. G. E. Hall তাঁর 'A History of South-East Asia' গ্রন্থে লিখেছেন—'Bhadravarman, whoever he may have been, founded the first sanctuary to be built in the Mison area and dedicated it to Siva-Bhadresvara

........According to the "History of the Sui", before the subjugation of Funan the chenla capital was situated near a mountain call "Ling-Kia-po-p'o i.e. Ling Parvata—on which was a temple consecrated to the god—P'o-to-li i.e., Bhadresvara."

চম্পার (বর্তমান ভিয়েতনাম) রাজাদের তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেখানে ভদ্রবর্মন-প্রথম (৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে), ভদ্রবর্মণ-দ্বিতীয় (৯১০ খ্রীঃ), ভদ্রবর্মণ-তৃতীয় (১০৬১ খ্রীঃ) এবং ভদ্রেশ্বর বর্মণ (৬৪৫ খ্রীঃ) নামে চারজন রাজা রাজত্ব করেছেন। সম্ভবত প্রথম ভদ্রবর্মণ ভদ্রেশ্বর স্বামীর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সুদূর ইন্দো-চীনের চম্পার ভদ্রেশ্বরনাথ শিবমন্দিরের সঙ্গে আমাদের অঞ্চলের ভদ্রেশ্বরনাথ শিবের কোন যোগাযোগ আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। যোগাযোগ থাকতেও পারে আবার না-ও পারে। আমরা ঐতিহাসিক তথ্যটি লিপিবদ্ধ করলাম এই আশায়, হয়তো একদিন উভয় ভদ্রেশ্বরনাথের মধ্যে যোগাযোগ আবিষ্কৃত হতে পারে।

অশোক মিত্র 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে বলেছেন—"বীরভূম জেলার মুরারৈ রেলষ্টেশনের নিকটবর্তী ভাদীশ্বর বলে একটি গ্রাম আছে। জনশ্রুতি আছে যে, এখানে প্রাচীনকালে ভদ্রেশ্বর নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর নামানুসারে ভদ্রেশ্বর গ্রাম পরে বিকৃত হয়ে ভাদীশ্বর।"

ভদ্রেশ্বরের বিভিন্ন পাড়ার পরিচয়ঃ ভদ্রেশ্বর গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার মধ্যে মাঝেরপাড়া, ধর্মতলা, শীতলাতলা, কৈবর্তপাড়া, ভট্টাচার্যপাড়া, ভদ্রেশ্বরতলা, বারুইপাড়া, দুলেপাড়া ও পাত্রপাড়া নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাড়াগুলির নাম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সম্প্রদায় বা বৃত্তিভিত্তিক পাড়া হল কৈবর্তপাড়া, দুলেপাড়া, বারুইপাড়া, পাত্রপাড়া ও ভট্টাচার্যপাড়া। অপরদিকে ধর্মতলা, শীতলাতলা, ভদ্রেশ্বরতলা দেবকেন্দ্রীক নামের পাড়া। একমাত্র মাঝেরপাড়াই তার স্থানগত অবস্থান নিয়ে মাঝেরপাড়া নাম পেয়েছে।

বর্তমানে ভদ্রেশ্বরের অঙ্গীভূত মানিকনগর তার নিজ স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছে। আমাদের অনুমান মানিকনগর পূর্বে তেলিনীপাড়া, পাইকপাড়া, কৃষ্ণপটী ইত্যাদি অঞ্চলের মত পৃথক পাড়া বা অঞ্চল ছিল। মানিকনগর নামকরণ সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, মানিক ভট্টাচার্য বা মানিক পণ্ডিতের নামে মানিকনগরের নামকরণ হয়েছে। আমরা বহু অনুসন্ধান করেও মানিক পণ্ডিত সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। বহু গ্রন্থে ভদ্রেশ্বর ও তার আশপাশে বেশ কিছু চতুষ্পাঠী বা টোল ছিল—তার উল্লেখ আছে। সম্ভবত মানিক পণ্ডিতের নিজস্ব চতুষ্পাঠী ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্য ও চরিত্র মহিমায় পরবর্তীকালে তাঁর বাসভূমির নাম হয়েছে মানিকনগর। মানিকনগর নামটি আর এক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। এটি পল্লী বা পাড়া নামে কোন গ্রামের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং স্বতন্ত্র ঐতিহ্যবাহী নগর। উপরোক্ত কারণে আমরা অনুমান করি, অতীতে মানিকনগর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ভদ্রেশ্বর পুরসভার অন্তর্গত মানকুণ্ডু দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পূর্বগৌরব অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। ফরাসীরা যখন নিজস্ব সীমানা বরাবর পরিখা খনন করে তখনই মানকুণ্ডু গ্রামটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। মানকুণ্ডুর পূর্ব অংশ যা বর্তমানে পূবপাড়া নামে পরিচিত, ফরাসী সীমানাভুক্ত হয় আর পশ্চিমাংশ ব্রিটিশ সীমানাভুক্ত থেকে যায়। দীর্ঘ ২০০ বছর দ্বিধাবিভক্ত থাকার ফলে মানকুণ্ডু পূবপাড়া ও পশ্চিমপাড়া নামে ভাগ হয়ে দুটি স্বতন্ত্র অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

মানকুণ্ডু নামকরণের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় মোগল যুগে রাজা মানসিংহ উড়িষ্যা গমন পথে এই স্থানে অবস্থান করেন। মানসিংহের স্মৃতি বিজড়িত একটি পুষ্করিণী সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী শোনা যায়। মানকুণ্ডু পূবপাড়ায় দেবী দশভুজার মন্দির উল্লেখযোগ্য। দেবী দশভুজা জাগ্রত দেবী হিসাবে এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। মন্দিরের আশপাশ অঞ্চলকে এখনো দশভুজাতলা বলা হয়। মানকুণ্ডু পশ্চিম-পাড়ায় খাঁ উপাধিধারী ব্যবসায়ী ও জমিদারগণের বাসস্থান। মানকুণ্ডু গ্রামের উন্নতির মূলে এই পরিবারের অনেক অবদান আছে। খাঁ

বংশীয়গণ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, তাঁরা তাঁদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রী শ্রীধর জিউর উৎসব উপলক্ষে রাসের সময় এক বিরাট মেলার পত্তন করেছিলেন। একমাসব্যাপী এই বিরাট মেলা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। তবে আশার কথা বর্তমানে রাসমেলার পুনর্জীবন ঘটেছে। বর্তমান যুগে মানকুণ্ডুর খ্যাতি রেলস্টেশন ও মানসিক রোগীদের চিকিৎসার হাসপাতাল হিসেবেই।

পালপাড়া—পালপাড়া প্রাচীন জনপদ। অন্তত দেড়শত বৎসর পূর্বের দলিলপত্রে পালপাড়ার নাম আছে। পাল পদবীধারী আদি বাসিন্দাদের নামেই পালপাড়ার নামকরণ। পাল ও ভাদুড়ী (বাদুড়ী) পরিবার পালপাড়ার প্রাচীন বাসিন্দা। একটি পুরাতন দলিলে অন্যতম সাক্ষী হিসেবে শ্রীভিকু ভাদুড়ী (বাদুড়ী)র নাম উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বহু পরিবার পালপাড়াকে সমৃদ্ধশালী ও ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করেছেন।

চণ্ডীতলা—দেবী ওলাইচণ্ডীর থান (স্থান) হিসাবে চণ্ডীতলার নামকরণ। চণ্ডীতলা নামের পিছনে কেবল ওলাইচণ্ডীদেবীর সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' রচয়িতা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে চণ্ডী নামধারী বহু দেবী কালক্রমে মঙ্গলচণ্ডীর মধ্যে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। নাটাইচণ্ডী, রণচণ্ডী, শুভচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, কলাইচণ্ডী এবং দশবাইচণ্ডী (দশবাহু বিশিষ্ট চণ্ডী) ইত্যাদি চণ্ডী নামধারী দেবীদের মন্দির বা পূজাস্থলকে সাধারণভাবে চণ্ডীতলা বলা হয়। আমাদের অঞ্চলের চণ্ডীতলা, ওলাইচণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডী—উভয় চণ্ডীর নামাঙ্কিত হতে পারে।

চণ্ডীতলার সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডী দেবীর যোগাযোগের বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মানকুণ্ডু প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শংকর মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি চণ্ডীতলা ও মানকুণ্ডু অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ কালে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। ঐ অঞ্চলে 'ভ্রমরাদিঘী' নামে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানে 'কালাপাহাড়' নামে একটি উচ্চ ভূখণ্ডের প্রতি

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঐ নাম দুটি আমাদের মনে মধ্যযুগের ইতিহাসের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। বসতবাড়ির চাপে ভ্রমরাদিঘী ও কালাপাহাড় তার পূর্বগৌরব হারিয়ে ফেলেছে। ভ্রমরাদিঘী বা দহ নামটির সঙ্গে মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের স্মৃতি বিজড়িত। হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী কালাপাহাড় তো ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষ।

বিনয় ঘোষ মহাশয় 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে ভ্রমরার দহ সম্বন্ধে বলেছেন—"ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর ছিলেন বর্ধমানের উজানী—মঙ্গলকোটের অধিবাসী। উজানী—মঙ্গলকোটের তান্ত্রিক প্রাধান্যের স্মৃতিবহ নাম ভ্রমরাদহ। ....বণিকদের বাণিজ্যডিঙা ভ্রমরার দহে নোঙর করা বা ডোবানো থাকত। ....দেবী চণ্ডী বা দুর্গার এক নাম ভ্রামরী।"

ভ্রমরাদিঘী ও কালাপাহাড় নামের সঙ্গে মধ্যযুগের ইতিহাসের কোন যোগ আছে কিনা, আমরা তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। ঐ নাম দুটি আমাদের মনে মধ্যযুগের স্মৃতি জাগরণ করে মাত্র।

চতুর্থ অধ্যায়

জনবিন্যাস

বহু প্রাচীনকাল থেকেই তেলিনীপাড়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। গঙ্গার তীরবর্তী স্থানের মাহাত্ম্য হিন্দু জনসাধারণকে গঙ্গার তীরে বাস করার প্রেরণা জোগাত। প্রচলিত প্রবাদবাক্যে আছে—"গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারানসী সমতুল।" চৈতন্যদেবও বারবার গঙ্গামাহাত্ম্যের কথা বলেছেন। ত্রিবেণীর বিখ্যাত দরাপ খাঁ গাজী মুসলমান হয়েও সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। গঙ্গার উভয়কূলে মনুষ্যবসতি বহু প্রাচীনকাল হতেই গড়ে উঠেছে। সেই হিসেবে তেলিনীপাড়া অঞ্চলেও নিশ্চয়ই প্রাচীনকাল হতেই জনবসতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের লোক এ অঞ্চলে বাস করত তার কোন তথ্যগত বিবরণ বা প্রমাণ আমরা পাই না। সে কারণে জনশ্রুতি ও অনুমানের উপর নির্ভর করেই এ অঞ্চলের জনবিন্যাসের আলোচনার সূত্রপাত করতে হবে।

জলপথ ও স্থলপথের পার্শ্ববর্তী স্থান হওয়ার জন্য নৌবাণিজ্য, নৌচালনা ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের এখানে বাস ছিল। আবার উত্তর ভারতে যাওয়ার প্রধান রাস্তার উপর অবস্থিত হওয়ার জন্য এ অঞ্চলের সামরিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব ছিল। শুল্ক আদায়, পথের রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সৈন্যদলের ছাউনি ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই এ অঞ্চলে বাস করতেন। এক কথায় বলতে গেলে নদীর সঙ্গে যুক্ত

জীবিকাধারীরা এবং প্রশাসনিক ও সামরিক ঘাঁটির সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিরাই এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। আমরা যাকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলি বা যারা ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বণিককুল তারা এই স্থানের আদি বাসিন্দা ছিলেন না। বহু পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের লোক-জন এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

এ অঞ্চলের জনবিন্যাসের প্রকৃতি ও শ্রেণীবিচার করলে আমরা কালানুক্রমিক ও সাম্প্রদায়ভিত্তিক বিন্যাস লক্ষ্য করি। প্রাচীনকাল হতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এ অঞ্চলের অধিবাসীদের একটি বিশেষ সময়-ভিত্তিক যুগ কল্পনা করা যায়। দ্বিতীয়ত সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী—তিনশত বৎসর ব্যাপী আরেকটি যুগ কল্পনা করা যায়। তৃতীয় বা আধুনিক যুগের সূচনা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই। ঐ আধুনিক যুগ আজ পর্যন্ত বজায় আছে। জনসমাজের বৃত্তিগত ও সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করলে দেখা যায় প্রথম যুগে বা প্রাচীনকালে নদীনির্ভর বৃত্তির সম্প্রদায়গুলি এখানে বসবাস করত। তাছাড়া প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যাপারে যুক্ত সম্প্রদায়গুলিও ঐ সময় বাস করত। পরবর্তী মধ্যযুগকে সামন্ততান্ত্রিক যুগ বলা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনা হতেই সরস্বতী নদী তীরবর্তী অঞ্চলের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বণিক সমাজ সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে চলে আসেন। তেলিনীপাড়া অঞ্চলে কিছু মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবার এই সময় বসতি স্থাপন করেন। ভদ্রেশ্বর অঞ্চলে সপ্তগ্রামীণ বণিক সমাজ তাঁদের নতুন ব্যবসাবাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলেন। এই যুগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—তেলিনীপাড়ার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণের উত্থান। এই জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিনীপাড়ায় অট্টালিকা নির্মাণ করে বসতি করার পর তাঁর আমন্ত্রণে পুরোহিত, ঘটক, বেহারা, বাদ্যকর, রজক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লেকেরা বসতি স্থাপন করে। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণ কুলীন ছিলেন। তাঁদের কন্যাবিবাহ-সূত্রে কুলীন জামাতাদের এই গ্রামে বসতি শুরু হয়। এই যুগকে আমরা সামন্ততান্ত্রিক যুগ বলে অভিহিত করছি। কারণ যারা এযুগে এখানে

বসবাস করেছিলেন তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জমিদারগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব এ সময়েই ঘটে। পরবর্তী আধুনিক যুগের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। এ অঞ্চলে পাটভিত্তিক নানা কলকারখানা গড়ে ওঠে। পাটকলে চাকরিসূত্রে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান শ্রমিকেরা এখানে বসতি স্থাপন করেন। প্রাচীনকালে এখানে বহু বাঙালী মুসলমান পরিবার বাস করলেও কারখানা স্থাপনের পরে বিপুল সংখ্যক বিহার ও উত্তরপ্রদেশবাসী উর্দুভাষী মুসলমান শ্রমিক এখানে ভিড় করেন। আবার কারখানার কেরানীগিরি সূত্রে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় জীবিকাসূত্রে বসবাস করেন। ১৯৪৭ সালে ও পরবর্তী সময়ে দেশবিভাগের কারণে পূর্ববঙ্গ হতে বহু সংখ্যক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবার এ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন উচ্চবর্ণের উচ্চশিক্ষিত মানুষ ছিলেন, তেমনি মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষও ছিলেন। আধুনিক যুগে তেলিনীপাড়ার জনবিন্যাসের আমূল পরিবর্তন ঘটে। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে গিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রীক আধুনিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

নদীপার্শ্বের অবস্থান হেতু ও উত্তর ভারতে গমনাগমনের প্রধান রাজপথ হেতু প্রথম যুগের আদি বাসিন্দারা ছিলেন মৎস্যজীবী কৈবর্ত সম্প্রদায়, নৌজীবী মাল্লা, পাঁজারি ও নিকারি সম্প্রদায়। কৈবর্তগণ বাংলাদেশের আদি বাসিন্দা। তাঁরা অতি শক্তিশালী জনগোষ্ঠী ছিলেন। নৌকা করে মাছধরা ব্যতীত তাঁরা পাইকসৈন্য হিসেবে হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের আমলে প্রতিরক্ষার নানা স্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে নৌকা নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে বেশ কিছু মানুষ যুক্ত ছিলেন। নদীগামী সাধারণ জলযান ভদ্রেশ্বর অঞ্চলে পূর্বে নির্মিত হত। এখনো সেখানে নৌকা মেরামতির কাজকর্ম হয়।

কৈবর্ত ব্যতীত শক্তিশালী বাগ্দী সম্প্রদায়ও এই অঞ্চলে বসবাস করতেন। পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ধর্মপালদেবের খালিমপুর তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে তাঁর নৌবাহিনীতে—"নানাবিধ নৌ বাটক

রণতরনী সেতুবন্ধনিহিত শৈলশিখর শ্রেণীরূপে” মানুষের বিভ্রম উৎপাদন করত। পালযুগের নৌসৈনিক হিসেবে কৈবর্ত ও বাগদী সম্প্রদায় বিখ্যাত ছিল। আর ডোম সম্প্রদায় ছিল পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য হিসেবে বিখ্যাত। ঐসব রণনিপুণ কৈবর্ত ও বাগদী সম্প্রদায়ের বংশধরেরাই তেলিনীপাড়ার গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতেন। আজও বহু কৈবর্ত বংশীয়দের তেলিনীপাড়ায় বাস আছে। গঙ্গাতীরবর্তী এদের বসতি অঞ্চলকে আজও সাঁতরাপাড়া বলা হয়। রণনিপুণ বাগদী বা বর্গক্ষত্রিয়গণ গঙ্গাতীরবর্তী বাগদীপাড়ায় বসবাস করত। অবশ্য বাগদীপাড়ার অস্তিত্ব আজ আর নেই। পাটকলের শ্রমিকদের কুলিলাইন করার জন্য বিদেশী বণিকরা বাগদীদের আদি বাসস্থান থেকে উৎখাত করে দিয়েছে। এখনো গ্রামের কোন কোন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাগদী বংশীয়গণ বাস করেন। একটি পাড়ার নাম আজও জেলেপাড়া। তা থেকে বোঝা যায় এককালে মৎসজীবী সম্প্রদায় ওখানে বাস করতেন।

নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে কৈবর্ত জাতি প্রসঙ্গে বলেছেন, পাল আমলে প্রথম কৈবর্ত জাতির ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের বারেন্দ্রভূমিতে দিব্যোক, রুদ্রক ও ভীম—এই তিন কৈবর্ত নৃপতি রাজত্ব করেছেন। 'মনুস্মৃতি'-তে কৈবর্তদের উপজীবিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে—এরা মূলত নৌজীবী। দ্বাদশ শতকেই বাঙালী স্মৃতিকার ভবদেব ভট্ট কৈবর্তদের নৌজীবী বা মৎসজীবী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। পাল রাজা রামপাল দেবের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' গ্রন্থে কৈবর্তদের অসম সাহসিকতা ও রণনৈপুণ্যের কথা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। কৈবর্তসমাজ যদিও মূলত কৃষিজীবী ছিলেন, কিন্তু এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে কৈবর্তদের কেবট্ট বলা হত। তাদের কেউ কেউ সংস্কৃত চর্চা করতেন, কাব্যরচনা করতেন তার প্রমাণ আছে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক কাব্যসংকলনের (১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে) কেবট্ট পপীপ অর্থাৎ কৈবর্ত কবি পোপিপ রচিত গঙ্গাস্তবের একটি পদ আছে।

"বদ্ধাঞ্জলি নৌমি-কুরু প্রসাদম্, অপূর্বমাতা ভব, দেবি গঙ্গে !
অন্তে বয়স্যম্ভকগতায় মহ্যম অদেয় বন্ধায় পয়ঃ প্রযচ্ছ।"

—এই পদটি ভক্তিনম্র, বিনয়মধুর ও সুন্দর। এই দৃষ্টান্ত হতে আমরা অনুমান করতে পারি কৈবর্তসমাজ শিক্ষাদীক্ষায় একেবারে অনুন্নত ছিলেন না। পাল যুগের অব্যবহিত পরেই সেন রাজবংশের যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে কৈবর্তরা তাদের শিক্ষাদীক্ষা হারিয়ে সমাজের নিম্নস্তরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কৈবর্তরা গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে বাস করতেন বলেই কবি পোপিপের গঙ্গাস্তোত্রটি উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হয়েছে।

কালিদাস 'রঘুবংশ' কাব্যে "নৌসাধনোদ্যত বঙ্গান" শব্দটির দ্বারা বাঙালী নৌসৈন্যের শৌর্যবীর্যের কথা ইঙ্গিত করেছেন। চর্য্যাপদের বিভিন্ন কবিতায় বাঙালীর নদী ও নৌকার সঙ্গে গভীর যোগাযোগের পরিচয় আছে।

তেলিনীপাড়ার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁতীপাড়া। নামকরণ থেকেই বোঝা যায় এককালে এখানে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। আজ অবশ্য তাঁতীপাড়ায় মিশ্র জনবসতি। পুরাতন বাসিন্দা তন্তুবায়েরা যেমন বাস করেন তেমনি অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ এমনকি বহিরাগত অবাঙালী সম্প্রদায়ও এখানে বাস করেন। তাঁতীপাড়ার লাগোয়া চন্দননগরে সীমানা-পরিখার পাশেই অবস্থিত দিনেমারডাঙা ও গোন্দলপাড়া। চন্দননগর বা ফরাসডাঙা তাঁতশিল্পের জন্য বিখ্যাত। ফরাসডাঙার ধুতি ও শাড়ি একদিন শুধু বাংলাদেশে কেন, বাংলার বাইরের মানুষেরও মন-পছন্দ ছিল। চন্দননগরের লালবাগান, সাবিনাড়া ইত্যাদি পল্লীতে এখনো বহুসংখ্যক তন্তুজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। অবশ্য তাঁদের অনেকেই কৌলিক বৃত্তি ত্যাগ করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষাজগতে ও কর্মজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। চন্দননগরের লাগোয়া অংশ হিসাবে তেলিনীপাড়ার তন্তুবায় সম্প্রদায়ের ইতিহাস চন্দননগরের তন্তুবায় সম্প্রদায়ের ইতিহাসের সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত।

ফরাসডাঙার আবহাওয়া ছিল আর্দ্র এবং সেই আবহাওয়া মসলিন

জাতীয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্রবয়নের উপযোগী। কেবলমাত্র ঢাকা অঞ্চলেই মসলিন বোনা হত না। ফরাসডাঙাতেও উচ্চমানের মসলিন বোনা হত। ফরাসী কোম্পানীর বণিকরা ফরাসডাঙায় বোনা মসলিন ইউরোপের বাজারে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করতেন। শুধু কাপড় বোনাই নয়, এই শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য সহযোগী শিল্পের শিল্পীরাও এখানে বাস করতেন। বয়ন শিল্পের সঙ্গে রং করার কাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। স্থানীয় মুসলমান শিল্পীরা সুন্দর পাকা রং প্রস্তুত করতে পারতেন। কলাকার শ্রেণীর মুসলমান শিল্পীদের এটি একচেটিয়া ছিল। ফরাসী কোম্পানীর তন্তুবায়দের মধ্যে একশ্রেণীর মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী ছিলেন। এদের সাহায্যেই ফরাসী কোম্পানী দাদন দেওয়া ও মালপত্র সংগ্রহ করতেন। ফরাসডাঙার প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ফরাসী কোম্পানীদের অধীনে দালালি ও জোগান-দারির কাজ করতেন।

বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক সুতো কেটে অন্ন সংস্থান করতেন। শুধু যে তাঁতীবাড়ির মেয়েরাই একাজ করতেন, তা নয়। অনেক গরীব ঘরের মেয়ে এমনকি উচ্চবর্ণের বিধবা মেয়েরাও জীবিকার্জনের জন্য সুতো কাটতেন। পূর্বে ফরাসডাঙা ও সন্নিহিত অঞ্চলে প্রায় ১৫০০ তন্তুবায় পরিবারের বসবাস ছিল। হরিহর শেঠ মহাশয় এ প্রসঙ্গে বলেছেন, কেবলমাত্র পরিধেয় বস্ত্রই এখানে প্রস্তুত হত না। বিদেশে চালান দেবার উপযোগী রুমালের জন্য 'লাল গিলে' ও 'কালা গিলে' নামক চৌখুপী ডুরে সুসী (থান), গিমাম, চিলেকস্তা, হুরীর কাপড়, গাউনের কাপড় ইত্যাদি তৈরী হত। চন্দননগরের বড়বাজারে একটি কাপড়ের হাট বসত। সেখান হতে সংগৃহীত কাপড় তুলাপটীর ঘাট থেকে বিদেশে রপ্তানী হত।

কার্পাস তন্তুজাত বস্ত্রবয়নের সঙ্গে সঙ্গে পাটজাত নানা সামগ্রী এ অঞ্চলে বয়ন করা হত। পাটকল স্থাপনের পূর্বে হাতে বোনা তাঁতে চটের কাপড়, থলে তৈরী হত। দেশীয় পদ্ধতিতে পাট থেকে দড়ি তৈরী করা হত। চন্দননগর ও তেলিনীপাড়ার তন্তুবায় সম্প্রদায় কার্পাসবস্ত্র ও

পাটজাত বস্ত্র উৎপাদনে নিযুক্ত ছিলেন। শিল্পবিপ্লব ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে প্রসার লাভ করে এবং সেখানেও যন্ত্রের সাহায্যে সুতো কাটা ও কাপড় বোনা শুরু হয়। ফলে ইউরোপের বাজারে ভারতজাত বস্ত্রের চাহিদা একেবারে কমে যায়। ফরাসডাঙা থেকে ফ্রান্সের বাজারে মসলিন ও অন্যান্য বস্ত্র রপ্তানী সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কৌলিক বৃত্তিচ্যুত হয়ে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মানুষ প্রথমদিকে দিশাহারা হয়ে পড়লেও তাঁরা শিক্ষাদীক্ষা ও সংগ্রামী মনোভাবের জন্য দ্রুতগতিতে অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করে নিজেদের পূর্বাবস্থা বজায় রাখেন। কিন্তু যে সকল তন্তুবায় নিজেদের অন্য বৃত্তিতে সরিয়ে নিতে পারলেন না, তাঁরা দুঃখদুর্দশার মধ্যে পড়লেন। বিশেষ করে মেয়েরা যাঁরা তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা সম্পূর্ণ বৃত্তিচ্যুত হলেন।

চন্দননগরের তাঁতশিল্প সম্পর্কে যেসব কথা বলা হল, তার সবই তেলিনীপাড়ায় বসবাসকারী তাঁতশিল্পীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে তাঁতীপাড়ায় বসবাসকারী তন্তুবায়গণও অনন্যোপায় হয়ে জীবিকা পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মানুষ এখনো তেলিনীপাড়ায় বাস করেন। কিন্তু তাঁরা আর কেউ তাঁতশিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত নন। কেবলমাত্র পূর্ব ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করে তাঁতঘর ও তাঁতীপাড়া নাম অবশিষ্ট আছে।

বাংলাদেশে এমনকি পূর্বভারতের সর্বপ্রথম নীলকুঠি স্থাপিত হয় চন্দননগরে। ফরাসী বণিক লুই বেনো (Louis Bonnaud) অল্পবয়সে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে দৈবক্রমে নীলচাষ ও নীলের ব্যবসা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ চন্দন-নগরের তালডাঙা ও দিনেমারডাঙা অঞ্চলে দুটি নীলকুঠি স্থাপন করেন।

বেনো সাহেবের দ্বিতীয় নীলকুঠিটি তৎকালীন তেলিনীপাড়ার দিনেমারডাঙাতে অবস্থিত ছিল বলে ঐ নীলকুঠিতে কর্মরত বহু শ্রমিকের বাস ছিল তাঁতীপাড়া অঞ্চলে। নীলচাষ ও নীলকুঠি বন্ধ হওয়ার পরে ঐসব বৃত্তিচ্যুত মানুষরা সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাটকলের শ্রমিক হয়ে যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

জনবিন্যাস ও আর্থ-সামাজিক বিবর্তন

মানুষ চিরকাল একস্থানে বাস করে না। প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে মানুষ স্থান বদল করে। বিশ্বের সব দেশের জনবিন্যাসের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এই সত্যটি ধরা পড়ে। আমাদের অঞ্চলে বিগত পাঁচ/ছয় শত বৎসর পূর্ব হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বেশ কয়েকবার জনবিন্যাসের ধাঁচ বা আদলের পরিবর্তন হয়েছে। নদীতে যখন বর্ষাকালে জলস্ফীতি হয়, তখন একদফা পলি পড়ে। পরবর্তী বৎসরের বর্ষাকালে তারই উপরে আর এক স্তর পলি পড়ে। এইভাবে বছরের পর বছর পৃথক পৃথক স্তরে পলি সঞ্চিত হয়। জনবিন্যাসের ক্ষেত্রেও এই একই পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে যারা বাস করত তাদের সরিয়ে দিয়ে কিংবা তাদের উপরে আর একদল মানুষ এসে বাস করে। দু চারশো বছর বাদে ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এইভাবে জনবিন্যাসেরও স্তর গড়ে ওঠে।

আমাদের অঞ্চলে সুদূর অতীতে কোন্ কোন্ জাতি বা সম্প্রদায় বাস করতেন তার তথ্যভিত্তিক ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষ নেই। পাঁচ/ছ' শত বৎসর পূর্ব হতে জনবসতির মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যায়। আমাদের অঞ্চলে কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসন পাওয়া যায়নি, যা থেকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের এদেশে আগমন এবং বসতির কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেই কারণে মধ্যযুগে রচিত সাহিত্যে যেসব তথ্য আছে,

তার ওপর নির্ভর করেই আমাদের আলোচনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত আমাদের অঞ্চল অর্থাৎ ভদ্রেশ্বর, তেলিনীপাড়া, মানকুণ্ডুর জনবসতির ইতিহাস এক নয়। সাধারণ আলোচনার পর আমাদের প্রতিটি অংশের পৃথক পৃথক চিত্র তুলে ধরে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে।

এই অঞ্চলের জনবসতি ও জনবিন্যাসকে আমরা তিনটি স্তরে বিভক্ত করব। এই স্তরগুলির বৈশিষ্ট্য ও সময়কাল অঞ্চলের সর্বত্র এক নয়। তেলিনীপাড়ার জনবসতির প্রথম স্তরে মূলত বাস করতেন কৈবর্ত, মাল্লা, নিকারি, পাঁজারি, বাগদী ও তন্তুবায় সম্প্রদায়। আবার পাইকপাড়া অঞ্চলে বাস করতেন পাইক সৈন্যদের বংশধর যারা হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মের মানুষ ছিলেন। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত পাইকরা মূলত বর্গক্ষত্রিয় বা বাগদী ও কৈবর্ত সমাজভুক্ত ছিলেন। মুসলমান পাইকরা পাইক বৃত্তিচ্যুত হয়ে নিকারি, পাঁজারি ও কলাকার সম্প্রদায়ভুক্ত হন। কৃষ্ণপটী অঞ্চলে ঐ যুগের মানুষরা ছিলেন যুগী বা যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত তন্তুবায় এবং পাত্র পদবীযুক্ত মাহিষ্য সম্প্রদায়। কৃষ্ণপটীর যুগী সম্প্রদায় যেখানে বাস করতেন, সে অঞ্চলের রাস্তার নাম আজও যোগীপাড়া লেন। যোগী সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বর্তমান যুগে যুগী সম্প্রদায় তাঁদের পূর্বগৌরব ও ঐতিহ্য হারিয়ে নিম্নবর্ণের মানুষে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু একদিন সারা ভারতে নাথযোগী সম্প্রদায় অত্যন্ত উন্নত ও শক্তিশালী ধর্মসম্প্রদায় ছিলেন। মীননাথ ও গোরক্ষনাথ এই সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু ছিলেন। পাল রাজাদের পরে সেন রাজাদের সময় হতেই এদের পতন শুরু হয়। হুগলী জেলার মহানাদ এ অঞ্চলের যোগী সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মকেন্দ্র ছিল। আজও মহানাদ ও জৌগ্রাম-কুলীনগ্রাম অঞ্চলে নাথ সম্প্রদায়ের প্রাচীন মঠ ও মন্দিরের নিদর্শন আছে। চন্দননগরের যুগীপাড়া ও কৃষ্ণপটীর যুগীপাড়ায় আজও নাথ সম্প্রদায় ভুক্ত যোগী সম্প্রদায়ের বাস। কৃষ্ণপটীতে নাথ পদবীবিশিষ্ট যোগীদের হস্তচালিত তাঁত ছিল। হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মাহিষ্য সম্প্রদায়ের

বাস। কৃষ্ণপটী ও মানিকনগরের মাহিষ্যগণ পূর্বে কৃষিকর্ম করতেন ; পরবর্তী সময়ে নানা বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। ভদ্রেশ্বর ও মানকুণ্ডু অঞ্চলেও পূর্বে মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবী মানুষদের বসতি ছিল।

কৃষ্ণপটীর দক্ষিণ-পূর্ব অংশে দাসপাড়া অবস্থিত। পূর্বে এখানে মুচি সম্প্রদায়ভুক্ত বায়েনদের (বাদ্যকর) বাসস্থান ছিল। তাঁরা চর্মজাত নানা সামগ্রী প্রস্তুত করতেন। চর্মজাত সামগ্রীর ব্যবসা বাণিজ্য সূত্রে নানা স্থান হতে ক্রেতাগণের আগমন ঘটত। নন্দীপুকুরের পার্শ্ববর্তী এই স্থানে আজও কিছু কিছু চর্মজাত সামগ্রী প্রস্তুত হয়। দাসপাড়ার বর্তমান অধিবাসীরা নানা ধরনের কাজকর্ম করেন। মিশ্র জনবসতি হয়ে দাসপাড়া তার পূর্ব বৈশিষ্ট্য অনেকটাই হারিয়েছে।

আজ থেকে সাত/আট শত বৎসর পূর্বে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে পাইকপাড়া ও ব্যবসা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ভদ্রেশ্বরে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের আগমন ঘটে। তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতনের পর দশম/একাদশ শতাব্দী হতেই নদী বন্দর হিসাবে সপ্তগ্রামের উত্থান ঘটে। সহায়ক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ভদ্রেশ্বরের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী সমাজ ও ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ ভদ্রেশ্বরে বসতি করেন। অপরদিকে সপ্তগ্রাম বন্দর ও আঞ্চলিক প্রশাসন কেন্দ্রকে রক্ষা করার জন্য জলপথ ও স্থলপথের সংযোগস্থল পাইকপাড়ায় পাইক সৈন্যদের ঘাঁটি গড়ে ওঠে। সৈনিক পরিবার ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা সম্প্রদায়ের মানুষ পাইকপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন।

মানকুণ্ডু অঞ্চলে আদি বাসিন্দাদের আধিপত্য খর্ব করে খাঁ পরিবার ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে বসতি স্থাপন করেন। পারিবারিক শ্রুতি অনুযায়ী খাঁ পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল তারকেশ্বর অঞ্চলে। খাঁন পরিবারের সঙ্গে তাদের পূর্ব বাসভূমি হতে দুলে, বাউরি ও বাগ্দী সম্প্রদায়ভুক্ত একদল মানুষ মানকুণ্ডু স্টেশনের পশ্চিমদিকে খাঁন রোডের পার্শ্বে বসতি স্থাপন করেন। এরা আজও সেখানে বাস করেন। এরা প্রধানত খাঁন পরিবারের পাইক ও লাঠিয়ালের কাজ করতেন। দিঘীর বাগানের নিকট ও মনসাতলা খাসবাগানে এদের পাইকান ও চাকরান

জমি দেওয়া হয়েছিল। এদের অনেকের পদবী ছিল সর্দার। সর্দারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শশী সর্দার।

নিরাপত্তার অভাবে এবং নূতন বাণিজ্যের সম্ভাবনায় খাঁনেরা পূর্ব বাসভূমি ত্যাগ করে মানকুণ্ডুতে নূতন বসতি গড়ে তোলেন। অর্থাৎ চতুর্দশ/পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভদ্রেশ্বর ও পাইকপাড়ায়, ষোড়শ/সপ্তদশ শতাব্দীতে মানকুণ্ডুতে এবং অনেক পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তেলিনী-পাড়ায় আদি বাসিন্দাদের হটিয়ে দিয়ে উচ্চবর্ণের মানুষ বসবাস শুরু করেন।

ভদ্রেশ্বরনাথ শিব অতি প্রাচীন দেবতা। তিনি অনাদি লিঙ্গ। কিন্তু তাঁর দেবমাহাত্ম্য সম্ভবত বণিক সম্প্রদায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেবস্থানকে ঘিরে নিশ্চয় ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের বসতি ছিল। কিন্তু তার নিশ্চিত প্রমাণ কিছু নেই। মঙ্গলকাব্যে দেখা যায়, শিব হচ্ছেন বণিকদের উপাস্য দেবতা—তাই আমরা অনুমান করি চতুর্দশ/পঞ্চদশ শতাব্দী হতেই ভদ্রেশ্বরে দেবস্থান ও ব্যবসাকেন্দ্র ঘিরে বণিক ও অন্যান্য বর্ণের মানুষদের বসতি হয়।

কৃষ্ণপটীতে সপ্তদশ/অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় পর্যায়ের জনবসতি গড়ে ওঠে। কৃষ্ণপটীর উত্তরাঞ্চল ফরাসী চন্দননগর ভুক্ত বারাসত দে-পাড়ায় অংশ ছিল। বারাসত মূলত বণিকশ্রেণীর বাসভূমি। সে কারণে কৃষ্ণপটীর উত্তরদিকে তিলি সম্প্রদায় ভুক্ত বণিকদের বাসভূমি ছিল। বিখ্যাত ব্যবসায়ী বৃন্দাবন শেঠের প্রাসাদোপম অট্টালিকা আজও বর্তমান আছে। অবশ্য পরবর্তীকালে ঐ অট্টালিকার মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশীয় নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বসতবাটী হয়। বৃন্দাবন শেঠের বাড়ির সামনের রাস্তাটির নাম আজও শেঠ লেন। কৃষ্ণপটীর যে অংশে যোগী সম্প্রদায়ের বসতি ছিল বা আজও আছে, সেই রাস্তাটির নাম যুগীপাড়া লেন।

বর্তমানে যুগী বা যোগীপাড়ায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষরাও বাস করেন। কিন্তু অতীতে যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরাই এখানে বাস করতেন। বর্তমান যোগীপাড়া থেকে অতীতের যোগীপাড়ায় সমৃদ্ধরূপ

অনুমান করা কঠিন। অতীতে যোগীরা শিক্ষাদীক্ষায় অত্যন্ত উন্নত সম্প্রদায় ছিলেন। তাদেরই নিজস্ব দেবতা পঞ্চানন বা পঞ্চানন্দের নাম অনুসারেই কৃষ্ণপটীর পঞ্চাননতলার নামকরণ। বর্তমানে অবশ্য পঞ্চাননদেব কৃষ্ণপটীর গ্রামদেবতারূপে সর্বজন পূজ্যদেবতা।

শেঠ লেনের অপর বাসিন্দা ছিলেন শ্রীচরণ মল্লিক। তাঁর পুত্র সিদ্ধেশ্বর মল্লিকের বিরাট বিষয় সম্পত্তি ছিল। তাঁর বিরাট বাড়ির একাংশে পঞ্চানন শিবের মন্দির ছিল। সিদ্ধেশ্বর মল্লিকের শেওড়াফুলি হাটে ব্যবসার গদি ছিল। সম্ভবত ভদ্রেশ্বর গঞ্জেও তাঁর গদি ছিল।

মানকুণ্ডু ও তেলিনীপাড়ার দ্বিতীয় পর্যায়ের বসতি গড়ে উঠেছে সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে। যেখানেই বড় জমিদারগোষ্ঠী বাস করতেন সেখানেই তাদের নায়েব, গোমস্তা ইত্যাদি কাছারির কর্মচারীরা বাস করতেন। এছাড়া জমিদারদের অন্য নানা কাজে নিযুক্ত থাকতেন পাইক, বরকন্দাজ, গুরু-পুরোহিত. ঘটক. ধোবা, নাপিত, বেহারা, বায়েন (মুচি) ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ। এইসব বৃত্তির মানুষদের মাহিনার ব্যবস্থা ছিল না। তাদের জমি দেওয়া হত। গুরু-পুরোহিত, ঘটক প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের দেওয়া হত ব্রহ্মোত্তর জমি। মন্দির-দেবস্থান ইত্যাদির জন্য দেবোত্তর জমি আর অন্য বৃত্তির মানুষদের চাকরান জমি। জমিদার কুলীন ব্রাহ্মণ হলে মেয়ে জামাইকে প্রথমে বাড়িতে, পরে গ্রামে জমি দিয়ে বসতি করান হত।

জমিদার কেন্দ্রীক সামন্ততান্ত্রিক জনবসতি গড়ে উঠেছিল মানকুণ্ডুতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। মানকুণ্ডু গ্রামের প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ হয় ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবারের আদিপুরুষ তাঁর পৃষ্ঠাপোষক ও ব্যবসাসহায়ক মোগল সেনাপতি ও সুবেদার মানসিংহের নামে মানকুণ্ডু গ্রামের নামকরণ করেন। পরবর্তীকালে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ নবকুমার খাঁ নিজ আত্মীয়স্বজন ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর্মচারীদের বাহিরে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে চাকরি ও জমি দিয়ে মানকুণ্ডুতে বসতি করান। তাঁর পুত্র রামনারায়ণ ও পৌত্র জগন্নাথের সময়েও এই ধারা বজায় থাকে। মোটামুটি ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ

হতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মানকুণ্ডু অঞ্চলে নানা বর্ণের ও সম্প্রদায়ের মানুষ বসতি করে। মানকুণ্ডুতে প্রধানত সরস্বতী তীরবর্তী বাঘডাঙা—নপাড়া, খলিসানী, দেবানন্দপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকেই মানুষজন আসেন। সরস্বতী তীরবর্তী ঐসব অঞ্চল খাঁন পরিবারের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই তাঁরা সহজেই জমিদারের গ্রামে স্থান পান। সরস্বতী নদী মজে যাওয়ার জন্য ঐসব অঞ্চল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে। মড়ক-মহামারীর ভয়েও মানুষ পালিয়ে আসে। তেলিনী-পাড়ার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়রা বাঘডাঙা—নপাড়া হতে প্রথমে মানকুণ্ডুতে বসতি করেন। পরে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার হয়ে মানকুণ্ডু হতে তেলিনীপাড়ায় আসেন।

খাঁন পরিবারের পারিবারিক দেবতা শ্রীশ্রীদশভুজা দুর্গামাতা, শ্রীশ্রী শ্রীধরজিউ, শ্রীশ্রীমহাকালেশ্বর এবং শ্রীশ্রীঅর্ধনাভীশ্বরের সেবা ও দৈনিক পূজার্চনার জন্য ব্রাহ্মণ ও সেবাইতদের মন্দির স্থাপনের সময় থেকেই জমি দিয়ে বসতি করান হয়। গড়ে ওঠে ব্রাহ্মণপাড়া। এছাড়া জগন্নাথদেব ও ওলাইচণ্ডী ঠাকুরাণী সেবাপূজার জন্য দেবোত্তর ভূমি দান করা হয়। ঐ দুই দেবস্থানে মন্দির ইত্যাদি নির্মিত হয় এবং গঙ্গোপাধ্যায় বংশীয় ব্রাহ্মণ পরিবার পুরুষানুক্রমে সেবাইত নিযুক্ত হন।

তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের প্রতিস্ঠাতা বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মানকুণ্ডু হতে তেলিনীপাড়ায় বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করে উঠে আসেন। এই সময় হতে প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত তেলিনীপাড়ায় সামন্ততান্ত্রিক যুগ চলে। বসতবাটী ও অন্নপূর্ণা মন্দির নির্মাণ করে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ গ্রামে গুরু, পুরোহিত, ঘটক, কুলীনকরা কন্যা জামাতা ও দৌহিত্রদের বসতি করান। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত নানা বৃত্তি ও সম্প্রদায়ের মানুষ তেলিনীপাড়ায় বসতি করেন। আজকের তেলিনীপাড়ার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পরিবার এইভাবে গ্রামে বসতি করেন। চাকরান জমি পেয়ে বসতি করেন বায়েন (বাদ্যকার), বেহারা (পাল্কিবাহক), ধোবা প্রভৃতি অন্য বর্ণের মানুষ। যজন যাজন ও চতুষ্পাঠী পরিচালনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন

বন্দ্যোপাধ্যায়-ভট্টাচার্য বংশ।

ভদ্রেশ্বর গঞ্জ অঞ্চলে তৃতীয় পর্যায়ের জনবসতি গড়ে ওঠে সপ্তগ্রাম বন্দরের সম্পূর্ণ পতনের পর। আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই সপ্তগ্রাম বন্দরের পতন শুরু হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দলে দলে সপ্তগ্রামের বণিকসমাজ ও তাঁদের উপর নির্ভরশীল কর্মীবৃন্দ গঙ্গাতীরে হুগলী হতে বৈদ্যবাটী, চাতরা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে নূতন করে ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে তোলেন। ভদ্রেশ্বর গঞ্জ এই সময় হতে কলকাতা বন্দরের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ অঞ্চলের আমদানি রপ্তানীর বেশ কিছুটা ভদ্রেশ্বর নদী-বন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত হত। ফলে ভদ্রেশ্বর গঞ্জে এবং গ্রামে নূতন এক দল ব্যবসায়ীগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর-মানিকনগর, চাঁপদানী প্রভৃতি অঞ্চলে কলকারখানা স্থাপিত হলে বহিরাগত অবাঙালী শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সমাজভুক্ত কর্মীর দল গৌরহাটী, চাঁপদানী ও ভদ্রেশ্বরের জনবসতির পূর্ব পরিচিত গঠনটি বদলে দিল। মূলত ব্যবসাকেন্দ্রীক ভদ্রেশ্বরের আশেপাশের শিল্পাঞ্চল তাকে শ্রমিক অধ্যুষিত শিল্পাঞ্চলে পরিণত করল।

কৃষ্ণপটী ও মানকুণ্ডু অঞ্চলে তৃতীয় পর্যায়ে অবাঙালী শ্রমিকরা এসে ভিড় করল না বটে কিন্তু অন্য অঞ্চল থেকে আগত মধ্যবিত্ত বাঙালী রুজি-রোজগারের প্রয়োজনে এখানে বসতি স্থাপন করল। দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষদিকে এবং তৃতীয় পর্যায়ের প্রথমেই কৃষ্ণপটীতে ঘোষ পরিবার তাদের আদি বাসভূমি দেবানন্দপুর ত্যাগ করে কৃষ্ণপটীতে বসবাস করেন। অপর পুরাতন বাসিন্দা মিত্র বাড়ির আদি পুরুষ ২৪ পরগণার বসিরহাট অঞ্চল থেকে এসে কৃষ্ণপটীতে বসবাস শুরু করেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রেলপথ মানকুণ্ডুর বুকের ওপর দিয়ে চলে গেলেও তখন মানকুণ্ডু স্টেশন চালু হয়নি। পরবর্তীকালে খাঁন পরিবার ও জনসাধারণের প্রচেষ্টায় যখন মানকুণ্ডু স্টেশন চালু হল, তখন বেশ একদল বহিরাগত মানুষ রেলস্টেশনের সুবিধার জন্য মানকুণ্ডুর

আশেপাশে বসবাস করতে লাগলেন।

তেলিনীপাড়া গঙ্গাতীরবর্তী হবার জন্য ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তেলিনীপাড়ার পূর্বদিকে গঙ্গার তীরে ভিক্টোরিয়া জুটমিল গড়ে ওঠে। তেলিনীপাড়ার লাগোয়া ফরাসী সীমানাভুক্ত গোন্দলপাড়া দিনেমারডাঙায় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গোন্দলপাড়া জুটমিল স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে তেলিনীপাড়া ও ভদ্রেশ্বরের সংযোগস্থলে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে ওঠে নর্থ শ্যামনগর জুটমিল। চাঁপদানী অঞ্চলের কয়েকটি জুটমিল ইতিপূর্বেই গড়ে উঠেছিল। গঙ্গার পরপারে পূর্বতীরেও জগদ্দল, আঁতপুর, শ্যামনগর, গাড়ুলিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে বেশ কিছু কলকারখানা গড়ে ওঠে। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে আমাদের অঞ্চলের জনবিন্যাস ও জনবসতির চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়।

দলে দলে অবাঙালী শ্রমিক পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তেলিনীপাড়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বরে এসে জড়ো হয়। গড়ে ওঠে অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি বস্তিবাড়ি। হিন্দি, উর্দু, ওড়িয়া, তেলেগু ভাষাভাষী নানা মানুষের মিশ্র জনবসতি গড়ে ওঠে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষ গড়ে তোলেন তাঁদের ধর্মস্থান ও শিক্ষাসংস্কৃতি কেন্দ্র। সামন্ততান্ত্রিক তেলিনীপাড়া সামন্ততন্ত্রের নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে কিছুটা গণতান্ত্রিক পরিবেশে এসে পেঁছিলেন। কেবলমাত্র অবাঙালী শ্রমিকরা এলেন না, পাটকলে চাকরিবাকরি সূত্রে অন্য অঞ্চল থেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবাররাও তেলিনীপাড়ার জনবিন্যাসকে একটি নূতন মাত্রা দিলেন। তেলিনীপাড়ার জীবনযাত্রা গঙ্গা ও যমুনার দুই ধারায় বইতে আরম্ভ করল। প্রথম যুগে বাঙালী-অবাঙালীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক লেনদেন শুরু না হলেও পরবর্তীকালে বৃহৎ অবাঙালী গোষ্ঠী বাংলা শিখে বাঙালী মানুষদের সঙ্গে এক হবার চেষ্টা করলেন। ক্রমে ক্রমে তেলিনীপাড়ায় বাঙালী-অবাঙালীর একটি মিশ্র সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠল।

বহুদিন পূর্ব হতেই এই অঞ্চলে পূর্ববঙ্গবাসীরা চাকরি-বাকরি, ব্যবসাবাণিজ্যসূত্রে বাস করতেন। তাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু পূর্ববঙ্গে

নিজস্ব পৈতৃক বসতবাটী ছিল। দেশের সঙ্গে, নিজের গ্রামের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ অক্ষুন্ন ছিল। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থানকে তাঁরা সাময়িক বলে মনে করতেন। অবশ্য পূর্ববঙ্গবাসী কেউ কেউ ঘরবাড়ি করে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা অর্জন ও দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের চিত্রটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। রাজনৈতিক নেতাদের অদূরদর্শীতা ও ক্ষমতা-লিপ্সার ফলে কলমের এক আঁচড়ে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষ সাত-পুরুষের ভিটেমাটি হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হল।

এতবড় মানবিক বিপর্যয় পৃথিবীর ইতিহাসে ইতিপূর্বে ঘটলেও আমাদের দেশে এ ধরণের ব্যাপক বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটেনি। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালির দাঙ্গার পর শত শত হিন্দু নিজেদের প্রাণ ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এক বস্ত্রে দেশ ছেড়ে চলে এলেন। সারা পশ্চিমবঙ্গেই তাঁরা ছড়িয়ে পড়লেন। বেশী চাপটা পড়ল কলকাতাকেন্দ্রীক আশপাশের অঞ্চলের উপর। আমাদের অঞ্চলেও বাস্তুচ্যুত মানুষরা এলেন। প্রথম দিকে ঐসব মানুষগুলির প্রতি সহানুভূতির অভাব ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে নানা স্বার্থের সংঘাতে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়। সহানুভূতি যেমন ছিল তেমনি বহিরাগত মানুষগুলির অসহায় অবস্থার সুযোগও কেউ কেউ নিল। বাস্তুচ্যুত মানুষগুলি পার্থিব সম্পদ হারালেও মনোবল হারান নি। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তাঁরা কোন বাধাকেই বাধা বলে মানলেন না। তাঁরা আশ্রয় খুঁজে নিলেন মনুষ্যবাসের অযোগ্য জলা ও জঙ্গলভূমি, ধানক্ষেত ও পতিত জমিতে। প্রাণবন্ত মানুষগুলি বাসের অযোগ্য ভূমিকেই বাসযোগ্য করে তুললেন। দেখতে দেখতে গড়ে উঠল বহু উদ্বাস্তু কলোনি। এর কিছু সরকারী আবার কিছু বেসরকারী উদ্যোগে গঠিত। জমি জবরদখল যে হল না, তাও বলা যাবে না। এরপর কেটে গেছে প্রায় পঞ্চাশ বছর। তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শেষ হয়েছে। নবাগত মানুষগুলি এদেশের স্থায়ী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন।

ভদ্রেশ্বর-তেলিনীপাড়া-মানকুণ্ডু অঞ্চলে পূর্ববঙ্গবাসীরা এসে বাস

করেছেন। তেলিনীপাড়ার সর্বত্র এবং ভদ্রেশ্বরের গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে পূর্ব হতেই ঘনবসতি ছিল। সে কারণে এই অঞ্চলে বহিরাগত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের স্থানের অভাব ছিল। এ অঞ্চলের পশ্চিমদিকে, কৃষ্ণপটী, চণ্ডীতলা, মানকুণ্ডু ইত্যাদি অঞ্চলে নূতন বসতি গড়ে উঠল।

ভদ্রেশ্বর স্টেশন থেকে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দিকে আসতে বাঁদিক বরাবর চোখে পড়ে সুন্দর, সাজানো গোছানো পল্লী। নাম তার 'গভর্ণমেণ্ট কলোনি'। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, সম্ভবত ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রপক্ষের সৈন্যদের বিমান বিধ্বংসী কামানের ঘাঁটি ও ছাউনি ছিল যে স্থানে—বর্তমানে সেটি 'গভর্ণমেণ্ট কলোনি'। যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলে মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা ফিরে যায় নিজ নিজ ঘরে—পড়ে থাকে শেলটার, বাংকার প্রভৃতি কিছু নিদর্শন। সেই পরিত্যক্ত সেনা ছাউনিতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কিছু উদ্বাস্তু পরিবার আশ্রয় নেয়। কিছু পরিবারকে অস্থায়ী তাঁবুতে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, অনিদ্রায় দিন কাটাতে হয়েছে দীর্ঘদিন। সরকারী সাহায্য যা পেয়েছিলেন, তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। পরিবারের সকলে যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন, তার জন্য স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে কঠোর পরিশ্রম করতেন। কঠোর পরিশ্রমের যে কোন বিকল্প নেই, তার উদাহরণ—এই ছিন্নমূল পরিবারগুলি।

শিক্ষাদীক্ষা, গানবাজনা, খেলাধূলায় তাঁরা আজকে আর পিছিয়ে নেই। নানা সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে এ অঞ্চলের মানুষরা তাঁদের সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

শান্তিনগর কলোনি—শান্তিনগর কলোনির অবস্থান কৃষ্ণপটী অঞ্চলের পশ্চিমে ও পালপাড়া অঞ্চলের পূর্বে। উদ্বাস্তু আগমনের পূর্বে এই অঞ্চলে চাষাবাদ ও নানা ফলের বাগান ছিল। এই অঞ্চলে কয়েকটি বড় বড় পুকুর আছে। ঐ পুকুরগুলি সরকার পরিবারের সম্পত্তি ছিল বলে পুকুরের নাম সরকারপুকুর ও তার পার্শ্ববর্তী রাস্তার নাম সরকারপুকুর লেন।

এই অঞ্চল এক নম্বর, দু নম্বর, তিন নম্বর ও চার নম্বর

শান্তিনগর নামে চার ভাগে বিভক্ত। বর্তমানে এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা পরিবার। প্রধানত শ্রমজীবী ও মৎস্যজীবী মানুষরাই এখানে বাস করেন। অবশ্য এখন অনেকেই পারিবারিক বৃত্তি ত্যাগ করে কলকারখানায় ও অন্য পেশায় নিযুক্ত। সমগ্র অঞ্চলটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর এলাকা। উদ্যমী ও কর্মঠ বাসিন্দাগণ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজেদের পরিবেশকে উন্নত করার প্রশংসনীয় উদ্যোগ এঁরা গ্রহণ করেছেন।

মানকুণ্ডু গভঃ কলোনি-চণ্ডীতলা—দেবী ওলাইচণ্ডীর 'থান' কে ঘিরে গড়ে উঠেছে চণ্ডীতলা গভর্ণমেণ্ট কলোনি। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে ধুবুলিয়া, কুপার্স এবং রূপশ্রীপল্লী—উদ্বাস্তু শিবির থেকে ২৪৮টি পরিবারকে পুনর্বসতি দেওয়া হয় মানকুণ্ডু সরকারী স্কীম নং-১ এর জমিতে। পরবর্তীকালে এই মানকুণ্ডু গভঃ কলোনি চণ্ডীতলা কলোনি নামে পরিচিত হল। চণ্ডীর স্হানকে ঘিরে এর বিস্তার পশ্চিমে রেললাইন, পূর্বে পালপাড়া আর উত্তরে গড় (সেচ ক্যানেল) এবং দক্ষিণে রেলওয়ে সাইডিং লাইন।

প্রথম যুগে আগত ২৪৮টি পরিবারকে ছাড়িয়ে বর্তমানে পরিবারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০০টি। গড়ে উঠেছে হরেকৃষ্ণ পল্লী, বিধান পল্লী, সুভাষনগর, শ্রীকৃষ্ণ পল্লী, ক্ষুদিরাম পল্লী ও নবোদয় পল্লী। এইখানে বহু সংখ্যক নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষ এক-আধ কাঠা জমি কিনে মাথা গোঁজার আশ্রয় গড়ে তুলেছে। মানুষগুলির জীবিকা বলতে হকারি, দিনমজুরি, ঢালাইয়ের কাজ, বিড়ি বাঁধা, মাছের ব্যবসা, শাক-সবজি আনাজপত্রের ব্যবসা ও গো-পালন, ছাগ-পালন। মধ্যবিত্ত পরিবারও বেশ কিছু নানা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

এই এলাকার সাংস্কৃতিক মান বেশ উন্নত। সুস্থ সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণমুখী ক্রিয়াকলাপের দিকে অধিবাসীদের যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। স্হানীয় সংস্কৃতির সাথে সাথে পূর্ববঙ্গীয় সংস্কৃতির ধারা পাশাপাশি বয়ে চলেছে। অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন, লীলা সংকীর্তন

অনুষ্ঠিত হয়। কাঁসর, করতাল ও ঢাকের আওয়াজের মধ্যে মানুষগুলি প্রতি সন্ধ্যায় হরিকীর্তন গায়। ওলাইচণ্ডীর বাঁধানো পীঠস্থানকে ঘিরে ধর্মপ্রাণ মানুষগুলি নূতন করে গড়ে তুলেছে নূতন জীবনযাত্রা। পূর্ববঙ্গের মানুষরা মনসামঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে বেশী পরিচিত। তাই মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল থেকে মনসার গানের (রয়ানি) আসর বসান। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে চণ্ডী প্রাঙ্গণে দু-তিনদিন ধরে চলে রয়ানি গান। ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, মানকুণ্ডু এলাকার মানুষরা শুনতে আসেন রয়ানি গান। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত রয়ানি গাইয়ে লক্ষ্মী ও সুমতির দল এখানে রয়ানি গান গাইতে আসেন। ওলাইচণ্ডী ও মনসার মধ্যে সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়ে এ অঞ্চলের মানুষ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

পল্লীতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ছাত্র সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। বিদ্যালয়ে ছাত্রের তুলনায় ঘর কম থাকার দরুণ পড়াশুনার ক্ষেত্রে বেশ অসুবিধা দেখা দিয়েছে। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বিদ্যালয় ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করেছে। পল্লীতে আছে একটি পোস্ট অফিস, পূজা মণ্ডপ এবং কলোনি কমিটির কার্যালয়। চণ্ডীতলা গভঃ কলোনির অধিবাসীরা তাঁদের বাসভূমিকে আদর্শ নগরী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে সদাসচেষ্ট।

মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় সংকটের সময়ে। বাংলার বারভূঁইয়াদের অন্যতম যশোরের প্রতাপাদিত্যের বংশের বধূ সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে নিজের পরিবারকে বাঁচিয়েছিলেন। দেশভাগের ফলে বাস্তুচ্যুত হয়ে এদেশে এসে শুধু নিজের পরিবার নয়, বাঁচিয়ে ছিলেন অসংখ্য বাস্তুহারা পরিবারকে। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার হবিগঞ্জ গ্রাম হতে তেলিনীপাড়ায় এসেছিলেন গৃহবধূ সুশীলা গুহ-রায়। বাস্তুহারা মহিলা সমিতিকে সংগ্রামের হাতিয়ার করে তিনি বাস্তুচ্যুত মানুষদের সাহায্য করেছেন। স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাঁর গভীর প্রভাব ছিল। পূর্ববঙ্গ হতে আগত মানুষগুলি অবস্থার বিপাকে পড়ে দিশেহারা না হয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠার যে

সংগ্রাম করেছেন, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সুশীলা গুহ রায়।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে চলে সমাজজীবনের অগ্রগতি। পূর্ববঙ্গ হতে আগত বাস্তুচ্যুত মানুষরা এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করার পর স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে উভয় বঙ্গের মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে সমন্বয়ের মনোভাব। উভয়ে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছেন। এই সংযোগ ও সমন্বয় পশ্চিমবঙ্গের জীবনে সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করেছে।

পূর্ববঙ্গবাসীরা স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার উপর তিনটি বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করেছেন। এগুলি হল—শ্রমের সম্মান, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও উদ্যমী মনোভাব; যে সব কাজকে একদিন এ অঞ্চলের মানুষ ছোট কাজ বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। পূর্ববঙ্গবাসীরা বাঁচার তাগিদে ছোট বড় ভেদ না করে সব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ফলে সমাজে শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে শিক্ষা বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটেছে। তৃতীয়ত, সমাজে উদ্যোগী ও উদ্যমী মনোভাব গড়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ে গড়ে উঠছে নব বঙ্গ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক বিবর্তনের ইতিবৃত্ত

মানুষকে নিয়েই সমাজ। মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনেরও পরিবর্তন ঘটে। অতি প্রাচীনকাল হতেই গঙ্গা-তীরবর্তী এই অঞ্চলে মনুষ্যবসতি ছিল। উচ্চবর্ণের মানুষ অপেক্ষা এই অঞ্চলে নিম্নবর্ণের মানুষেরই আধিপত্য বেশি ছিল। আমরা ইতিপূর্বে স্থাননাম, পাড়ার নাম বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে, এখানে মূলত বাস করতেন কৈবর্ত, বাগদী, যুগী, তাঁতী, পাইক, পাঁজারি, নিকারি প্রভৃতি খেটে খাওয়া মানুষ। সেইসব মানুষদের সমাজ ছিল। কিন্তু সেই সমাজের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের হাতে নেই। সে কারণে কিছুটা অনুমান আর কিছুটা তথ্যের সমন্বয়ে সে যুগের সামাজিক জীবনের চিত্র অঙ্কনের আমরা চেষ্টা করব।

এ অঞ্চলের ঐ আদি বাসিন্দারা উচ্চবর্ণের সামাজিক অনুশাসনের আওতার বাইরে ছিলেন। তাঁরা জীবনের প্রয়োজনে নিজেদের নিয়ম নিজেরা গড়ে তুলেছেন। তাঁদের ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনমুক্ত সমাজজীবনের কিছুটা চিত্র চর্যাপদের গানগুলির মধ্যে আছে। আমরা চর্যাপদের সামাজিক জীবনকে এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের সামাজিক জীবন বলে ধরে নিয়েছি। পালযুগের অবসানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক সেনেদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার সমাজ জীবনের উপর উচ্চবর্ণের মানুষ ও তাদের রীতিনীতি চেপে বসল। সাধারণ মানুষগুলি তাদের সামাজিক

জীবনের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে নিয়ে এক ধরণের দাসশ্রেণীতে পরিণত হল।

এইভাবে কেটে গেল কয়েক শতাব্দী। পঞ্চদশ/ষোড়শ শতাব্দীর পর হতেই আমরা এ অঞ্চলের সমাজজীবনের কিছু তথ্য এখানে ওখানে পেতে শুরু করলাম। ব্রাহ্মণ্য সমাজের একটি প্রথা এ অঞ্চলে বেশ দৃঢ়মূল হয়ে বসেছিল। সেটি হচ্ছে সহমরণ প্রথা। বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলের মতই এ অঞ্চলে সহমরণ প্রথা বজায় তো ছিলই, এমনকি সংখ্যার দিক দিয়ে কিছু আধিক্য ছিল। কারণ সহমরণের সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান গঙ্গাতীর। সেজন্য বহুদূরবর্তী স্থান হতেও সতীরা গঙ্গাতীরে এসে স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে চিতায় আরোহন করতেন। গঙ্গাতীরে ত্রিবেণী ও শ্রীরামপুরের চাতরা অঞ্চলেই বেশি সতীদাহ হত।

হরিহর শেঠ মহাশয় 'সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয়' গ্রন্থে বলেছেন, ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে এক কায়স্থ পরিবারের ৯০ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা সহমৃতা হন। তাঁর মতে এটিই চন্দননগরের শেষ সহমরণের ঘটনা। অর্থাৎ আমরা অনুমান করতে পারি, ঐ ঘটনার পূর্বে সহমরণ প্রথা এই অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হত। শেঠ মহাশয় আরও সহমৃতার সন্ধান দিয়েছেন—১৭৮৫ খৃঃ—একবিংশতিবর্ষীয়া ব্রাহ্মণ যুবতী স্বামীর সহিত সহমৃতা হন। ১৭৯০ খৃঃ ২৯শে জুলাই একজন মুসলমান স্ত্রীলোক মৃত স্বামীর সহিত কবরস্থ হইয়া সহমৃতা হন। ডঃ স্বপন বসু "বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস" গ্রন্থে একটি অভিনব সহমরণের ঘটনার উল্লেখ করেছেন। চন্দননগরে ভাবী স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর বাগদত্তা পাত্রী সহমৃতা হয়েছিলেন। তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় জমিদারদের বিখ্যাত সন্তান অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মায়ের সহমৃতা হবার স্মৃতি সারা জীবনেও ভুলতে পারেন নি। জনশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর মা শ্রীরামপুরের চাতরার ঘাটে সহমৃতা হয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে। অন্নদাপ্রসাদ তখন বালক। তবু তাঁর বাল্যজীবনের স্মৃতি তাঁকে পরবর্তী জীবনে রামমোহনের সহযোগী হয়ে সহমরণ প্রথার উচ্ছেদের জন্য কৃতসংকল্পবদ্ধ

করেছিল। শেষ বয়সে অন্নদাপ্রসাদ পুরুষের বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বহুবিবাহ উচ্ছেদক লেপ যে আবেদনপত্র পাঠানো হয় তার মধ্যে হুগলী জেলার আবেদনপত্রের প্রথম ও প্রধান স্বাক্ষরকারী ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ।

হরিহর শেঠ মহাশয়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ হতে আমরা জানতে পারি, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চন্দননগরে দাসদাসী ক্রয় বিক্রয়ের বড় হাট ছিল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সক্ষম নারী পুরুষ ও কিশোর কিশোরীদের বিক্রয়ের জন্য ঐ হাটে আনা হত। যুবতী নারীর মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। ফরাসী সরকার ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আইন করে দাসব্যবসা বন্ধ করে দেন। ক্রয় বিক্রয়ের হাট উঠে গেলেও লুকিয়ে চুরিয়ে দাসদাসী ক্রয়বিক্রয় চলত। তার প্রমাণ পাই মোহিত রায় রচিত 'নদীয়ার সমাজচিত্র' গ্রন্থ হতে। ঐ গ্রন্থে বলা হয়েছে ১৮২৫-খ্রীষ্টাব্দে এক বৈষ্ণবী তাঁর দ্বাদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে কলকাতার রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ উপলক্ষে ফরাসডাঙায় এসে যখন জানতে পারেন যে, ঐ শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেছে, তখন ঐ বৈষ্ণবী রাজা কিষাণচাঁদ বাহাদুরের নিকট তাঁর কিশোরী কন্যাকে দেড়শত টাকায় বিক্রয় করে দেশে ফিরে যান। সহমরণ ও দাসদাসী বিক্রয়ের ঘটনাগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই অঞ্চলের নারীর কী অসহায় অবস্থা ছিল। নিম্নশ্রেণীর মানুষরা অধাধে দাসদাসী হিসেবে বিক্রীত হয়ে যেত।

বহু পূর্ব হতেই তেলিনীপাড়ার পাইকপাড়া অঞ্চলে 'পাইকান জমি' ভোগী পূর্বতন পাইকদের বংশধররা বাস করতেন। এইসব জমি সবসময়ই যে শহর অঞ্চলে ছিল তা নয়, নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলেও এইসব পাইকান জমি ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন এই অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক শক্তি নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন নানা কৌশলের ফলে এইসব জমি প্রাক্তন পাইকদের হস্তচ্যুত হল। তাছাড়া কোম্পানীর আমলের শুরুতেই কোম্পানী বর্ধমান, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণার জমিদারী পাওয়ার পর তাদের অধিকারভুক্ত অঞ্চলে পাইকান জমি বাজেয়াপ্ত করল। হুগলী-হাওড়া পূর্বে পৃথক জেলা ছিল না।

বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে কারণে এখানেও পাইকান জমি বাজেয়াপ্ত হল। এর ফলে স্থানীয় কৃষিজীবীদের মনে কিছু অসন্তোষ দেখা দিল। অবশ্য কোম্পানীর আমলের নূতন জমিদারবৃন্দ ঐসব প্রাক্তন পাইকদের নানা সেবামূলক কাজে নিযুক্ত করে তার বিনিময়ে তাদের 'চাকরান জমি' দিলেন। তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মান-কুণ্ডুর খাঁন পরিবার—এই জমিদারবৃন্দ অনেক চাকরান জমি দিয়ে কিছুটা অশান্তি প্রশমনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু নূতন ভূমিব্যবস্থায় সমস্যার সমাধান হল না। স্থানীয় কৃষিজীবীদের মনে অশান্তি জিয়োনো রইল। বাস্তুচ্যুত প্রাক্তন পাইকরা শহরাঞ্চল থেকে সরে গিয়ে গ্রামে গেলেন ও নানা বিকল্প পথে জীবিকার্জনের চেষ্টা করলেন।

জমিদারদের বসতির ফলে একে একে উচ্চবর্ণের মানুষরা নিম্নবর্ণের কাছ থেকে কৌশলে হাতিয়ে নেওয়া জমিতে বসতি করলেন। বহু-বিবাহ ও কুলীন ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য প্রথার ফলে বিবাহসূত্রে নানা স্থান হতে ব্রাহ্মণরা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এ অঞ্চলে অবিশ্বাস্য গতিতে জমি হস্তান্তর হয়েছে। আমাদের সংগ্রহে বেশ কিছু পুরাতন দলিল, হস্তান্তরপত্র, কবলুতি ও পাট্টা ইত্যাদি জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র আছে। প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নিম্নবর্ণের মানুষের জমি উচ্চ-বর্ণের মানুষরা কখনো সরাসরি কিনে নিচ্ছেন আবার কখনো বা বকেয়া ঋণের দায়ে দখল করে নিচ্ছেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ'র মধ্যে সম্পাদিত এইসব দলিল হতে দেখা যায় মানকুণ্ডু, ভদ্রেশ্বর, তেলিনীপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের পূর্বতন অধিবাসী কৈবর্ত, বাগ্দী, ডোম, যুগী, তাঁতী, নিকারি ও পাঁজারি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষরা এ অঞ্চলের জমি হারিয়ে গ্রামাঞ্চলে বা অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

তেলিনীপাড়া ও মানকুণ্ডু অঞ্চলে এককালে বহু বাঙালী মুসলমান বাস করতেন। চন্দননগর অঞ্চল সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। বিগত ১৫০ বৎসরের মধ্যে এইসব বাঙালী মুসলমানগণ তাদের পিতৃভূমি

হতে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কখনো এর কারণ উচ্চবর্ণের চাপ, কখনো রুজি রোজগার হারানো, আবার কখনো বা দ্রুত শিল্পায়নের ফলে বাস্তুচ্যুত হয়ে এরা মূলত পার্শ্ববর্তী মুসলমান প্রধান গ্রামাঞ্চলে চলে গেছেন। প্রাচীন ব্যক্তিদের নিকট হতে আমরা জানতে পেরেছি তেলিনীপাড়ার গঙ্গাতীরবর্তী মালাপাড়া ও পাঁজারিপাড়া অঞ্চলে বহু বাঙালী মুসলমান ছিলেন। পাঁজারি ও নিকারি সম্প্রদায়ভুক্ত এই মুসলমানরা, বর্তমানে যেখানে ভিক্টোরিয়া জুটমিল, সেখানে বাস করতেন। জুটমিল হবার ফলে তারা বাস্তু ও জীবিকাচ্যুত হয়ে পড়েন। এইসব বাঙালী মুসলমান বাসিন্দাদের এখনো কেউ কেউ তেলিনীপাড়া বাজার অঞ্চলে বাস করেন। তেলিনীপাড়ার মুসলমানপাড়া লেনে বসবাসকারী শেখ রোশনের শেষ বংশধর শেখ পণ্ডুর বিধবা স্ত্রী বানুবিবি এবং তার পালিত পুত্র ছাড়া আর কেউ নেই। শেখ পণ্ডুর ঘড়ি বিক্রয় ও মেরামতির বিরাট দোকান ছিল। শেখ রোশনের পৌত্র সারু মিস্ত্রী বাড়িঘর তৈরির কাজ করতেন। এ অঞ্চলে ভালো রাজমিস্ত্রী হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। তেলিনীপাড়ার বহু পুরাতন অট্টালিকা শেখ সারুর হাতে তৈরি। যেখানে ভিক্টোরিয়া জুটমিল, ঐখানে বাঙালী মুসলমানরা তাঁদের প্রিয়জনকে কবরস্থ করতেন। বর্তমানে মিল হওয়ার ফলে তাদের বাসভূমি ও কবরস্থান সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পাঁজারি মুসলমানদের পেশাই ছিল মাছধরা। আর নিকারি সম্প্রদায়ের কাজ ছিল মাছ বেচা। চন্দননগরের হাটখোলায় এখনো কিছু পাঁজারি মুসলমান বাস করেন। কিন্তু তেলিনীপাড়ার মনসাতলা লেনে শেখ ইউসুফ ও শেখ আব্দুল করিম এই দুই ভাইয়ের পরিবারবর্গ বাস করেন। এ অঞ্চলের বহু প্রাচীন অধিবাসী এইসব বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায় অন্য সংস্কৃতির মানুষদের চাপে তাদের নিজস্ব সংকৃতি হারাতে বসেছেন। তেলিনীপাড়ার বুড়া দেওয়ানতলার বুড়া দেওয়ানের যে মাজার আছে, সম্ভবত তার প্রতিষ্ঠা হয় এই বাঙালী মুসলমানদের হাতে।

গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষদের সামাজিক জীবনের উপর বর্গীর হাঙ্গামার প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিল। রাঢ়ভূমির গ্রামাঞ্চলের

জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়েছিল। চাষী, ব্যবসায়ী, কারুশিল্পী ও হস্তশিল্পী, জমিদার, জোতদার কারো নিস্তার ছিল না। দলে দলে মানুষ প্রাণ ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে গঙ্গা পেরিয়ে মধ্যবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। আবার কিছু মানুষ বিদেশী বণিকদের উপনিবেশের আশপাশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। বর্গীরা যে কতবড় সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তার বিবরণ পাই গঙ্গারাম এর 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' গ্রন্থে। চন্দননগরের ফরাসী সীমানার মধ্যে মাত্র একবারই বর্গীরা প্রবেশ করে কিছু লুঠপাট করেছিল। এছাড়া বিদেশী উপনিবেশগুলো তারা এড়িয়েই চলত। বর্গীদের ভয়ে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, পোলবা, সিঙ্গুর ইত্যাদি অঞ্চল থেকে বেশ কিছু পরিবার চন্দননগর, মানকুণ্ডু, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বরে বসতি স্থাপন করেন। এই নবাগতরা সংখ্যায় কম থাকার জন্য এই অঞ্চলের সামাজিক জীবনে বড় ধরণের কোন পরিবর্তন আনতে পারেননি।

আমাদের অঞ্চলে দুটি জমিদার পরিবারের বসতি—তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার ও মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবার। উভয় জমিদার পরিবারের বাংলাদেশের সাত আটটি জেলা জুড়ে জমিদারী ছিল। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, ২৩ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, ইত্যাদি জেলায় এদের জমিদারী ছিল। জমিদারী প্রথার ভালো ও মন্দ—দুটো দিকই এদের জমিদারীভুক্ত অঞ্চলের মানুষরা ভোগ করেছিলেন। শিক্ষাবিস্তার, পথঘাট নির্মাণ, ধর্মস্থান নির্মাণ ও দানধ্যান—এসব ভালো কাজের যেমন ভুরি ভুরি নিদর্শন আছে তেমনি জমিদারদের প্রজা উৎপীড়ন, শাসন ও শোষণের নিদর্শনও বহু আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের মানুষ জমিদারদের বিশেষ করে তাদের আমলাবর্গের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছিলেন, তার কিছু নিদর্শন আমরা সংগ্রহ করেছি। একটি দুটি নিদর্শন দিয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। তবু নিদর্শনগুলির দ্বারা জমিদার-প্রজা সম্পর্ক যে কোন্ খাতে বইছিল তার কিছু আভাস ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের 'চুঁচুড়া বার্তাবহ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রের প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ ও গোবরা গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ পত্রটি তৎকালীন পত্রিকা সম্পাদক দীননাথ মুখোপাধ্যায়কে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। পত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে দেখছি—ঐ গ্রামের জমিদার মানকুণ্ডু নিবাসী বাবু কানাইলাল খাঁন ও বাবু উমাচরণ খাঁন। প্রজাদের অভিযোগ জমিদারের চেয়েও তার কর্মচারীদের প্রতি বেশি। পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক। —"খাঁ বাবুরা রীতিমত ধনী। ইহাদের প্রচুর অর্থ আছে। জমিদারী অপেক্ষা মহাজনী কারবারে বিস্তর টাকা ইহাদের আয়। সুতরাং জমিদারীর প্রতি আদৌ এদের দৃষ্টি নাই। মফস্বলবাসী নিরীহ প্রজারা কর্মচারীগণের অভাবনীয় উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া কিরূপ মনোকষ্টে দিনযাপন করিতেছে তাহার কোন খবর তাঁহারা রাখেন না।"—পত্রের পরবর্তী অংশে নায়েব মহাশয়ের নাম উল্লেখ করে তার অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ আছে। ঘটনাস্থল যদিও নদীয়া জেলা কিন্তু এর পুনরাবৃত্তি খাঁন বাবুদের অন্য অঞ্চলের জমিদারীতেও ঘটত। জমিদারদের উদাসীনতায় প্রজারা কতটা উত্যক্ত ও প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ এই পত্র। আজ থেকে একশো বছর আগে গ্রামের প্রজাদের মধ্যে পত্রিকায় প্রকাশ করার সামাজিক চেতনার সঞ্চার ঘটেছিল, এটি তার প্রমাণ।

নির্বিচারে জমিদারদের কাজকর্ম প্রজারা যে আর সমর্থন করছেন না, এমনকি নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য জেলা জজ কোর্টে মামলা করেছেন তার নিদর্শন পাই ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের হুগলী সাবজজের তৃতীয় আদালতে দায়ের করা একটি মামলায়। তেলিনীপাড়ার যেখানে ভিক্টোরিয়া জুটমিল অবস্থিত, জুটমিল স্থাপনের পূর্বে জমি সংগ্রহের সময় স্থানীয় মানুষদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে জমিদার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ঐ জমি ভিক্টোরিয়া জুটমিল কোম্পানীকে বিক্রি করে দেন। ঐ মামলার কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হল—"তেলিনীপাড়ার যে স্থানে ভিক্টোরিয়া জুটমিল স্থাপনের চেষ্টা চলছে, উহা গঙ্গানদীর

চর। ভিক্টোরিয়া জুটমিল কোং ঐ চরের জমিদার উত্তরপাড়া নিবাসী রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় দিগরের নিকট হইতে ঐ চর বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া তাহাতে কল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে·······বিক্রেতা জমিদার তেলিনীপাড়া গ্রামের অধিকাংশ জমি ঠিকা Tenure বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।" কিন্তু ঐসব জমিজমার পাকা বন্দোবস্ত স্বীকার করার জন্যই মামলা দায়ের করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় মামলায় জয়লাভ করে ঐ চরভূমিতে যাদের জমি ছিল, তাদের বন্দোবস্ত পাকা জমা বলে স্বীকৃত হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি বিদেশী পুঁজির সঙ্গে দেশী জমিদাররা হাত মিলিয়ে পাকা বন্দোবস্তকে ঠিকা বন্দোবস্ত বলে প্রজাদের স্বার্থহানির যে চেষ্টা করেছিল, তা সাধারণ মানুষের প্রতিবাদে ব্যর্থ হয়।

শ্যামনগর নর্থ জুটমিলের জন্য পাইকপাড়া ও ভদ্রেশ্বর মৌজার জমি দখল শুরু হয় গত শতাব্দীর শেষে। ঐ অঞ্চল গঙ্গাতীরবর্তী নিম্নভূমি। বর্ষায় গঙ্গার জল চলে এলেও অন্য সময় চাষবাস হত। বাগবাগিচা ছিল—বিখ্যাত আখড়ার বাগান ছিল। গাড়ুলিয়া নিবাসী হরিচরণ ঘোষ শ্যামনগর নর্থ মিলের পক্ষে জমি সংগ্রহ করেন। ফলে বেশ কিছু মানুষকে সরে যেতে হয়। রামসীতা মন্দির ও শীতলা মাতার মন্দির শোভিত সুন্দর জনবসতি পাইকপাড়ার পরিবর্তন শুরু হল। বিপ্রদাস পিপ্‌লাই এর "মনসামঙ্গলে" উল্লেখিত সমৃদ্ধশালী পাইকপাড়া গ্রাম তার পূর্ব গৌরব হারিয়ে নিছক শ্রমিক বস্তিতে পরিণত হল।

কলকারখানা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তেলিনীপাড়া-পাইকপাড়ার সামাজিক পরিবেশ সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। মৎস্যজীবী কৈবর্ত, পাঁজারি, নিকারি সম্প্রদায় স্বাধীন রুজি-রোজগার হারিয়ে মিলের শ্রমিকে পরিণত হল। গ্রাম থেকে আসা মাটি কাটা মজুররা আর গ্রামে ফিরে গেল না— মিলের শ্রমিক হয়ে গেল। বিহার, উড়িষ্যা থেকে এল কুলমনি সাউ, বৈরাগী সাউ, ছাপরার রহমতুল্লা আর বালিয়ার আমীরচাঁদ সাউ। বাজার,

হাট, দোকান বসল। পশরা সাজিয়ে দোকান দিলেন সিদ্ধেশ্বর সাধুখাঁ, ধ্রুবমণি দাস, নারায়ণ দাস প্রামাণিক, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাধুখাঁ। চন্দননগর হাটখোলা নিবাসী হরিপদ নিয়োগী মহাশয় সোনাচাঁদির দোকান খুললেন। পাল্টে গেল তেলিনীপাড়ার চেহারা। মহামানবের সাগরতীরে বহু মানুষের সমাগমে পূর্ণ হল তীর্থস্থল।

এ যাবৎ আমরা আমাদের অঞ্চলের নানা স্থানে বহিরাগত ব্যক্তি ও পরিবারের আগমনের সংবাদ দিয়েছি। এখন এর বিপরীত ঘটনার বিবরণ দেবো। বহিরাগতদের আগমনের ফলে সমাজের উপর যেমন প্রভাব পড়েছিল ঠিক তেমনি এ অঞ্চলের মানুষ তীর্থদর্শন ও জীবিকা অর্জনের জন্য যখন বাইরে বেরিয়ে ছিলেন—তারও প্রভাব সমাজ জীবনে পড়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বের জীবনযাত্রা ছিল শান্ত, নিস্তরঙ্গ পুষ্করিনীর জলের মত স্থির। ইংরাজি শিক্ষার প্রসার, ব্রাহ্মধর্মের প্রবল আক্রমণ পুরাতন গোষ্টীবদ্ধ জীবনে আনলো আলোড়ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মানুষ তীর্থদর্শন ব্যতীত ঘর ছেড়ে বার হতো না। ধনী জমিদার বা ব্যবসায়ীর সঙ্গীসাথী হয়ে সাধারণ মানুষ তীর্থে যেতো। জমিদার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বাসভূমি ছিল কাশীধাম। সেখানে তাঁর নিজস্ব বাসভবন, শিবমন্দির ইত্যাদি ছিল। তিনি গঙ্গানদীপথে কাশী যাওয়া আসা করতেন। রামধনের গুরুবংশীয় শম্ভুচরণ তর্কপঞ্চানন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রামধনের সঙ্গী হয়ে কাশীধামে তীর্থদর্শনে এসে স্থায়ীভাবে বাস সুরু করেন। পরবর্তী একশতাব্দী ধরে শম্ভুচরণের আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীরা জীবিকা অর্জনের জন্য উত্তর ভারতে এলে শম্ভুচরণের গৃহ তাদের প্রথম যাত্রা বিরতি স্থল হত।

সে যুগে বাঙ্গালীর তীর্থস্থান ছিল তিনটি—পুরীধাম, কাশীধাম ও মথুরা বৃন্দাবন। সাধারণ মানুষদের একজোট করে তীর্থদর্শনে নিয়ে যেতেন তীর্থসাথী বা সেথোরা। সেথোদের তত্ত্বাবধানে প্রথম যুগে স্থলপথে, জলপথে এবং পরবর্তীকালে রেলপথে যাত্রীরা তীর্থদর্শনে

যেতেন। এ অঞ্চলের বিখ্যাত তীর্থসাথী বা সেথো ছিলেন ঈশ্বর পাঠক মহাশয়। তীর্থদর্শনের মধ্য দিয়েই গ্রামীন কুপমণ্ডুকতা কিছুটা কেটে যেত।

সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চির প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজপতি ভৈরবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির পুত্রেরা অন্নদাপ্রসাদের ইংরেজী পাঠশালায় ইংরেজী শিখে কুলকর্ম ত্যাগ করেন। তারা যজন. যাজন, দীক্ষাদান ত্যাগ করে ইংরেজ সরকারের চাকরীর আকর্ষনে উত্তরভারত পাড়ি দেন। আশ্রয় জোটে কাশীতে সম্পকীয় পিতামহ শম্ভুচরণের গৃহে।

ইংরেজরা রাজ্য জয়ের নেশায় এগিয়ে চলে- পিছনে ফেউএর মতো চলে বাঙ্গালী চাকুরী প্রার্থীর দল। রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও সামরিক বিভাগের অসামরিক কাজে নিযুক্ত বাঙ্গালী কেরানীর দল। সারা উত্তর ভারতের সব বড় বড় শহরে ছড়িয়ে পড়ে। বন্দ্যোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য্য) বংশীয়রা কেরাণীগিরি ও ওকালতি সূত্রে লক্ষ্নৌ, বেরিলি, মোরাদাবাদ, সাহারানপুর ও মীরাট শহরে বাসস্থান গড়ে তোলে।

ভারতের রাজধানী যখন কলকাতা হতে দিল্লী চলে গেল। তখন বাঙ্গালী কেরানীর দল চাকরী সূত্রে দিল্লী-সিমলা যাতায়াত সুরু করেন। দেওয়ান বাড়ীর দৌহিত্র বংশীয় চট্টোপাধ্যায় পরিবার দিল্লী-সিমলাবাসী হলেন। তেলিনীপাড়ার গ্রামজীবনে উত্তর ভারতবাসী প্রবাসীরা আনলেন নতুন জীবনযাত্রা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ। অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত মনোভাবে সমাজ জীবনে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটালো।

মানকুণ্ডু-ভদ্রেশ্বরবাসীর জীবনে ঐ পরিবর্তন এলো ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে তাদের ব্যবসাকেন্দ্র ও গদি ছিল। উত্তর ভারতে আসা যাওয়া ও লেনদেনের ফলে কেটে গেল তাঁদের কুপমণ্ডুকতা।

পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বিলাত গমনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিখ্যাত চক্ষুচিকিৎসক ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় চক্ষু চিকিৎসা বিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিলাত

গমন করেন। সেযুগে বিলাত গেলে জাত যেত। সুশীল কুমার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও শিক্ষা ও মানব সেবার জন্য বিলাত যাওয়াকে সামাজিক অপরাধ বলে মনে করেন নি। রক্ষণশীল সমাজ যথারীতি ঘোঁট পাকালো, জাত যাওয়ার ভয় দেখালো। কিন্তু সুশীল কুমারের অনমনীয় ব্যক্তিত্বের নিকট সব ব্যর্থ হল। তেলিনী-পাড়ার সমাজজীবনে বড় ধরণের অগ্রগতি হল।

অন্নদাপ্রসাদ রামমোহনের "আত্মীয় সভা"র সভ্য হওয়ার সময় হতে সুশীল কুমারের বিলাত গমনের মধ্যে এক শতাব্দীর ব্যবধান। সমাজকে সংস্কার করার, গতিশীল করার যে প্রচেষ্টা অন্নদাপ্রসাদ আরম্ভ করেন সুশীল কুমারের বিলাত গমনের মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। শতাব্দীব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যযুগের অবসান হয়ে আধুনিক যুগের সূচনা হয়।

মহামানবের মিলনমেলা বিদেশী শাসকদের চোখে ভালো ঠেকল না। কূট, ধুরন্ধর বিদেশী রাষ্ট্রনেতারা সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে মিলনের সূত্রটিকে ছিঁড়ে ফেলার ষড়যন্ত্র করলেন। বহু প্রাচীন কাল হতেই বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায় তেলিনীপাড়ার বাসিন্দা। তাঁরা হিন্দু প্রতিবেশীর সঙ্গে সুখে দুঃখে একসঙ্গেই বাস করতেন। কখনো কোনদিন বিবাদ বিসম্বাদ হয়নি। কার্জনী দুর্বুদ্ধি (লর্ড কার্জন) ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মুসলমান ভিত্তিতে বাংলা ভাগ করেই সন্তুষ্ট হল না। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ জাগিয়ে রাখল। বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির লক্ষ্য হল—"ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল"—ভাগ করে ভোগ করো।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায় পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট ঈদ উপলক্ষে গো-কোরবানি দেবার আবেদন জানান। স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণ ও ভদ্রেশ্বর পুরসভার সদস্য গিরীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ ব্যাপারে সায় দিতে পারলেন না। বিদেশী মিল মালিক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কর্তৃপক্ষ—এরা তলে তলে উস্কানি দিতে লাগলেন। ফলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। জমিদার চন্দ্রমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায় ও শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই জেলাশাসক ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে হিন্দু জনসাধারণের আপত্তির কথা জানান। তৎকালীন পুলিশের ডি. এস. পি. ললিতমোহন গুপ্ত জেলাশাসকের পক্ষে আলাপ আলোচনা চালালেন। কিন্তু সবই লোক-দেখানি। আসলে বিদেশী শাসকরা তেলিনীপাড়ার হিন্দু মুসলমানের সহাবস্থান ভেঙে দিতে চাইছেন। তাই সব আপোষ আলোচনা অগ্রাহ্য করে তেলিনীপাড়ায় গড়ের ধারে ঈদ উপলক্ষে গো-কোরবানি দেওয়া হল। হিন্দু সম্প্রদায় মর্মাহত হলেও বিদেশী শাসকদের ফাঁদে পা দিলেন না। তাই দাঙ্গা হাঙ্গামা কিছু হল না। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অদৃশ্য চিড় দেখা দিল। পরবর্তীকালে বিদেশী শাসকদের এই অপচেষ্টা স্থানীয় মানুষদের শুভবুদ্ধির ফলে ব্যর্থ হয়। সে যুগের এই ঘটনাটি সারা বাংলাদেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। পত্রপত্রিকায় তো প্রকাশিত হলই এমনকি বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে মৃণালকুমার বসু—"গো হত্যা—তেলিনীপাড়ার শ্রমিক ও ভদ্রলোক" নামে একটি গবেষণা পত্র রচনা করেন। ইতিহাস ঃ অনুসন্ধান ৪ নং গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

আমাদের সামাজিক জীবনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বহুবার আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। বিদেশী শাসক চলে যাওয়ার পরেই বিভেদ সৃষ্টির শক্তি চলে যায়নি। বাহিরের হস্তক্ষেপে বারবার সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা হয়েছে—বারবারই স্থানীয় মানুষদের শুভবুদ্ধির জয় হয়েছে।

আমাদের অঞ্চলে দেশভাগের অব্যবহিত পরে দু এক বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছে। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষ দাঙ্গার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। দাঙ্গা যারা লাগায় তাদের কোন ধর্ম নেই—তারা দাঙ্গাবাজ। দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হিন্দুরা স্থানত্যাগ করেননি কিন্তু দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত বহু মুসলমান পরিবার সে সময় এই স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

বহু শত বৎসর ধরে এ অঞ্চলের হিন্দু মুসলমানগণ শান্তি, সৌহার্দ ও সম্প্রীতির মধ্যে বাস করে এসেছেন। বর্তমান যুগেই সেই গৌরবময় ঐতিহ্য নষ্ট হল। সেই ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সপ্তম অধ্যায়

ধর্মস্থান ও ধর্মাবলম্বীদের কথা

তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর ও সন্নিহিত অঞ্চলে বহু পুরাতন ধর্মমন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। ভদ্রেশ্বরের ভদ্রেশ্বরনাথ বিগ্রহটি অনাদি লিঙ্গ বলে প্রসিদ্ধ। ভদ্রেশ্বরনাথের নামে ভদ্রেশ্বর গ্রামের নামকরণ। উত্তর চন্দননগরের বোড়ো অঞ্চলের বোড়াইচণ্ডীমাতার বিগ্রহ ও মন্দির বহু পুরাতন। খলিসানী অঞ্চলেও কিছু পুরাতন মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব মন্দির বা তীর্থস্থলের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। অনুমান করা যেতে পারে ৫00 বৎসরের চেয়ে বেশী প্রাচীন এইসব মন্দির বা তীর্থস্থল নয়। এ যাবত অনুসন্ধানের ফলে এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিগ্রহ ও পূজার স্থান হিসাবে বিঘাটি গ্রামের চাঁচকাতলার নামই উল্লেখযোগ্য।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বী। মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা হিন্দুর তুলনায় কম হলেও কোন কোন জায়গায় তাদের ঘনবসতি আছে। শিখ, জৈন ও খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এই অঞ্চলের নিম্ন বর্ণের অধিবাসীরা একদিন মূলত বৌদ্ধ ছিলেন। পাল রাজাদের পতনের পর সেন রাজাদের আমলে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ঘটল তখন বাঙালী বৌদ্ধরা ধর্মীয় নিপীড়নের চাপে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য হলেন। কিন্তু হিন্দু সমাজের ধর্মীয় নিপীড়ন, অবজ্ঞা ও অবহেলার জন্য তাঁরা মুসলমান আক্রমণের পরে অধিকাংশই ইসলাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের পূর্ব

সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পাবার চেষ্টা করলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর "বেনের মেয়ে" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সপ্তগ্রামের এক বাগদী রূপা রাজার কথা উল্লেখ করেছেন। সপ্তগ্রামকেন্দ্রীক এই অঞ্চলে একযুগে বৌদ্ধ সহজিয়াগণের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। বৌদ্ধ সহজিয়া বা বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীদের অনেক ধর্মস্থান ও দেবতা হিন্দুদের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের পূজাস্থল হয়ে দাঁড়ায়। এইরূপ এক ধর্মস্থান চাঁচকাতলার অবস্থান সরস্বতী নদীর নিকটবর্তী প্রাচীন ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলের নিকটে অবস্থিত। চাঁচকাদেবী বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী হলেও পরবর্তীকালে হিন্দুদের দেবীতে পরিণত হয়েছেন।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কারুশিল্পী ও বণিক সমাজ 'নবশাখ' (নবশাখা) রূপে চিহ্নিত হলেন। পাল রাজাদের যুগে যেসব বণিক সমুদ্রপারের দেশ দেশান্তরে ব্যবসা করতে যেতেন তারা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। বাংলাদেশের বৌদ্ধ অধিবাসীদের উপরিস্তরের লোকেরা হিন্দুসমাজে গৃহীত হলেন। কিন্তু নিম্ন সমাজের লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আত্মরক্ষা করলেন। আমাদের অঞ্চলে হিন্দু সমাজের পাশে যেসব বাঙালী মুসলমান আছেন তাঁরা মূলত ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধর্মের উত্থানপতনের ইতিহাসের সঙ্গে এখানকার ধর্মব্যবস্থার ইতিহাস যুক্ত। পালেদের পতনের পর বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ল। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে অক্ষম হয়ে বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম ও তার দেবদেবীরা হিন্দু সমাজভুক্ত হলেন। ১৩শ-১৪শ শতাব্দী থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে প্রথমদিকে সংঘাত ও পরে সমন্বয় ঘটেছে।

এ অঞ্চলে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবতা হিসেবে তারা, চামুণ্ডা, চাঁচকা দেবীর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের যুগে এইসব দেবীরা ক্রমশ তারা বা কালী নামের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখলেন। সপ্ত মাতৃকা মূর্ত্তি ব্রাহ্মণী, মহেশ্বরী, কৌমারী,

ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, বরাহী ও চামুণ্ডী। এরা সকলেই কোন না কোন ব্রাহ্মণ্য দেবতার শক্তিরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করলেন। এদের মধ্যে চামুণ্ডাই ছিলেন ব্রাহ্মণদের প্রিয়। চামুণ্ডা দেবীর নানা রূপ কল্পনা করা হয়েছে। যেমন—সিদ্ধযোগেশ্বরী, দন্তুরা, রূপবিদ্যা, ক্ষমা, সিদ্ধচামুণ্ডা, রুদ্রচামুণ্ডা এবং রুদ্রচর্চিচকা। রাজশাহী সংগ্রহশালায় একটি মূর্তি আছে, তার পাদপীঠে চর্চিচকা নামটির উল্লেখ আছে। দেবী শবাসনা ও একটি বৃক্ষের নীচে উপবিষ্টা।

বৌদ্ধ দেবায়তন থেকে যেসব দেবদেবী ব্রাহ্মণ্য আয়তনে প্রবেশ করেছেন তাদের প্রধান এই চর্চিচকা দেবী। বৌদ্ধ তারা দেবী ব্রাহ্মণ্য আয়তনে প্রবেশ করে নাম গ্রহণ করেন কালী এবং দুর্গা। চামুণ্ডার রুদ্র চর্চিচকা মূর্ত্তি ঊর্দ্ধাস্য পাদশালিনী, গজচর্মপরিধানা এবং অষ্টবাহু-বিশিষ্টা। বর্ধমান জিলার কাঞ্চননগরে এবং মন্তেশ্বরে রুদ্রচর্চিচকার মূর্তি পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের বজ্রযানী বৌদ্ধদের চর্চিচকাদেবী ক্রমশ বাংলার সীমা ছাড়িয়ে ভূটান ও তিব্বতের মধ্যে দিয়ে চীন দেশ পর্যন্ত যাত্রা করেন। কবি উমাপতি ধর সংস্কৃত ভাষায় দেবী চর্চিচকার রূপ বর্ণনা করে একটি কবিতা রচনা করেছেন।

আমরা নিম্নে সংস্কৃত কবিতাটির বাংলা অনুবাদ দিলাম।

—হে চর্চিচকে, তোমাকে প্রণাম করি। তোমার লক্ষ নয়নকূপের কণীনিকায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। কুপিত অগস্ত্যমুনি কর্তৃক শোষিত জল সমুদ্রের তলদেশের ন্যায় তোমার উদর গভীর। তোমার আকৃতি অজিনাবৃত ভীষণ শিরাযুক্ত, দন্তাগ্র হইতে উত্থিত দৈত্যরুধিরে তোমার সর্বাঙ্গ লিপ্ত।—

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভদ্রেশ্বরের পশ্চিমে বিঘাটি গ্রামের প্রান্ত-সীমায় চর্চিচকাদেবীর মন্দির অবস্থিত। মানকুণ্ডু স্টেশনের পশ্চিমপ্রান্তে গঁজি গ্রামের প্রান্তসীমাতেও ঐ মন্দিরের অবস্থান। সেহ কারণে ভদ্রেশ্বর স্টেশন বা মানকুণ্ডু স্টেশন থেকে চর্চিচকাদেবীর মন্দিরে যাওয়া যায়। বর্তমানে নবনির্মিত মন্দিরে চর্চিচকাদেবীর অবস্থান। প্রাচীন মন্দিরের বিশেষ কোন চিহ্ন দেখা যায় না। দেবী অত্যন্ত জাগ্রতা। সে কারণে

এ অঞ্চলে অনেক পরিবার অন্তত বৎসরে একবার দেবীর থানে গিয়ে পূজো দেন। সারা দিন থেকে নিজেরা রান্না করে বনভোজন করে ফিরে যান।

দক্ষিণ ভারতেও চর্চিকাদেবী অপরিচিতা ছিলেন না। "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে আছে—"মান্দ্রাজের শ্রীশৈলেদেবীর (সতীদেবী) গুলফ্ পড়িয়াছে। এটি পীঠস্থান। ইহার ভৈরবীর নাম সর্বেশ্বরী এবং ভৈরবের নাম চর্চিতানন্দ।"—

মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে চর্চিতা নামে গ্রাম আছে। মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা দেবীর পরিচয় প্রসঙ্গে "বর্দ্ধমান পরিচিতি"—গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে—"মন্তেশ্বরে চামুণ্ডাদেবীর উৎসব সমারোহের সহিত পালিত হয়। চামুণ্ডাদেবী বৌদ্ধতন্ত্রের চর্চিকাদেবী ব্যতীত আর কেহই নন।" –

ডঃ আশা দাস, তাঁর গবেষণাগ্রন্থ—"বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি"তে দেবী চর্চিকার স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"ভয়ংকরী উন্মত্তা দেবীর পরিকল্পনায় হিন্দু ও বৌদ্ধসাধনায় একইরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মহাচীন-তারা, একজটা, বজ্রচর্চিকা, নৈরাত্মা, বজ্রযোগিনী এবং উড্ডিয়ান কুরুকুল্লা ইত্যাদি দেবী। হিন্দু চামুণ্ডা ও বৌদ্ধ বজ্রচর্চিকা দেবীর রূপগত সংগতি ও সাদৃশ্য আছে। চামুণ্ডার ন্যায় চর্চিকাও অস্থিচর্মসার, প্রলয়ংকরী দেবী। প্রসারিত শবদেহের উপরে এই ভয়ংকরী নৃত্যরতা।"—

ভদ্রেশ্বরের প্রান্তে দেবী চর্চিকার অবস্থিতি প্রমাণ করে যে আজ থেকে বারো-তেরোশো বছর আগে এ অঞ্চলে বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজিয়া মতের কতো গভীর প্রভাব ছিল।

এ অঞ্চলে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের যেসব মসজিদ, দরগা ইত্যাদি ধর্মস্থান আছে তার মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন বুড়া দেওয়ানের দরগা মনসাতলার মস্‌জিদ। স্থানীয় অধিবাসীরা দরগার স্থানটিকে বুড়া দেওয়ানতলা বলে। কোন মুসলমান পীর-এর নামে এই দরগাটি উৎসর্গীকৃত। হুগলী জিলার বিভিন্ন স্থানে বুড়া দেওয়ান সাহেবের দরগা আছে। তুর্কী আক্রমণের তীব্রতা যখন হ্রাস পেল তখন অনেক

মুসলমান সাধক বা পীর তাঁদের চরিত্র মাধুর্যে স্থানীয় মানুষকে আকৃষ্ট করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। চতুর্দশ শতক থেকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এইসব মুসলমান সাধকরা বাংলাদেশের নানা স্থানে তাঁদের সাধনকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। তেলিনীপাড়ার বুড়ো দেওয়ান সাহেব ঐরূপ সর্বজনমান্য শ্রদ্ধেয় পীর ছিলেন। আজো হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বুড়া দেওয়ান সাহেবকে সকলে শ্রদ্ধা ভক্তি করে। বুড়া দেওয়ান পীরের খ্যাতি প্রতিপত্তি কেবলমাত্র তেলিনীপাড়ায় সীমাবদ্ধ নয়।

ধনিয়াখালির থানার সোমসপুর গ্রামে বুড়ো দেওয়ান সাহেবের পীরস্থান আছে। ইনি খুব জাগ্রত পীর। স্থানীয় মানুষেরা পুত্রকন্যা লাভের জন্য এই পীরের কাছে মানত করেন। হারাল-দাসপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত তারাজোড় একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে পীর সুফী সাহেব ও বুড়ো দেওয়ান সাহেবের সমাধি আছে। এই গ্রামে বুড়ো দেওয়ান সাহেবের নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করলে কুকুর বিড়ালে কামড়ানো রোগী ভালো হয়ে যায় বলে স্থানীয় মানুষদের ধারণা। পাণ্ডুয়া থানার রামেশ্বরপুর-গোপালনগর ইউনিয়নের অন্তর্গত নন্দিন গ্রামে বুড়া দেওয়ান সাহেবের সমাধি আছে। পাণ্ডুয়া থানার নানা স্থানে বুড়ো পীরের নামাঙ্কিত পীরস্থল আছে।

উপরোক্ত তথ্য থেকে অনুমান করা যায়, বুড়ো দেওয়ান সাহেব ছিলেন এই অঞ্চলের সকল মানুষের শ্রদ্ধেয় পীর। হুগলী জিলার নানা গ্রামে এই পীরের সমাধিস্থল বা পীরের আস্তানা আছে। তেলিনীপাড়ার আদিযুগে এ অঞ্চলের স্থানীয় বাঙালী মুসলমানরা বুড়ো দেওয়ানের ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর নামে দরগা স্থাপন করেন।

তেলিনীপাড়ায় গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহের তীরে বুড়া দেওয়ানের মাজার অবস্থিত। পূর্বে এই স্থানে কবরভূমি ছিল। নিকটেই কাঙালী বাবার খেয়াঘাট। নদীর অপর পারে গাড়ুলিয়ায় গঙ্গাতীরে কাঙালী-বাবার সমাধি আর এপারে বুড়া দেওয়ান পীরের মাজার। উভয়

সাধকের মধ্যে সাধনার ও ভাবের লেনদেন ছিল। সমসাময়িক সাধক দুজন যেমন ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন তেমনই ছিলেন মানবপ্রেমিক। দীনদুখী মানুষদের বিপদে আপদে, রোগে শোকে সাহায্য করতেন। অলৌকিক শক্তিবলে উভয়েই হেঁটে গঙ্গাপার হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতেন। পীর বাবার মাজার বাঙালী মুসলমান ভক্তরা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কবে স্থাপিত হয় সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। মুসলমান সম্প্রদায়ের পরব উপলক্ষে বুড়া দেওয়ান তলায় মেলা বসে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ভক্তরা পীরের দরগায় ফল, ফুল, মিষ্টান্ন, ধূপধুনা দিয়ে পুজো দেয়। ধর্ম সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ সাধক বুড়ো দেওয়ান ও কাঙালীবাবা—সকল তেলিনীপাড়াবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র।

তেলিনীপাড়ার মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা কম নয়। আদিযুগের বাঙালী মুসলমানরা কিন্তু এ অঞ্চল থেকে প্রায় উৎখাত হয়ে গেছে। তাঁরা সম্ভবত জমিদারদের সামন্ততান্ত্রিক যুগে ব্রাহ্মণ্য-সমাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে গ্রামাঞ্চলের মুসলমান অধ্যুষিত স্থানে সরে গেছেন। বর্তমানে যেসব মুসলমান অধিবাসী এখানে বাস করেন, তাঁরা প্রায় সবাই অবাঙালী মুসলমান। এঁরা মূলত বিহারের ছাপরা, দ্বারভাঙ্গা, পাটনা ও মুঙ্গের অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। এখনো এদের বিহারের আদি বাসভূমির সঙ্গে সম্পর্ক আছে। সে কারণে অনেক অবাঙালী মুসলমান নিজেদের এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা বলে মনে করেন না। অবশ্য এদের কেউ কেউ বিহারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা হয়ে গেছেন। অবাঙালী মুসলমানরা উর্দু ভাষাভাষী। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা ও উপাসনাস্থল পৃথক। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তেলিনীপাড়ার ভিক্টোরিয়া জুটমিল স্থাপিত হয় এবং তার কয়েক বছর পরে নর্থ শ্যামনগর জুটমিল বা ভদ্রেশ্বর মিল স্থাপিত হয়। ঐসব কলকারখানার কর্মী হিসেবে অবাঙালী মুসলমানরা এখানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের ১০০ বৎসরের বসতি স্থাপনের ও ঐ সময়ের পূর্বে স্থাপিত মসজিদ, দরগা ইত্যাদির

ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হল।

আঁধারে আলো ঃ পাইকপাড়া মৌজায় অবস্থিত 'আঁধারে আলো' নামে পীরতলাটি বহু প্রাচীন। তেলিনীপাড়া বাবুরবাজারের নিকটেই গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত এই পীরতলাটি দমকলকেন্দ্রের প্রায় বিপরীতদিকে অবস্থিত। এখানে রয়েছে সৈয়দ বদরুদ্দীন শাহের মাজার। এই ধর্মপ্রাণ, সরল, নিরহংকার পীরসাহেব দুইশত বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হন। তখন ঐ স্থানে বিশেষ জনবসতি ছিল না। পরবর্তীকালে জমিদারী প্রথা প্রচলিত হলে এই অঞ্চল জমিদার সত্যশান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের এলাকার মধ্যে পড়ে। জমিদারগণ মাজারটি ধর্মস্থান অর্থাৎ পীরোত্তর হিসাবে চিহ্নিত করেন। পরবর্তী সময়ে কোন এক অজ্ঞাত কারণে জমিদারদের লাঠিয়ালরা নাকি এটি ভাঙতে আসেন। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসে বুনো মহিষের দেবতা টাঁড়বারো যেমন শিকারীদের হাত থেকে বুনো মহিষদের রক্ষা করেন, তেমনই ভক্তবৃন্দের বিশ্বাস পীরবাবা স্বয়ং পীরস্থান রক্ষা করেন।

পীরস্থানে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় শনিবার উরস্ উৎসব পালিত হয়। তখন বহু জনসমাগম হয়। এছাড়া নিত্য জলপড়া, বাতাসাদান, বাতিদান ইত্যাদির জন্য আসেন হিন্দু-মুসলমান ভক্তের দল। এখানে হেকিমি পদ্ধতিতে চিকিৎসা হয়। বর্তমান চিকিৎসকের নাম খাদিম হাকিম শেখ জুম্মান শাহ্। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে তিনি কুষ্ঠ ও শ্বেতী রোগের চিকিৎসা করে চলেছেন।

তেলিনীপাড়ার বড় মসজিদ ও অন্যান্য মসজিদ ঃ তেলিনী-পাড়াতে বেশ কয়েকটি মসজিদ আছে। এদের মধ্যে বড় মসজিদ ও ছোট মসজিদ প্রধান। বড় মসজিদের যেমন বিশাল আকৃতি তেমনই সুন্দর কারুকার্য। মসজিদটি বহু পূর্বে নির্মিত। মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন স্থানীয় বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়। পরবর্তীকালে অবাঙালী মুসলমান-গণ ছোট মসজিদটিকে বৃহৎ আকৃতি দান করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাজ পড়ে মসজিদের ক্ষতি হয়। তখন পূর্ণ সংস্কার করে এর সম্প্রসারণ ঘটানো হয়। স্থানীয় মুসলমানদের কমিটি মসজিদ পরিচালনা করেন।

পূর্বে মসজিদের সঙ্গে মাদ্রাসা ছিল। বর্তমানে মাদ্রাসা অন্যস্থানে শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত। ঈদ ও বক্‌-ঈদের সময় বিশেষ নমাজের ব্যবস্থা করা হয়। চাঁদা তুলে মসজিদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

বড় মসজিদের নিকটেই ছোট মসজিদ অবস্থিত। এটির বয়স শতবর্ষ। এই মসজিদও পূর্বে বাঙালী মুসলমানদের ছিল। পরে অবাঙালী মুসলমানগণ এর সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন।

তেলিনীপাড়ার মনসাতলার মসজিদটি এ অঞ্চলের সর্ব প্রাচীন মসজিদ। তেলিনীপাড়ার আদি বাসিন্দা বাঙালী মুসলমানগণ মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি তিন/চার শত বৎসর পূর্বের। অবশ্য বর্তমান ইমারত পরবর্তীকালে নির্মিত। প্রাচীন মসজিদের কাঁচা বাড়ীর ওপরই পাকা ইমারত পরবর্তীকালে তৈরী হয়েছে। তেলিনীপাড়ার সমস্ত মসজিদগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সর্বদা ভক্ত সমাগমে পূর্ণ। তেলিনী-পাড়াতে ঈদ্‌গা ময়দান ও কবরভূমি আছে।

বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মস্থান সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ প্রাচীনকালে অন্তত পাঁচশত বৎসর পূর্বে তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু এবং চন্দননগর অঞ্চলে বাঙালী মুসলমানগণের বিরাট বসতি ছিল। তাঁরাই এ অঞ্চলের অন্যতম আদি বাসিন্দা ছিলেন। বর্তমানে এ অঞ্চলে বাঙালী মুসলমানের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। নানা কারণে বাঙালী মুসলমানগণ এ অঞ্চল হতে সরে গেছেন। কিন্তু তাঁদের ধর্মস্থান যথারীতি বজায় আছে। তেলিনীপাড়ার বাঙালী মুসলমানদের ধর্মস্থানের পরিচয় ইতিপূর্বে দিয়েছি। বর্তমানে মানকুণ্ডু, পালপাড়া, চণ্ডীতলা ও কৃষ্ণপটী অঞ্চলের মুসলমানদের ধর্মস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করব। কৃষ্ণপটীর দক্ষিণে ফকিরডোবা, চণ্ডীতলা অঞ্চলে মানিকপীরের স্থান, ফকিরডোবার কবরভূমি অতীতের মুসলমান বসতির সাক্ষ্যদান করছে। চণ্ডীতলার অদূরে মানিকপীরের স্থান এখনও আছে। মানকুণ্ডুর খাঁ পরিবার মানিকপীরের স্থানের জন্য নিষ্কর পীরোত্তর ভূমি দান করেন। পালপাড়া-চণ্ডীতলার প্রবেশপথে পাশে সৈয়দ পীরের মাজার। এখনো তা লাল শালু কাপড়ে ঢাকা দেখা যায়। ধূপ, ধুনো ও গুগ্‌গুলের

গন্ধ ভেসে আসে। এখানে একদিন পীর ফকিরদের আনাগোনা ছিল। কোন ফকির হয়তো ডুবে গিয়েছিলেন, তাই নাম হয়েছে ফকিরডোবা। জনৈক আবদুল সর্দার ইঁদারা খনন করে প্রতি বৎসর ইঁদারা খননের দিন মাঘী পূর্ণিমায় দরিদ্র নারায়ণের সেবা করতেন। বর্তমানে অবশ্য এটি বন্ধ হয়ে গেছে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি ফরাসী অধিকারভুক্ত হয়ে মানকুণ্ডু মৌজার পূর্ব দিকের অংশ মূল মানকুণ্ডু গ্রাম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পূর্বে ঐ স্থান মানকুণ্ডু পূর্বপাড়া নামে পরিচিত ছিল। মানকুণ্ডু স্টেশন রোডের উপর যে পীরতলা বা গাজীতলা আছে তার দক্ষিণে এবং উত্তরে মহাডাঙা অঞ্চলে বহু সংখ্যক বাঙালী মুসলমান বাস করতেন। মহা-ডাঙার একাংশে মুসলমানদের কবর ভূমি ছিল। তাঁদের আরাধ্য পীরবাবার আস্তানা আজ সর্বসাধারণের ধর্মস্থান হয়ে উঠেছে। তেমাথার উত্তরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর আরও একটি পীরতলা আছে। উর্দিবাজারের নিয়াজীপীর সাহেব খুবই জাগ্রত বলে এ অঞ্চলের মানুষের ধারণা। হাটখোলার পাঁজারিপাড়া, বোড়াইচণ্ডীতলা অঞ্চলে বিন্ধ্যবাসিনী পাড়া, বিবিরহাটের পশ্চিমে দেবীপুর যাবার রাস্তার ধারে কাঁটাডাঙ্গায় এবং বুড়ো শিবতলার নিকট আজও বাঙালী মুসলমানগণ বাস করেন। প্রতিটি স্থানেই তাদের উপাসনাস্থল আছে। তেলিনীপাড়া, মানকুণ্ডু, পালপাড়া-চণ্ডীতলা অঞ্চলের আদি বাসিন্দা ছিলেন বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়। আমাদের অঞ্চলের বাঙালী মুসলমানগণ লাগোয়া চন্দননগর অঞ্চলের বৃহত্তর বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তেলিনীপাড়ার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়দের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির বাড়বৃদ্ধি ঘটল। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণ নিষ্ঠাবান হিন্দু। জমিদার বংশের প্রতিস্ঠাতা স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নপূর্ণা দেবীর বিশাল নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করেন। উচ্চবর্ণের মানুষদের আগমনের পূর্বে এ অঞ্চলে যারা বাস করতেন তারা নানা লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চনা করতেন। এ অঞ্চলের নানা পাড়ার নামকরণের মধ্যে ঐসব দেবীর

অস্তিত্বের চিহ্ন রয়েছে। পূর্বদিকে গঙ্গাতীরবর্তী একটি পাড়ার নাম মনসাতলা। দক্ষিণদিকে গঙ্গার পুরনো খাতের উপরে ষষ্ঠীতলা। পাইকপাড়া অঞ্চলে শীতলা বাড়ির আশপাশের অঞ্চলটির নাম শীতলা-তলা। এই তিনটি পাড়ার নামকরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি শীতলা, ষষ্ঠী ও মনসা দেবীর পূজা এ অঞ্চলে বহু পূর্ব হতেই প্রচলিত ছিল। এইসব দেবীরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে গৃহীত হলেও মূলে এরা অনার্য অধিবাসীদের দেবতা ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত এইসব দেবস্থলে পূজা ও মানত করতে মেয়েরা ভিড় করতেন। কিন্তু পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশে এইসব দেবদেবীরা বর্তমানে অতি কষ্টে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন।

জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা ৺বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বতন বাসস্থান মানকুণ্ডু ত্যাগ করে তেলিনীপাড়া গ্রামে বহু জমিজমা ক্রয় করে পুষ্পোদ্যান, পুষ্করিণী ও প্রাসাদতুল্য বাসভবন নির্মাণ করেন। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণা মন্দিরের ১৬৬তম বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা হতে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণের স্বধর্ম নিষ্ঠার প্রসঙ্গটি উদ্ধৃত করা হল—"বৃদ্ধ বয়সে বৈদ্যনাথের কাশী-বাসের ইচ্ছা হয় কিন্তু যাতায়াত, খবরাখবর লওয়া প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত না থাকায় তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে স্বগ্রামে থাকিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূল বারানসী সমতুল এই বিধায় বাংলা ১২০৮ সালে (ইং ১৮০১ খ্রীঃ) ফাল্গুনী পূর্ণিমা (সংক্রান্তি) দিবসে তেলিনীপাড়া গ্রামে অন্নপূর্ণার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং অষ্ট ধাতু নির্মিত শিব ও অন্নপূর্ণার মূর্তি স্থাপন করেন। অন্নপূর্ণা মন্দির এই অঞ্চলের একটি দর্শনীয় মন্দির। নয়টি চূড়া-বিশিষ্ট এমন বিরাট মন্দির একমাত্র মহানাদ ও বাক্‌শা ব্যতীত অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ব্যতীত মন্দির সংলগ্ন নহবতখানা, অতিথিশালা, বৃহৎ জলাশয়, তেলিনীপাড়া গঙ্গাতীরে একটি দেবালয় ও সাধারণের ব্যবহার্য একটি পাকাঘাট, একটি পিতলের রথ নির্মাণ এবং গ্রামটিকে বর্গী ও দস্যু তস্করের হাত হইতে রক্ষার জন্য গ্রামের চতুর্দিকে

একটি পরিখা খনন করেন। ....দেবসেবা, অতিথি সৎকার প্রভৃতি কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বৈদ্যনাথ দশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি শ্রীশ্রীঅন্নপূর্না ঠাকুরাণীর নামে উৎসর্গ করেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি পালাক্রমে সমস্ত দেবদেবীর পূজা ও ক্রিয়াকলাপ অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।"

উক্ত পুস্তিকায় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়দের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের নিদর্শন হিসাবে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তার তালিকা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

১। তেলিনীপাড়ার শিবতলা ঘাটে গঙ্গাতীরে গঙ্গাযাত্রীদের অবস্থানের জন্য দুটি গৃহনির্মাণ।

২। ভদ্রেশ্বর গ্রামে শ্রীশ্রী৺ভদ্রেশ্বরনাথ শিবের মন্দির ও গৃহাদি নির্মাণ।

৩। কাশীধামে বিরাট চূড়াবিশিষ্ট পাথরের মন্দির নির্মাণ ও বৃহৎ শিবলিঙ্গ স্থাপন।

৪। কলিকাতার কালীঘাটে শ্রীশ্রী৺কালীঠাকুরাণীর মন্দির সংলগ্ন দুটি পাকা গৃহনির্মাণ।

৫। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ইছাপুর গ্রামে গুরুগৃহে তিনটি মন্দির নির্মাণ ও শিবলিঙ্গ স্থাপন।

৬। শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর শিবের সেবার জন্য জমিদান।

৭। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার আমডাঙা গ্রামে শ্রীশ্রী৺কালীঠাকুরাণীর সেবার জন্য ৫২ বিঘা জমিদান।

৮। শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী ও শিবের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষে রথযাত্রার জন্য পিতলের রথ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা।

তেলিনীপাড়ার পাইকপাড়া অঞ্চলে একটি পুরাতন রামসীতার মন্দির আছে। বর্তমানে মন্দিরটি প্রায় ভগ্ন। এটি নয়টি চূড়াবিশিষ্ট নবরত্ন মন্দির ছিল। মন্দিরটির নির্মাণকর্তা কে, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। মন্দিরটি ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে ভাগীরথী নদী মন্দির হতে প্রায় ৫00 গজ দক্ষিণে সরে গেছে

পূর্বে অবাঙালী মোহন্তগণ মন্দিরের সেবাইত ছিলেন। পূর্ব মোহন্ত পরলোকগমন করলে তাঁর শিষ্যদের থেকে নতুন মোহন্ত নির্বাচিত করা হত। পরবর্তীকালে স্থানীয় গোস্বামীগণ এই মন্দিরের সেবাইত হন। গোস্বামী বংশীয়া শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর ভগ্নীর পুত্রগণ বর্তমানে এ মন্দিরের সেবাকার্যে নিযুক্ত আছেন।

মন্দিরের মধ্যে অষ্টধাতুনির্মিত রামসীতার মূর্তি বর্তমানে সেবাইতদের গৃহে স্থানান্তরিত হয়েছে। রামসীতার মূর্তি দুটি প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা এবং সুন্দর একটি সিংহাসনের উপর দণ্ডায়মান। বর্তমানে মন্দিরের চারপাশে অবাঙালী সম্প্রদায়ের ঘনবসতি গড়ে উঠেছে। তার ফলে মন্দিরের প্রবেশপথ প্রায় রুদ্ধ। মন্দিরের পূর্বদিকের প্রবেশ পথটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রবেশ পথের উপরে কারুকার্যখচিত ইষ্টকে সমগ্র কৃষ্ণলীলা অঙ্কিত ছিল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঐসব কারুকার্যখচিত ইষ্টক ধ্বংস হয়েছে।

বাংলাদেশে রামের মন্দিরের সংখ্যা খুব কম। হুগলী জেলায় যে কটি স্থানে রামসীতার মন্দির আছে তার অন্যতম তেলিনীপাড়ার পাইকপাড়ার রামসীতার মন্দির। এছাড়া ভদ্রকালী গ্রামে রামবাড়ি তথা রামের মন্দির আছে। গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্র মন্দির পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেরাকোটা মন্দির। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যে বিজয়রাম সেন বিশারদ গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্র মন্দিরের উল্লেখ করেছেন।

তেলিনীপাড়ার রামসীতা মন্দিরের স্থাপত্যের মধ্যে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। মন্দিরের প্রথম তল দ্বিতলের আচ্ছাদনের বক্রতা, রত্নের গাম্ভীর্য, শীর্ষদেশে পীড়ার উপস্থাপনা, পত্রাকৃতি খিলান প্রভৃতি স্থাপত্য রীতির বৈশিষ্ট্য ছিল। অতীতে মন্দিরের আকৃতি ও স্থাপত্য দর্শকদের মুগ্ধ করত। মন্দিরের গায়ে কারুকার্যখচিত ইষ্টকে নানা পত্রপুষ্প কৃষ্ণলীলা ও রামলীলার চিত্র অঙ্কিত ছিল। মন্দিরের স্থাপত্য-গাম্ভীর্য উল্লেখযোগ্য। প্রথম ও দ্বিতলের আচ্ছাদন বক্র এবং বক্রগতি কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। রত্নগুলির রেখাকৃতি এবং

রত্নগুলির সামনে অন্যত্র প্রবেশ পথ ছিল। প্রথম তলের রত্নগুলি চারিটি তলে বিভক্ত। বাড়ের উপর থেকে গণ্ডির পথগুলি চারিটি তলে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে গেছে। সমস্ত রত্নের উপর ছিল কলম ও পতাকাদণ্ড। দ্বিতলের রত্নগুলি প্রথম তলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কিন্তু গঠনে প্রথম তলের অনুরূপ। কেন্দ্রীয় মূল রত্নটি একটি বৃহৎ দ্বিতল কক্ষের অপেক্ষাও বড়। মন্দিরের মূল সৌন্দর্য ছিল এই কেন্দ্রীয় রত্নটি।

শিবলিঙ্গ ও রাধাকৃষ্ণের মন্দির—তেলিনীপাড়া খেয়াঘাটের পাশেই মন্দিরগুলি অবস্থিত। ১৯১৭/১৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশিষ্ট হিন্দু মাতব্বর লোটন সর্দার, ছট্টুলাল চৌধুরী (সর্দার), মিশ্রিলাল সর্দার, রামধনী সাউ প্রভৃতি ব্যক্তিরা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত আছে শিবলিঙ্গ, রাধাকৃষ্ণ ও মহাবীরজীর মূর্তি। মন্দিরের প্রবেশ পথের অদূরে বটবৃক্ষের নিম্নে আরও একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছেন ধর্মপ্রাণ নারায়ণ দাস প্রামাণিক।

মন্দিরের শিবভক্ত সাধক সোমাউর ভারতী দেহত্যাগ করলে ভক্তগণ তার দেহ মন্দিরের উত্তরপূর্ব কোণে সমাধি দেন। স্নানার্থী ও খেয়াপারের যাত্রীগণ ভক্তিসহকারে মন্দিরে পূজা দেন। মন্দিরে নিত্যপূজা ব্যতীত নানা উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ পূজা হয়। গঙ্গার জল হতে ওঠা বাধানো পোস্তার উপর নির্মিত এই মন্দিরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব।

ভদ্রেশ্বরনাথ ও শিব-অন্নপূর্ণার মন্দির—কাশীর বিশ্বনাথ, তারকেশ্বরের তারকনাথের মত ভদ্রেশ্বরনাথ স্বয়ম্ভু। শিবপুরাণে ভদ্রেশ্বরনাথের উল্লেখ আছে। বিদেশী ভ্রমণকারী চার্লস্ যোশেফ বলে গেছেন ভদ্রেশ্বর অতি প্রাচীন শহর এবং ভদ্রেশ্বরনাথ নিজেই আবির্ভূত হয়েছেন। পূর্বে ভাগীরথী নদী মন্দিরের নিকটেই প্রবাহিত হত। বর্তমানে দূরে সরে গেছে। ভদ্রেশ্বরনাথ শিবের পরিচয় মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে শিবপার্বতী সংবাদে উল্লেখ আছে।

ভদ্রেশ্বরনাথ মন্দিরের অন্যতম সেবাইত গঙ্গাধর মিশ্র বলেন—স্বয়ং

ভদ্রেশ্বরনাথের স্বপ্নাদেশে তাঁরা পুরোহিত নিযুক্ত হন। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মন্দিরের পূজার্চনার জন্য বহু নিষ্কর ভূমি দান করেন। বর্তমানে তার কিছুই নেই। তেলিনীপাড়ার জমিদারদের বংশপরিচয়ে লেখা আছে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণ ভদ্রেশ্বরনাথের মন্দির ও শিব অন্নপূর্ণার মন্দির নির্মাণ করেছেন।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মন্দিরগৃহ জীর্ণ ও ভগ্নদশা হলে তেলিনীপাড়া-পাইকপাড়ার রামপ্রসাদ সিংহ ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামনগর নর্থ জুটমিলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভদ্রেশ্বরনাথ ও অন্নপূর্ণা মাতার মন্দির সংস্কার করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন রাজ্যপাল মাননীয় কৈলাসনাথ কাটজু মন্দির পরিদর্শন করে সংস্কার কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ভদ্রেশ্বরনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে। সেই সময় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শিবের মাথায় জল দেন। এককালে তারকেশ্বরের তারকনাথ অপেক্ষা ভদ্রেশ্বরনাথের খ্যাতি ও মাহাত্ম্য বেশী ছিল। শিবরাত্রি ও গাজনের সন্ন্যাস যারা নিতেন তারা পূর্বে "জয় বাবা ভদ্রেশ্বরনাথ" বলেই গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা নিতে আসতেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'য় উল্লেখ আছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গাজনের সন্ন্যাসীগণ—"জয় বাবা ভদ্রেশ্বরনাথ" বলে নাচগান করে পরিভ্রমণ করতেন। কলকাতার গাজন প্রসঙ্গে (চড়ক পার্বণ) বর্ণনা আছে—"গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ী করে তুলেছে। আহার নাই, নিদ্রা নাই, ঢাকের পেচোনে পেচোনে রোদে রোদে রপ্টে রপ্টে বেড়াচ্ছে। কখন "বলে ভদ্দেশ্বরে শিব মহাদেব"—চীৎকারের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে।"

সত্যাশ্রম—বলাগড় শ্রীপুরের অধিবাসী সাধক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ম উপলক্ষে ভদ্রেশ্বরে বাস করতেন। তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীর আশীর্বাদ-পুষ্ট হয়ে সমগ্র হিমালয়, কৈলাস-মানসসরোবর পরিক্রমা করে প্রায় বারো বৎসর পর ভদ্রেশ্বরে ফিরে এসে সত্যাশ্রম স্থাপন করেন। ত্রৈলঙ্গস্বামী

তাঁর নাম দেন 'স্বামী অভয়ানন্দ'। প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে স্বামী অভয়ানন্দের একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্তমানে একটি ট্রাষ্টি বোর্ড আশ্রম পরিচালনা করে। সেবা ভাণ্ডারের মাধ্যমে সাধক, অতিথি ও অভ্যাগতদের আহারের ব্যবস্থা করা হয়। গঙ্গার তীরে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে আশ্রমটি অবস্থিত।

শ্রীশ্রীজগৎগুরু মঠ—ভদ্রেশ্বরে গঙ্গাতীরে জগৎগুরু মঠ অবস্থিত। মঠের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণদাস ও প্রভাসচন্দ্র মণ্ডল। প্রভাসবাবু যিনি চঞ্চল নামে স্থানীয় মানুষদের নিকট পরিচিত ছিলেন। তিনি ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতা-রামদাস ওঙ্কারনাথের ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। মঠে ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের পটের সঙ্গে পরমগুরু দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের পট আছে। আছে লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ। পরধর্ম ও পরমতসহিষ্ণুতার নিদর্শন হিসাবে আছে শিখ সম্প্রদায়ের গুরু নানকের পট। মঠে নিত্যপূজা ব্যতীত দুর্গাপূজা ও কালীপূজা হয়। গঙ্গার তীরে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে মঠটি অবস্থিত। মঠের দায়িত্বে আছেন আশ্রম সেবক—কিংকর সংযমানন্দ।

তেঁতুলতলা জগদ্ধাত্রী পূজার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—দ্বিশতবার্ষিক স্মারক পুস্তিকা হতে গৃহীত। মৃত্যুঞ্জয় সাহা রচিত ইতিহাসের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল।

—"স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবাব মীরকাশিমের রাজত্বের সময় ১৭৬৪ খ্রীঃ অথবা তার দু-চার বৎসর আগে এই পূজার প্রচলন করেন। ····প্রথম বৎসর পূজা পর্ব শেষ করে রাজা বিশ্বস্ত কর্মচারীদের অনুদান (মাধ্যমে) বাংলার সর্বত্র এই পূজা প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের মধ্যে অন্যতম হলেন ৺দাতারাম সুর। এই দাতারাম সুর মহাশয় পূজার অনুদান লাভ করে গৌরহাটী গ্রামে তাঁর দুই বিধবা কন্যার বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার অনুষ্ঠান করেন।"—

সেই পারিবারিক পূজা ৩০ বৎসর পরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হতে জনসাধারণের সর্বজনীন পূজা হিসাবে আজও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এরপর ১২১৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে) ভদ্রেশ্বর গঞ্জের প্রতিষ্ঠা

হলে সেখানকার মহাজনগণ এই মাতৃপূজার প্রবর্তন করেন।

পালপাড়ার জগন্নাথদেবের মন্দির—পালপাড়ায় জগন্নাথদেবের মন্দিরের বর্তমানে ভগ্নদশা। পুরোহিত তথা পরিচারক গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে মন্দিরের বর্তমান অবস্থা পূর্বে ছিল না। জগন্নাথদেবের পূজা ও রথযাত্রা ধূমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। ইছাপুর-নবাবগঞ্জের ধনী ব্যবসায়ী মণ্ডল পরিবার জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মণ্ডলরা আত্মীয় কুটুম্বিতা সূত্রে মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত। খাঁন পরিবারও জগন্নাথদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। খাঁনেরা পূজা অর্চনা ও রথযাত্রা ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহের জন্য বেশ কিছু দেবোত্তর জমি দান করেছিলেন। বর্তমানে সেসব জমি বেহাত। ফলে পরিচারক বা সেবাইত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর নিজ সাধ্যানুযায়ী পূজার্চনার ব্যবস্থা করেন। অতীতে জগন্নাথদেবের রথ চণ্ডীতলার পুরনো ইঁদারার নিকট মাসীর বাড়ি পর্যন্ত যেত। বর্তমানে রথযাত্রা বন্ধ। জগন্নাথদেবও ভগ্ন মন্দির হতে পাশের চালাঘরে স্থানান্তরিত।

মানকুণ্ডু গ্রামের ধর্মস্থান—মানকুণ্ডু গ্রামের পূবপাড়ায় (বর্তমানে চন্দননগর কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত প্রাক্তন ফরাসী এলাকা) দশভূজা দেবীর বাংলা আটচালা ধরণের মন্দির আছে। মন্দিরটি অতি প্রাচীন-কালের নয়। মন্দিরটিতে কোন টেরাকোটার কাজ নেই। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মজুমদার বংশীয় কোন ধনী ধার্মিক ব্যক্তি। দশভূজা মূর্তিটি একটি সোনার ফলকে উৎকীর্ণ আছে। অতীতে দুবার মন্দির থেকে সোনার ফলকটি চুরি যায়। বর্তমানে তামার ফলকে দেবীর নিত্যপূজা হয়।

মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবারের কুলদেবতা ও কুলদেবী শ্রীশ্রী দুর্গামাতা, শ্রীশ্রী শ্রীধর জিউ, শ্রীশ্রী মহাকালেশ্বর এবং শ্রীশ্রী অর্দ্ধনাভীশ্বর দেবতা ও দেবীদের প্রতিষ্ঠা করেন খাঁন বংশীয়দের পূর্বপুরুষগণ। খাঁন বংশীয়-গণ মূলত বৈষ্ণব হলেও দশভূজা দুর্গা ও শিবলিঙ্গদ্বয়ের নিত্যপূজা সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রায় চারশত বৎসর পূর্বে এক ঐতিহাসিক

যুদ্ধের ফলে এই দেবদেবীরা খাঁন বংশীয়দের আশ্রয়ে এসেছিলেন। দেবমূর্তিগুলির প্রাপ্তি সম্পর্কে ও দেবোত্তর সম্পত্তির বৈধতা নিয়ে মামলার নিষ্পত্তি ঘটে পশ্চিমবঙ্গের 'Director of Land Records and Surveys' এর একটি প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকার জন্য আমরা প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট অংশ হুবহু উদ্ধৃত করলাম—

"(3) 4 family idols in the house of the well known Khan family of Mankundu. Dist.—Hooghly (Viz, Sree Sree Durgamata, Sree Sree Sreedhar Jew, Sree Sree Mahakaleswar and Sree Sree Ardha Naviswar) happened to be the benificiaries of this Trust Estate.

The creation of this Trust had a solid back ground in history.

These 4 idols happened to belong to the house hold of Raja Kedar Roy. After his defeat at the hands of the Muslim invaders, Kedar Roy distributed his covated family idols amongst his trusted friends to avoid deseroreation of the idols as well as to ensure the seva-puja of the said idols in safe hands.

A forefather of the Khan family of Mankundu after obtaining the 4 idols from Raja Kedar Roy had then brought to Mankundu and installed in separate temples constructed for the said purpose."

লৌকিক দেবদেবী ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী চর্চিকা বহু পুরাতন হলেও তাঁদের 'থান' বা মন্দিরের উৎপত্তি ও নির্মাণ সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। জনশ্রুতি অনুযায়ী তাঁরা অতি প্রাচীন দেবদেবী। ব্রাহ্মণ্য আয়তনভুক্ত পৌরাণিক দেবদেবীদের মূর্তি ও

মন্দিরের মধ্যে মানকুণ্ডুর উপরোক্ত চার দেবতা ও দেবীর মন্দির ও মূর্তি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। সাল তারিখযুক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে বিজড়িত ঐ মূর্তিগুলি এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দেবমূর্তি।

পূর্ববঙ্গের বারভূঁইএাদের অন্যতম চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের কুলদেবতাগণ কি ঐতিহাসিক ঘটনাসূত্রে খাঁন পরিবারের হস্তগত হলেন, তার আনুপূর্বিক বিবরণ আমাদের জানা উচিত। ইতিহাসের পৃষ্ঠা হতে আমরা সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করলাম। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, তাঁর "বঙ্গের বীর সন্তান" গ্রন্থে লিখেছেন—"বিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীপুরে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের রাজধানী ছিল। শ্রীপুর সোনারগাঁ হইতে নয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত।..............কোটীশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরের গগনচুম্বী চূড়া বহুদূর হইতে আকাশপটে চিত্রিত বলিয়া মনে হইত। স্বর্ণনির্মিত দুর্গামূর্তি, স্বর্ণচূড় এক বৃহৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নগরবাসীগণ তাহাকে স্বর্ণময়ী নামে অভিহিত করিত। দুর্গা মন্দিরের অদূরেই দশমহাবিদ্যার বিশাল মন্দির উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান ছিল। ....১৬০১ খ্রীঃ মোগল সেনাপতি মানসিংহ সসৈন্যে বিক্রমপুর উপস্থিত হইলেন।... ......কেদারের মৃত্যুর পর তাঁহার তেজস্বিনী পত্নী, মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী, রামরাজা সর্দার, কালিদাস ঢালী, ফ্রানসিস্ প্রভৃতি সেনাপতিদের সাহায্যে কিছুদিনের জন্য মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। অবশেষে মোগলের হস্ত হইতে বিক্রমপুর রক্ষা অসম্ভব মনে করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন।" —

মানকুণ্ডুবাসী খাঁন পরিবারের পূর্বপুরুষ সুদূর পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরে যুদ্ধক্ষেত্রে কি সূত্রে উপস্থিত ছিলেন তা আমাদের জানা প্রয়োজন। খাঁন পরিবারের পারিবারিক সূত্র হতে জানা যায়— বারভুঁইএাদের বিরুদ্ধে অভিযানরত মোগল সেনাপতি মানসিংহের সৈন্য-বাহিনীর রসদ সরবরাহকারী ব্যবসায়ী হিসাবে খাঁন পরিবারের পূর্বপুরুষ যুদ্ধ অভিযানে সামিল হয়েছিলেন। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে কেদার রায়ের মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যুকালে অথবা কেদার রায়ের পত্নীর শ্রীপুর হতে পলায়নকালে কুলদেবতাদের যাতে মুসলমান

সৈন্যহস্তে অমর্যাদা না হয়, সে কারণে হিন্দু হিসাবে খাঁয়েদের পূর্বপুরুষের হাতে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে মূর্তিগুলি অর্পিত হয়। সম্ভবত ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্পণের ঘটনা ঘটে।

যুদ্ধবিজয়ী রাজা মানসিংহ কেদার রায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শিলাদেবীকে জয়পুরে নিজ রাজধানী অম্বরে নিয়ে যান। এমনকি যথারীতি পূজার্চনার জন্য শিলাদেবীর পুরোহিত শাস্ত্রজ্ঞ বাঙালী ব্রাহ্মণ রত্নগর্ভ সার্বভৌমকে মানসিংহ নিজ রাজধানীতে নিয়ে যান। দশভুজা, মহাকালেশ্বর ও অর্দ্ধনাভীশ্বর মূর্তিগুলি ইতিপূর্বে যদি খাঁয়েদের পূর্বপুরুষের হাতে অর্পিত না হত, তাহলে আমাদের আশঙ্কা, ঐ মূর্তিগুলিও জয়পুরে চলে যেত। খাঁন পরিবারের পূর্বপুরুষ জাতীয় সংকটকালে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় বাঙালী বীরের পূজিত দেবদেবীগণ বাংলাদেশেই আশ্রয় পেয়েছিলেন। খাঁন পরিবারের ঐ পূর্বপুরুষ শত্রু মানসিংহের সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চরিত্র মাহাত্ম্যে কেদার রায় বংশীয়দের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত মূর্তিগুলির রক্ষণাবেক্ষণের গোপন ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। তা নাহলে এ মূর্তিগুলি তাঁর হস্তচ্যুত হয়ে মানসিংহের কবলে পড়ত। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে কিছুটা পৃষ্ঠপোষকের রোষে পড়ার ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। ঐ পূর্বপুরুষ মূর্তিগুলি স্বগ্রাম মানকুণ্ডুতে এনে পৃথক পৃথক মন্দির নির্মাণ করে নিত্যভোগ ও পূজার্চনাদির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন। পূজা অর্চনা, দোল, রাস, দুর্গোৎসব ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য বিস্তীর্ণ জমিদারী দেবোত্তর করে যান। মহাকালেশ্বর ও অর্দ্ধনাভীশ্বর দেবের বর্তমান শিবমন্দির দুটি নির্মাণ করেন মথুরামোহন খাঁন মহাশয়। মন্দিরের নির্মাণকাল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ১২৫২ সন (অর্থাৎ ইং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

অষ্টম অধ্যায়

লৌকিক দেবতা ও ধর্মস্থানের পরিচয়

আমাদের অঞ্চলের আদি বাসিন্দা ছিলেন শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষ। ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের নিচের দিকেই এদের স্থান ছিল। এঁরা প্রাচীনকাল হতে নানা লৌকিক দেবদেবীর পূজা করতেন। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সমাজের দেবদেবীদের পূজা করলেও এঁরা কোনদিন স্থানীয় লৌকিক দেবদেবীদের পূজার্চনা বন্ধ করেন নি। এইসব লৌকিক দেবদেবীদের উৎসভূমি বিভিন্ন। কেউ বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী. কেউ মঙ্গলকাব্যের দেবী, আবার কেউবা সম্পূর্ণ লৌকিক দেবী।

আমাদের অঞ্চলে নানা স্থানে লৌকিক দেবদেবীদের মন্দির বা 'থান' আছে। এদের মধ্যে বিঘাটি অঞ্চলের বৌদ্ধ তান্ত্রিক চর্চিকা দেবী বহু প্রাচীন। আমরা অন্যত্র চর্চিকা দেবী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। ভদ্রেশ্বর-মানিকনগর অঞ্চলে শীতলা-মনসা-বাসুকি এবং ধর্মরাজের মন্দির বা থান আছে। মানকুণ্ডু চণ্ডীতলা অঞ্চলে আছে ওলাইচণ্ডীদেবীর থান। কৃষ্ণপটীতে আছে পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির। তেলিনীপাড়া-পাইকপাড়ায় আছে শীতলা মন্দির, মনসাতলা ও ষষ্ঠীতলা। তেলিনীপাড়া অঞ্চলের বেশ কয়েকটি স্থানে রক্ষাকালী দেবীর পূজা হয়। পূর্বে ভদ্রেশ্বর-মানিকনগর অঞ্চলের বারুইপাড়ায় মহাকালী তথা রক্ষাকালী দেবীর পূজা হত।

পূর্বে লৌকিক দেবদেবীর পূজা করতেন আদি বাসিন্দারা বা তাঁদের পুরোহিতরা। পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের মানুষ এঁদের পূজার্চনা

শুরু করেন। ভদ্রেশ্বরে ধর্মঠাকুরের নামে ধর্মতলা নামে একটি পাড়া আছে। ধর্মরাজদেবের মন্দির আছে মাঝেরপাড়ায়। ভদ্রেশ্বরের শীতলা খুবই জাগ্রতা দেবী। তাঁর 'থান' টি 'মায়েরতলা' বলেও পরিচিত। শীতলা মন্দিরের পুরোহিত মহাশয় বারুইপাড়ার মানুষদের অনাচারে শীতলা মায়ের ক্রোধে কীভাবে বারুইপাড়ার মানুষ মারাত্মক বসন্তরোগের মড়কে উজাড় হয়ে গিয়েছিলেন, তার অলৌকিক কাহিনী আমাদের শোনান। অলৌকিক কাহিনীর অন্তরালে ধর্মসম্প্রদায়গত বিরোধের ইতিহাস লুকানো আছে। মহাকালী বা রক্ষাকালী দেবীর ভক্ত বারুইপাড়ার অধিবাসীরা শীতলা দেবীর কাছে মাথা নত করেছিলেন। 'মায়েরতলা' বা শীতলাতলার ক্রমবিকাশের কাহিনীও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। মন্দিরের নামের ক্রমপরিবর্তন বিশেষ লক্ষ্যনীয়।

শীতলা দেবীর সঙ্গে মনসা ও বাসুকি নামের যেমন সংযোগ ঘটেছে অপরদিকে ওলাবিবির নাম বর্জিত হয়েছে। নামের সংযোজন ও বর্জন বেশ ইঙ্গিতবহ। মানকুণ্ডু চণ্ডীতলার চণ্ডীদেবী আসলে ওলাইচণ্ডী দেবী। একই দেবী হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারা পূজিত হতেন। হিন্দুর ওলাইচণ্ডী ও মুসলমানের ওলাইবিবি। ওলাইচণ্ডী মারাত্মক ওলাওঠা বা কলেরার দেবী। দেবী রুষ্ট হলে ওলাওঠার মড়ক আর তুষ্ট হলে মড়কের ক্ষান্তি। ওলাইচণ্ডীর কোন মন্দির নেই। আছে বাঁধানো থান। ফাল্গুন মাসে বিশেষ দিনে মহাসমারোহে বলিদান দিয়ে পূজা করেন আলতাড়া-বিঘাটি-ধিতাড়া-গঁজি ও ব্যাজড়া প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষ। সে সময়ে মেলাও বসে। পূর্বে নির্জন বনভূমির মধ্যে দেবীর 'থান' ছিল। অবশ্য বর্তমানে মনুষ্যবসতি হয়ে পরিবেশগত পরিবর্তন ঘটেছে। নির্জনতা কমে গেলেও চারিদিক তেঁতুলগাছের ছায়ায় শীতল পরিবেশে মানুষের মনে ধর্মভাব জাগ্রত হয়। চণ্ডী মায়ের নামে স্থানটি চণ্ডীতলা বলে পরিচিত। দেবীর পূজার্চনার জন্য মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবারের দেওয়া দেবোত্তর জমি ছিল। থানের বর্তমান পরিচারক গঙ্গোপাধ্যায়

বংশীয়গণের নিকট হতে জানা গেল যে, দেবোত্তর সম্পত্তি বেহাত। পরিচারক বা সেবাইত মহাশয় যথাসাধ্য পূজার্চনার ব্যবস্থা করেন।

তেলিনীপাড়া-পাইকপাড়ার শীতলাতলায় আছে শীতলা মায়ের মন্দির। পূর্বে বেশ ধূমধামের সঙ্গে শীতলা পূজা হত। গ্রামের মহিলারা দলে দলে শীতলা দেবীর পূজা দিতেন। পূর্বে শীতলা দেবীর সেবাইত ছিলেন দাস পরিবার। পরবর্তীকালে সন্তোষ কুমার আদক মাতুল বংশের সম্পত্তির সঙ্গে পারিবারিক দেবী শীতলা মাতার সেবাইত নিযুক্ত হন। আজ থেকে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে সন্তোষ কুমারের মাতামহীকে দেবী স্বপ্ন দিয়ে জানান যে তিনি গঙ্গাতীরে অবস্থান করছেন। তাঁকে গৃহে এনে যেন প্রতিষ্ঠা করা হয়। আদেশ অনুযায়ী ভাগ্যবতী ও ভক্তিময়ী রমনী এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ঘাট হতে পাষাণময়ী দেবীকে নিয়ে এসে পাইকপাড়ায় নিজগৃহে প্রতিষ্ঠা করেন। কারুকার্যমণ্ডিত কষ্টিপাথরের গর্দভবাহিনী দেবী মূর্তি।

দেবী অত্যন্ত জাগ্রতা এবং ভক্ত বৎসলা। দেবীকে ঘিরে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। লাল শাড়ী পরে অল্পবয়সী বালিকার মূর্তি ধরে মা মন্দিরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতেন। স্থানীয় মহিলাবৃন্দ প্রতি শনি, মঙ্গলবার ঘটা করে পূজা দিতেন। মাঝে মাঝে ছাগ বলি দেওয়া হত। শীতলা ষষ্ঠীর দিন মেলা বসতো—বহু জনসমাগম হতো। আদক পরিবারের বাড়ী বিক্রয় হওয়ার পর দেবী বর্তমানে চন্দননগরে পুরোহিত পরিবারের আশ্রয়ে আছেন।

কৃষ্ণপটীর পঞ্চাননদেব বর্তমানে সর্বজন পূজ্য গ্রামদেবতা। কিন্তু পূর্বে ইনি সম্ভবত যুগী বা যোগী সম্প্রদায়ের নিজস্ব দেবতা ছিলেন। মন্দিরের পাশে যোগীপাড়া। পঞ্চাননদেব যে পূর্বে যোগীদের নিজস্ব দেবতা ছিলেন, আমাদের ঐরূপ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় বিনয় ঘোষ মহাশয়ের—"পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" গ্রন্থে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত—"পশ্চিমবঙ্গের লোক সংস্কৃতি" গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে—"বাবাঠাকুর, পঞ্চানন্দ, পঞ্চানন ইত্যাদি বিভিন্ন নাম। অধিকাংশ স্থানেই পূজারি

ব্রাহ্মণ, দু-এক স্থানে নাথযোগী সম্প্রদায়ের পুরোহিত ও সেবাইত দেখা যায়। শিবের সঙ্গে আকৃতিগত ও বেশভূষায় মিল আছে।.......ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এই দেবতার মানোন্নয়ন করে শিবের সমকক্ষ করেছেন। নাথ-যোগীদের ধারণা ধর্মঠাকুর, পঞ্চানন্দ ও পঞ্চানন মূলত একই দেবতা।"—

কৃষ্ণপটীর পঞ্চানন ঠাকুর যে নাথযোগীদের নিজস্ব দেবতা ছিলেন—একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আমাদের অনুমানের কথা জানালাম মাত্র। তেলিনীপাড়া বাজার অঞ্চলে মনসাতলায় মনসাদেবীর পূজার্চনা হত। যেমন সাঁতরাপাড়ার প্রান্তেই গঙ্গানদীর প্রাচীন তটের পাশে ষষ্ঠীতলার অবস্থান আছে। মনসা ও ষষ্ঠী উভয় দেবীর পূজা হয়। তবে উভয়েরই পূর্ব গৌরব আর নেই।

শতবর্ষ পূর্বে গ্রামবাসীদের কল্যাণ কামনায় তেলিনীপাড়া নিবাসী তান্ত্রিক সাধক উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রক্ষাকালী মাতার বেদি প্রতিষ্ঠা করে তান্ত্রিক মতে মায়ের পূজা শুরু করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবেশী চুনিলাল ভড়ের স্ত্রী শশীবালা ভড় (ক্ষুদিকালী), কার্তিকচন্দ্র দাস ও অন্যান্যরা বাঁকুড়ার জয়রামবাটী গ্রামের নিকট সিহড় গ্রাম নিবাসী মহাতান্ত্রিক সাধক শ্রীমৎ শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের সহায়তায় অপর একটি স্থানে রক্ষাকালী দেবীর পূজার্চনা শুরু করেন। শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ শশীবালা দেবীর দীক্ষাগুরু হিসেবে দেবীপূজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত রক্ষাকালী দেবীর পূজা বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেলেও ক্ষুদিকালী প্রতিষ্ঠাতা দেবীর যথারীতি বৎসরে দুবার পূজার্চনা হয়। পূর্বে পূজার সময় দেবীর সম্মুখে শশীবালা (ক্ষুদিকালী) র উপর দেবীর ভর হত। সেই অবস্থায় তাঁর মধ্যে নানা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ হত। বর্তমানে মায়ের স্থানের পূর্ব গৌরব বজায় না থাকলেও ভক্তগণ ভক্তিসহকারে পূজা অর্চনা করেন। মায়ের একান্ত ভক্ত শিশির চট্টোপাধ্যায় ও আরো কয়েকজন

ভক্তের চেষ্টায় বর্তমানে মায়ের বেদির ওপর পাকা আচ্ছাদন নির্মিত হয়েছে।

আমাদের সন্নিহিত অঞ্চলে নানা লৌকিক দেবদেবী আছেন। তাঁদের কিছু পরিচয় দেওয়া উচিত। মানকুণ্ডু ষ্টেশনের পশ্চিমে আলতাড়া গ্রামের বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির বহু প্রাচীন। জনশ্রুতি আছে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে এক কাপালিক দেবীর শিলাময়ী মূর্তিকে জনৈক গ্রামবাসীর হস্তে অর্পণ করেন। বর্তমান সেবাইত অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষ বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির নির্মাণ করে পুরুষানুক্রমে পূজো অর্চনা করে আসছেন। এই বংশে মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় অমিত বলশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁর শক্তি ও সাহস সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজা দেবীর পূজার জন্য ৮৫ বিঘা জমি দেবোত্তর করে দেন। বর্তমানে সরকার সেই জমি অধিগ্রহণ করে নিয়েছেন।

প্রতি বৎসর স্নানযাত্রার দিন দেবীর বার্ষিক পূজা হয়। সেদিন গ্রামবাসীর বাড়ী বাড়ী অরন্ধন—সকলেই দেবীর খিচুড়ি ভোগ গ্রহণ করেন। দুর্গাপূজার মহানবমীর দিন এখন ৩০/৩৫ টি ছাগ বলি হয়—পূর্বে শতাধিক বলি হত। দেবীর মৃন্ময়ীমূর্তি ১২ বৎসর অন্তর বিসর্জন দিয়ে নব কলেবর দান করা হয়।

বিশালাক্ষী দেবীর উৎস ও স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। অনেকে দেবীকে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী বলে মনে করেন। অন্যেরা অবশ্য দেবী কালীর রূপান্তর মনে করেন। সম্ভবত বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী বাগীশ্বরী—বাশুলী—বিশালাক্ষী এক অভিন্ন দেবী।

গ্রাম বাংলার নানা স্থানে বিশালাক্ষী দেবীর মূর্তি ও মন্দির আছে। এর মধ্যে বিখ্যাত চেতুয়া—বরদার বিশালাক্ষী, শিয়াখালার বিশালাক্ষী দেবী ও সেনেটের বিশালাক্ষী দেবী। আমাদের সন্নিহিত অঞ্চল সিঙ্গুরের পুরুষোত্তমপুরের বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির প্রাচীন।

চন্দননগরের পশ্চিমে খলিসানী গ্রামপ্রান্তে একটি প্রাচীন বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির আছে। দেবানন্দপুর গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী অত্যন্ত জাগ্রতা। ভদ্রেশ্বর-মানকুণ্ডুর উত্তর ও পশ্চিমে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে দশম-একাদশ শতাব্দীতে পালরাজাদের যুগে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের প্রাধান্য ছিল। বিশালাক্ষী ও চর্চিকা দেবী সেই বৌদ্ধতান্ত্রিক ধারার নিদর্শন।

নবম অধ্যায়

তেলিনীপাড়া ও ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন ও তার পরিণতি

তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন জনমানসে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এই আন্দোলন সনাতনপন্থীদের নিকট ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বা তার কোন স্থায়ী প্রভাবও রেখে যেতে পারেনি। বন্যার প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত জনজীবনের উপর সাময়িক প্রভাব বিস্তার করে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তেলিনীপাড়ার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়দের অন্যতম অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের প্রবর্তক রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। সেইসূত্রে রামমোহন-এর তেলিনীপাড়ায় যাতায়াত ছিল।, অন্নদাপ্রসাদ ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে রামমোহন আত্মীয়সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই আত্মীয়সভার সঙ্গে অন্নদাপ্রসাদের ঘনিষ্ঠতা প্রসঙ্গে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত "আত্মীয়সভার কথা" নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে—

—"অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে কীরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার স্বগ্রাম

তেলিনীপাড়ায় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দেই অর্থাৎ যে বৎসর কলকাতায় প্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বর্ষেই একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর যখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন তখনো তিনি বিপুল উৎসাহে শুধু যে ঐ সমাজ পরিচালনাই করেন, তাহাই নহে, উপরন্তু রামমোহনের রচিত সমস্ত পুস্তক গ্রন্থাবলীর আকারে তিনিই সর্বপ্রথম মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। তিনি অন্তত দুইবার এরূপ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। একবার ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ও অপরবার ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের 'এশিয়াটিক জার্নাল' এ উহার প্রথম সংস্করণের একটি পরিচয় দেওয়া আছে। এবং দ্বিতীয়টির পরিচয় পাওয়া গেল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত 'পথ্যপ্রদান' পুস্তক হইতে। এই পুস্তকের আখ্যাপত্রে স্পষ্টতই মুদ্রিত আছে—

"বিতরণার্থ / শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইল/কলিকাতা ভাস্কর প্রেস/শকাব্দ ১৭৭৯/তেলিনীপাড়া ব্রাহ্মসমাজ।"

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ও অন্নদাপ্রসাদের জীবিতকাল পর্যন্ত উৎসাহের সহিত পরিচালিত এই ধর্ম প্রতিষ্ঠানটির নাম—"তেলিনীপাড়া ব্রাহ্মসমাজ" -হওয়া হইতে—রামমোহনের সময় হইতেই তৎ প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম উপাসনা মন্দিরের নাম যে "ব্রাহ্মসমাজ" ছিল এবং তাহার অনুকরণেই যে অন্নদাপ্রসাদ ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনালয়টির নামও "ব্রাহ্মসমাজ" প্রদান করেন তাহারও প্রমাণ মিলিল। এবং দুইবার বিতরণার্থ রামমোহন গ্রন্থাবলীর প্রকাশ হইতেও এরূপ প্রমান মিলিল যে, রামমোহন-শিষ্যদের মধ্যে অন্ততঃ কেহ কেহ তাঁহার মৃত্যুর পরও তাঁহার প্রচারিত মতবাদের প্রচার করিতে বিরত হন নাই। মহর্ষিদেব ব্রাহ্মসমাজের ভার লইবার আগেই অন্নদাপ্রসাদ রামমোহনের মতবাদের প্রচারে আগ্রহশীল ছিলেন। এই তেলিনীপাড়া ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'আত্মচরিত' এ লিখিয়াছেন—

—"তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই সমাজের কর্তা

ছিলেন। ওই সমাজের কার্য ঠিক রামমোহন রায়ের সমাজের কার্যের ন্যায় সম্পাদিত হইত। অন্নদাপ্রসাদ বোধহয় ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। যতদিন তিনি ছিলেন ততদিন ওই সমাজ ছিল।”

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু যে কেবল রামমোহনের গ্রন্থাবলী দুইবার প্রকাশ ও বিতরণ করেন তাই নয়, তিনি নিজে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে (১৮ই ফাল্গুন ১২৪৬ বঙ্গাব্দ) 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়।—“তেলিনীপাড়া নিবাসী যশোরাশি শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিমা পূজার বিপক্ষে বঙ্গভাষায় এক গ্রন্থ শীঘ্র প্রকাশ করিবেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের পূর্বচরিত্র এবং অবস্থা স্মরণ করিয়া চমৎকৃত হইলাম যে এইদেশ হইতে এতাদৃশ পুস্তক প্রকাশিত হইবেক। অতএব আমরা উক্ত বাবুকে এই এক সৎ পরামর্শ প্রদান করি যে তিনি মূলে জলদান করুন অর্থাৎ স্বদেশের মধ্যে অতি ত্বরায় যত্নপূর্বক এক বিদ্যালয় স্থাপনান্তর তথায় সুশিক্ষা দ্বারা ছাত্রদিগের মনোবশ করিয়া পশ্চাৎ তাহাদিগকে উক্তরূপ গ্রন্থ অধ্যাপন করাইলে তাঁহার মনোভীষ্ট অচিরাৎ সিদ্ধ হইতে পারে।”—প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অন্নদাপ্রসাদ ইতিপূর্বে ১৮৩৯ খৃঃ স্বগ্রাম তেলিনীপাড়ায় এক ইংরাজি স্কুল স্থাপন করেন।

অন্নদাপ্রসাদের প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ সংক্রান্ত তথ্যটির উল্লেখ করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” গ্রন্থে।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ প্রগতিপন্থী ও রক্ষণশীল এই দুই দলের মধ্যে তর্কবিতর্ক বেশ জমে উঠেছিল। একদিকে রাজা রামমোহন রায়ের দল, অপরদিকে রাজা রাধাকান্ত দেবের দল। দুই রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলুখাগড়াদের প্রাণ গিয়েছিল কিনা জানি না, তবে ধর্ম আন্দোলন বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল। প্রাচীনপন্থীরা রামমোহন রায়ের নামে গান বেঁধে লোক দিয়ে গাইবার ব্যবস্থা করেছিল। সেযুগে ছেলেবুড়ো

প্রায় সকলের মুখেই গানটি বেশ চালু ছিল।

—সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ি খানাকুল,
বেটা সর্বনাশের মূল,
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল,
ও যে জেতের দফা, করলে রফা
মজালে তিনকুল।—

এই সময় কলকাতাকেন্দ্রীক নাগরিক সমাজ দুই বিরোধী দলে বিভক্ত হয়েছিল। রামমোহন রায়ের দলের প্রধান টাকীর কালীনাথ রায়, (মুন্সী), মথুরানাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। প্রাচীনপন্হীদের দলে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, রামকমল সেন প্রভৃতি শহরের ধনী ব্যক্তিগণ। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় রচিত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্হে প্রসঙ্গটির উল্লেখ আছে। "হুগলী জিলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" গ্রন্হে সুধীরকুমার মিত্র মহাশয় বলেছেন—"ভদ্রেশ্বর ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলনের বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। 'ব্রহ্মসংগীতাবলী' রচয়িতা রায়সাহেব কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস সে আন্দোলনের অগ্রবর্তী ছিলেন।" তিনি কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার রচিত গান ব্রাহ্মসমাজে এখনো গাওয়া হয়।

কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস রেলবিভাগে কর্মরত ছিলেন। রেলব্যবস্হার উন্নতি ও যাত্রীসাধারণের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির জন্য নানা সুপরামর্শ রেলওয়ে বোর্ডকে দেওয়ার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে রায়সাহেব উপাধি দেওয়া হয়। জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকার জন্যই তিনি জনসাধারণের সুখদুঃখ সহজে উপলব্ধি করতে পারতেন।

হরিহর শেঠ মহাশয় 'সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয়' গ্রন্হে চন্দননগর বাগবাজারে একটি ব্রাহ্ম ভজনালয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারের (চন্দননগর) ব্রাহ্ম উপাসনা মন্দির

অঘোরচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন দাস মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত তথ্যসমূহ থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায়, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, তেলিনীপাড়া অঞ্চলে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ব্যক্তি বাস করতেন। এই অঞ্চলে ব্রাহ্ম মন্দির নির্মাণ ও ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের এই ধারণা ও দাবির পিছনে কিছু তথ্যগত সত্য আছে। "সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র" দ্বিতীয় খণ্ডে বিনয় ঘোষ প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে লিখেছেন—"কলিকাতা ও শহরতলীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারকদের বৃত্তির (occupation) একটি তালিকা দেওয়া হচ্ছে। এই তালিকার মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখ আছে। প্রচারকদের বৃত্তির অর্থ যে তিনি জোগাতেন, তারও ইঙ্গিত আছে।

অন্নদাপ্রসাদ তেলিনীপাড়া অঞ্চলের জমিদার হিসাবে সমাজপতি ছিলেন। সেই সমাজপতি যখন হিন্দু সমাজ ভেঙে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে গেলেন তখন স্বাভাবিকভাবে এ অঞ্চলের হিন্দু গুরু, পুরোহিত ও ধর্মস্থানের মোহন্ত, সেবাইতরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁরা একজোট হয়ে অন্নদাপ্রসাদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরন করেন। সনাতনপন্থীদের নেতৃত্ব দেন অন্নদাপ্রসাদের গুরু বংশীয় ভৈরবচন্দ্র তর্কবাচস্পতি মহাশয়। ফলে তেলিনীপাড়ার গ্রাম্যসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। তরুন সমাজ অন্নদাপ্রসাদকেই পথপ্রদর্শক রূপে মেনে নিয়ে হিন্দু সমাজ ত্যাগ করে ব্রাহ্ম ধর্মে আকৃষ্ট হল। এমন কি কেউ কেউ, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করল। অন্নদাপ্রসাদের ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফল স্বরূপ বহু পরবর্তীকালে তেলিনী-পাড়ার অধিবাসী গিরিশচন্দ্র পাল, যিনি কৈবর্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন।

অন্নদাপ্রসাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ অঞ্চলে ব্রাহ্ম আন্দোলন শেষ হয়ে গিয়েছিল—এই ধারণা সত্য নয়। অন্নদাপ্রসাদ সম্ভবত ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। অন্নদাপ্রসাদের দুই বিবাহ সত্ত্বেও কোন সন্তানাদি ছিল না। তিনি সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন নামে দক্ষিণাবাটীর অপর

বন্দ্যোপাধ্যায় শাখার দুই সহোদর ভ্রাতাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। সত্যদয়াল-এর সঙ্গে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। সত্যদয়াল বাবুর জামাতা মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় বাসকালীন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছিলেন। তিনি বেশ কিছুদিন তেলিনীপাড়ায় বাস করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় গিরিশচন্দ্র পাল মন্মথবাবুর নিকটে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পৈতৃক নাম ও পদবী ত্যাগ করে 'ব্রহ্মর্ষি ভাই ব্রহ্মানন্দ' নাম গ্রহণ করেন। তিনি যে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন তা ছিল নববিধান ব্রাহ্মধর্ম। তিনি তাঁর বাড়ির সামনের জমিতে ব্রাহ্ম মন্দির নির্মাণ করার চেষ্টা করলে দেওয়ান বাড়ির বিনয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন। তিনি নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ কৌতূহলোদ্দীপক পুস্তক রচনা করেন। 'মন্মথবাবুর প্রভাবে ঐ সময় বেশ কিছু তরুণ ব্রাহ্মভাবাপন্ন হয়েছিলেন। কেউ কেউ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাও গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে শ্বশুর বংশীয়দের চাপে পড়ে মন্মথবাবু ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। পারিবারিক চাপে পড়ে অন্য তরুণ ব্রাহ্মধর্মমতাবলম্বীগণও সনাতন ধর্মে ফিরে আসেন। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি ভাই ব্রহ্মানন্দ পারিবারিক চাপ এমনকি পরিবেশগত চাপ অস্বীকার করে আজীবন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম হিসাবে মাথা উঁচু করে তেলিনীপাড়ার বুকে বাস করেছিলেন।

প্রবল পারিপার্শ্বিক বিরোধিতা সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্ম ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তেলিনীপাড়ায় তার অস্তিত্ব বজায় রেখে-ছিল। 'আত্মীয়সভা' গ্রন্থে অন্নদাপ্রসাদের মৃত্যুই তেলিনীপাড়া অঞ্চলে ব্রাহ্ম ধর্মের অবলুপ্তির কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। আমাদের মনে হয় অন্নদাপ্রসাদের মৃত্যুই একমাত্র কারণ নয়। তার মৃত্যুর বহু পরবর্তী-কালে জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়দের জামাতা মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় অন্নদাপ্রসাদের ব্রাহ্ম আন্দোলনের ধারাকে বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

প্রশ্ন করা যেতে পারে এ অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মসমাজ কেন অবলুপ্ত

হল। উত্তর হিসাবে বলা যায় অন্নদাপ্রসাদের মৃত্যুই অবলুপ্তির অন্যতম কারণ। কিন্তু দ্বিতীয় কারণই প্রধান। সেটি হচ্ছে—সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রবল প্রতিরোধ। জমিদার বংশীয়গণের গুরু ও পুরোহিত শ্রীভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য তর্কবাচস্পতি ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে আত্মরক্ষা করেন। ব্রাহ্মণ্য সমাজের চাপে জমিদার বংশীয়গণ জামাতাকে সংযত করেন। অভিভাবকদের চাপে তৎকালীন প্রগতিশীল তরুণ সমাজ সাময়িকভাবে পিছু হটেন।

রামমোহনের "আত্মীয় সভা" স্থাপনের লক্ষ্য তো শুধু ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল বাঙ্গালীর সর্বাঙ্গীন মুক্তি। এত বড় মহৎ প্রচেষ্টা প্রাথমিক সাফল্য লাভের পর শেষ পর্য্যন্ত কেন ব্যর্থ হল—তার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

কলিকাতা ব্যতীত বাংলাদেশের নানা শহরে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়েছিল। কৃষ্ণনগর (১৮৪৭ খৃঃ), বর্ধমান (১৮৫১), জগদ্দল (১৮৫২), ডুমুরদহ (১৮৫৩) প্রভৃতি শহরে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের নিকটবর্তী কোন্নগর, চন্দননগর, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বড় বড় শহরে ব্রাহ্ম সমাজ ছিল। বিভিন্ন শহরে সমাজ প্রতিষ্ঠার মূলে স্থানীয় ধনী জমিদার ও প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গ ও কলিকাতা হতে প্রেরিত ব্রাহ্ম প্রচারক ও সংগঠকদের ভূমিকাই প্রধান ছিল। কিন্তু কেবল অর্থ ও সংগঠন দ্বারাই কি এত বড় আন্দোলন গড়ে তোলা যায়?

আমাদের মনে হয় নবদীক্ষিত ব্রাহ্মগণ তাঁদের আচার, আচরণ ও চরিত্র মাধুর্যে স্থানীয় শিক্ষিত মানুষদের মুগ্ধ করেছিলেন। সেই শ্রদ্ধা ও মুগ্ধতাবোধই ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের মূল ভিত্তি। প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর তার "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থে ব্রাহ্ম বরদাবাবুর যে চিত্র ও চরিত্র অঙ্কন করেছেন, তার মধ্যে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন আছে। আমরা প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছি—"বাসার নিকট অনেক গরীব দুঃখী লোক ছিল। তাহাদিগের সর্বদা তত্ত্ব করিতেন। আপনার সাধ্যক্রমে দান করিতেন ও কাহারো পীড়া

হইলে আপনি গিয়া দেখিতেন এবং ঔষধাদি আনিয়া দিতেন। ঐ সকল লোকের ছেলেরা অর্থাভাবে স্কুলে পড়িতে পারিত না, এজন্য প্রাতে তিনি আপনি তাহাদিগকে পড়াইতেন।……তাঁহার মত নম্র ও ধর্মভীত লোক কেহ কখন দেখে নাই।”—

আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসের ঘটনাস্থল, আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম বৈদ্যবাটী। বরদাবাবু কল্পিত চরিত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবে বরদাবাবুর মত সৎ ও ধর্মভীত মানুষ ছিল বলেই তো উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। সত্যই সেযুগে ব্রাহ্মগণ যে শহরেই বাস করুন না কেন তাঁদের চরিত্র মাধুর্যে তাঁরা সকলকে জয় করতেন। মদ্যপান ও অসংযত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বাবু কালচারের যুগে ব্রাহ্মগণের নিঃষ্কলুষ চরিত্র সাধারণ মানুষের মনে গভীর শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়েছিল। আসলে অর্থ নয়, প্রচার নয়—ব্রাহ্মগণের আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা, সহজ সরল জীবন যাত্রা ব্রাহ্মধর্ম প্রসারের প্রধান কারণ।

ব্রাহ্মগণ একদিন বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীকে নতুন জীবন ও পথের সন্ধান দিয়েছিল। সেযুগের শিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মধর্মের মধ্যেই মুক্তির আলো দেখেছিল। অন্নদাপ্রসাদ, দ্বারকানাথ ও কালীনাথের মত ধনী ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের জন্য নয়—রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বরদাবাবুদের মত ঋষিকল্প মহৎ চরিত্রের মানুষের জন্যই সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

আমাদের অঞ্চলেও উন্নত আদর্শ ও মহৎ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। কোন্নগরে ছিলেন শিবচন্দ্র দেব, বাঁশবেড়িয়ায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, চন্দননগরে অঘোরচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন দাস, ভদ্রেশ্বরে কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস, তেলিনীপাড়ায় মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মর্ষি ভাই ব্রহ্মানন্দ। এদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন ব্যর্থ হল! সত্যই কি সব ব্যর্থ হয়েছে?

তেলিনীপাড়ার প্রাণপুরুষ ও যাবতীয় প্রগতিশীল চিন্তার অগ্রনায়ক অন্নদাপ্রসাদের ব্রাহ্মধর্ম বিস্তারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও সামগ্রিকভাবে সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। তিনি যে প্রগতিশীল চিন্তার

বীজ বপন করে গিয়েছিলেন, বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তা অংকুরিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে একদল তরুণ ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শকে বুকে নিয়ে অন্নদাপ্রসাদের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার চেষ্টা করেন। নিবেদিত প্রাণ এই যুবকের দল তেলিনীপাড়ায় অন্নপূর্ণা পুস্তকাগার স্থাপন ও নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে অন্নদা-প্রসাদের সমাজ সংস্কারের ধারাকেই বজায় রেখেছিলেন। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা—অন্নদাপ্রসাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি।

দশম অধ্যায়

শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান

তেলিনীপাড়া অঞ্চলের আদি বাসিন্দারা নিম্নবর্ণের সমাজভুক্ত ছিলেন। সেই সমাজে শিক্ষার তেমন প্রচলন ছিল না। পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা বংশানুক্রমিক বৃত্তিশিক্ষাই তাঁরা করতেন। পুঁথিগত বা প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষার বাইরে সেযুগে লৌকিক শিক্ষাধারা এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কথা বা কথকতা, পুরাণ কাহিনী শ্রবণ, যাত্রা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে লৌকিক শিক্ষার ধারা এ অঞ্চলের মানুষকে কিছুটা উজ্জীবিত করে রেখেছিল। প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বে উচচবর্ণের মানুষদের বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলে পুঁথিগত বিদ্যার সূচনা।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় হিন্দুর শিক্ষা গুরুগৃহকেন্দ্রীক টোল বা চতুষ্পাঠীতে আর মুসলমানের শিক্ষা মক্তব বা মাদ্রাসাকেন্দ্রীক। হিন্দুর চতুষ্পাঠী আর মুসলমানের মক্তব শিক্ষাধারাকে বহন করে নিয়ে চলছিল। তারও পূর্বে বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধদের শিক্ষা ছিল মঠ ও বিহারকেন্দ্রীক। তেলিনীপাড়া অঞ্চলে বিশেষ করে গোন্দলপাড়া, তেলিনীপাড়া ও ভদ্রেশ্বরে বেশ কিছু সংস্কৃত শিক্ষার টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল। "১৮ শতকের বাংলা ও বাঙালী" গ্রন্থে অতুল সুর এ প্রসঙ্গে বলেছেন—পশ্চিমবঙ্গে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য যে কয়টি স্থান প্রসিদ্ধ ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম গোন্দল-পাড়া ও ভদ্রেশ্বর। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন ভদ্রেশ্বর কথাটির মধ্যে

তেলিনীপাড়াকেও তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শিক্ষাবিদ্ অ্যাডাম সাহেব তাঁর—'Adam's Report on Vernacular education in Bengal and Behar' গ্রন্থে বলেছেন,—"Mr. Ward also mentions that Gundulpara and Bhudreshwuru contained each about ten Nyaya schools and valee two or three."—'সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয়' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে হরিহর শেঠ মহাশয় বলেছেন—"অ্যাডাম সাহেবের বঙ্গে দেশীয় ভাষা শিক্ষার বিবরণী হতে জানা যায় যে পুরাকালে গোন্দলপাড়াতে দশটি ন্যায়ের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।"

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রী উইলিয়াম ওয়ার্ড ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যেসকল চতুষ্পাঠী ছিল তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পুস্তিকাটির নাম 'A view of the History, Literature and Mythology of the Hindoos.' তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গোন্দলপাড়া ও ভদ্রেশ্বরে প্রতিটি স্থানে আটটি করে চতুষ্পাঠী আছে। তেলিনীপাড়ার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পূর্ব বাসভূমি মানকুণ্ডু ত্যাগ করে তেলিনীপাড়ায় বসবাস শুরু করেন, তখন তাঁর গুরু পুরোহিত বংশীয়দের তেলিনীপাড়ায় বসতি স্থাপন করান। গুরু বংশীয়দের বেশ কয়েকটি চতুষ্পাঠীও সেই সূত্রে তেলিনীপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হল। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের বংশের কুলজী রক্ষার জন্য সরস্বতী নদীর তীরবর্তী সপ্তগ্রামের দেবানন্দপুর থেকে পণ্ডিত রামশঙ্কর তর্কভূষণ ও তাঁর ছেলে রামজয় তর্কভূষণকে তেলিনীপাড়ায় বসতি স্থাপন করান। ঐসময় জমিদারদের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এ অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। এর ফলে তেলিনীপাড়ার মত ক্ষুদ্র গ্রামে বেশ কয়েকটি চতুষ্পাঠী চালু হয়েছিল। নানা অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এইসব চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ করার জন্য আসতেন। বহিরাগত শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহেই বসবাস করতেন। তাঁদের ভরণপোষণের সব দায়দায়িত্ব জমিদাররাই বহন করতেন। ঐসব

চতুষ্পাঠী স্থাপন ও পরিচালনের সময়কাল ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় চতুষ্পাঠী কেন্দ্রীক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় মানুষদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল। কলকাতা অঞ্চলে সাহেব কোম্পানীদের ব্যবসাবাণিজ্য বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। শাসনকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ হতে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে। শাসনকার্যে ও ব্যবসাবাণিজ্যে উত্তরোত্তর ইংরেজী ভাষার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

কলকাতার নিকটবর্তী ভাগীরথীর দুই তীরের বর্ধিষ্ণু গ্রামের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। চতুষ্পাঠী নয়, ইংরাজী স্কুল, এই হল যুগের দাবী। আমাদের অঞ্চলের নিকটবর্তী বৈদ্যবাটী গ্রামের এক ধনীর দুলালের শিক্ষা নিয়ে তার অভিভাবকেরা যা চিন্তা করেছিলেন আমাদের এই অঞ্চলের সকল অভিভাবকেরও সেই এক চিন্তা হল। আমরা প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের মতিলালের শিক্ষা প্রসঙ্গটির উল্লেখ করলাম। যুগের হাওয়ার ছোঁয়াচ তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশীয়দের মনে লাগল। তাঁরা সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করলেন।

এ অঞ্চলের আধুনিক চিন্তার পথিকৃৎ অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক কুসংস্কার দূর করার জন্য ইংরাজী স্কুল গড়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। ১২৪৬ সালের ৩০শে আষাঢ় (ইং ১৮৩৯ খ্রীঃ, জুন মাসে) তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত হয়—"ইংরাজী পাঠশালা স্থাপন—জিলা হুগলীর অন্তঃপাতী তেলিনীপাড়াস্থ ধনী জমিদার মহাশয়েরা ঐ স্থানে এক ইংরাজী পাঠশালা স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়াছেন, ঐ বিদ্যালয়ের তাবৎ ব্যয় তাঁহারাই নির্বাহ করিবেন।" হুগলী জিলার প্রামাণিক বিবরণী—"Hooghly District Gazeteer" হতে উল্লেখ করা হল—"The Bandyopadhyay patronized Sanskrit learning and established a High English School at Telinipara."

অন্নদাপ্রসাদের ঐ ইংরেজী পাঠশালা স্থাপিত হয় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই ঘটনাটি সেই সময়ে বাংলাদেশের মানুষের কাছে কেমন উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল তার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে নানা পত্র ও পুস্তিকায়। টাকী রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী সংখ্যা পত্রিকায় প্রসঙ্গটির উল্লেখ আছে। "কালীনাথ মুন্সী (১৭৯৭ খ্রীঃ--১৮৪০ খ্রীঃ) টাকীতে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনে রামমোহনের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। আলেকজান্ডার ডাফের ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা প্রথমে বানচাল হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন সমাজে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন ধর্মান্তরকরণের অভিসন্ধি বলে মনে করা হত। কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথের (ভাই) সাহায্যে ডাফ টাকীতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন অবৈতনিক ইংরাজী স্কুল খুলেছিলেন। কালীনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ গ্রামে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন। এই বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যয়ভার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বহন করেছিলেন।"

শিক্ষাবিস্তারে বাংলাদেশের তৎকালীন ধনী জমিদারগণ কত উৎসাহী ছিলেন তার একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় এক বিদায় অভিনন্দন পত্রে। ডেভিড কারমাইকেল স্মিথ সাহেব ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারে খুবই উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর সেই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিদায় অভিনন্দন পত্রে প্রসঙ্গটির উল্লেখ করা হয়েছে।—

শ্রীযুক্ত ডেভিড কারমাইকেল স্মিথ সাহেব বরাবরেষু, —আমরা হুগলী জিলা নিবাসী জমিদার, তালুকদার, পত্তনি তালুকদার····ইত্যাদি নিবেদন করিতেছি। আপনি তের বৎসর এই জিলাতে থাকিয়া····যেরূপ পরহিতার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন ···। ইতি,

ছকুরাম সিংহ, কালীনাথ চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায়, রামধন বাঁড়ুজ্জে, অন্নদাপ্রসাদ বাঁড়ুজ্জে, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

২৫শে এপ্রিল ১৮৩৫/১৩ই বৈশাখ ১২৪২ সাল।

স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে সকলেই বিখ্যাত ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে রামধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশীয়।

হুগলী জিলা অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের জন্য রেভারেণ্ড মুণ্ডী ১৪টি স্থানে স্কুল স্থাপন করেন। স্কুলগুলির পরিচালক ছিলেন রেভারেণ্ড মুণ্ডী। তৎকালীন শাসক ইস্ট ইডিয়া কোম্পানী ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ তারিখে এক নির্দেশ দিয়ে ঐ স্কুলগুলির পরিচালন ব্যয় হিসাবে রেভারেণ্ড মুণ্ডীকে মাসিক আট শত টাকা দেবার আদেশ দেন। ঐ স্কুলগুলি আমাদের এই অঞ্চলে—বিবিহাট (সম্ভবত বিবিরহাট), মানকুণ্ডু, হালদারপাড়া, হাজিনগর, কুলোপুকুরি (সম্ভবত কলুপুকুর) ইত্যাদি স্থানে অবস্থিত ছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক সরকারী অর্থসাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে স্কুলগুলি ক্রমে উঠে যায়।

এই ঘটনায় স্থানীয় শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। নবীন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা যাতে বন্ধ না হয়, সে কারণে অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বগ্রাম তেলিনীপাড়ায় ইংরাজী পাঠশালা স্থাপন করেন। রেভারেণ্ড মুণ্ডীর পরিচালিত স্কুলগুলি উঠে যাওয়ার সঙ্গে তেলিনীপাড়ায় ইংরাজী পাঠশালা স্থাপনের সম্পর্ক আছে। অন্নদাপ্রসাদ নিজের বসতবাটীর দক্ষিণ দিকে তেলিনীপাড়ার প্রধান রাস্তার (ফেরিঘাট স্ট্রীট) উপরে জমিদান করেন। জমি এবং স্কুলবাড়ি সমস্তই অন্নদাপ্রসাদ এবং অন্যান্য বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় জমিদারগণের দানে গড়ে ওঠে। স্কুলবাড়িটি ইঁটের তৈরি পাকা বাড়ি ছিল। তিন-চারটি ঘরে শিক্ষাদান করা হত। অন্নদাপ্রসাদের মৃত্যুর পর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়দের মধ্যে মতভেদের ফলে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। স্কুলবাড়ি ক্রমশঃ ভেঙেচুরে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও ঐ স্কুলবাড়ির দু-একটি দেওয়াল ও মেঝের কিছু কিছু অংশ দেখা যেত। স্থানীয় লোকেরা ঐ স্থানটিকে স্কুলবাড়ির ভাঙা বলত। বর্তমানে ফেরিঘাট স্ট্রীটের উপর যে স্থানে দীপ্তিময় নিয়োগীর বসতবাটী; সেই

স্থানেই ঐ স্কুলবাড়ি অবস্থিত ছিল। ১৮৭০ সালে স্কুলটি বন্ধ হওয়ার ফলে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দিল। নিকটবর্তী স্কুল বলতে চন্দননগরে দুপ্লে স্কুল (সেণ্ট মেরিজ ইন্সটিটিউশান) অথবা গঙ্গানদী পেরিয়ে শ্যামনগর অঞ্চলের স্কুল। যারা আরো ভালো স্কুলে পড়তে চাইত তাদের যেতে হত হুগলী কলেজের স্কুলবিভাগে। যারা হুগলী কলেজের স্কুলবিভাগে পড়তে যেত তারা নৌকো করে যাতায়াত করত। তেলিনীপাড়ার সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো দু-একটি স্থানীয় ছাত্র নৌকাযোগে হুগলী কলেজের স্কুলবিভাগে পড়াশুনা করতে যেতেন।

প্রায় দশ বৎসর স্থানীয় ছাত্রদের দূরবর্তী স্থানের স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা চালাতে হলো। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশীয়গণ ও ভদ্রেশ্বরের শ্যামাদাস মণ্ডলের যুগ্ম প্রচেষ্টায় তেলিনীপাড়া ও ভদ্রেশ্বরের সীমানা মধ্যবর্তী গঙ্গাতীরে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় গড়ে উঠল। স্কুলবাড়িটি প্রথমে যেখানে স্থাপিত হয়েছিল, সেইস্থানে পরবর্তীকালে নর্থ শ্যামনগর জুটমিল স্থাপিত হওয়ায় স্কুলবাড়িটি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপরে বর্তমানে যেখানে স্কুল অবস্থিত, সেখানে উঠে যায়। আমরা মনে করি রেভারেণ্ড মুণ্ডীর ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত স্কুলগুলি হতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত তেলিনীপাড়া--ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্যে যোগসূত্র আছে।

স্থানীয় স্কুল উঠে যাওয়ার ফলে যারা বাধ্য হয়ে শ্যামনগরের স্কুলে পড়তে গিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম তেলিনীপাড়ার চন্দ্রানন চক্রবর্তীর পিতা হরিচরণ চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি শ্যামনগর স্কুল থেকে Vth ক্লাস (ফিফ্থ) (এখনকার ক্লাস VI) পাশ করে হুগলী কলেজের স্কুলবিভাগে পড়াশুনা করতে যান। পরবর্তীকালে তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সদ্য স্থাপিত তেলিনীপাড়াভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হন।

আমাদের অনুমান ১৮৬৫—১৮৭০ এর মধ্যে কোন একসময়

শ্যামনগরের স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে মূলাজোড়ের কালী-বাড়ির উত্তরে, যেখানে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের কারখানা, সেখানে ঐ স্কুলটি ছিল।

শ্যামনগরে স্কুল স্থাপিত হবার পূর্বে ঐ অঞ্চল থেকে ছাত্রেরা গঙ্গা পেরিয়ে অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পড়াশুনা করতে আসতেন। বহু দূরবর্তী স্থান থেকে ছাত্রেরা অন্নদাপ্রসাদের স্কুলে পড়তে আসতেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ত্রৈলোক্যনাথের বাড়ি শ্যামনগরের পূর্ব-দিকে রাহুতা গ্রামে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গাড়ুলিয়া অঞ্চলের এক পয়সার ঘাট পেরিয়ে তেলিনীপাড়ায় আসতেন। কারণ তখন সম্ভবত পাঁজারিপাড়ার ঘাটে খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা ছিল না। ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের শিয়ালদহ—নৈহাটী শাখায় শ্যামনগর স্টেশন স্থাপিত হবার পর মূলাজোড়ের কালীবাড়ির ঘাটের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং লোক চলাচলও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। স্টেশনের যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য পাঁজারিপাড়া ঘাট ও মূলাজোড় ঘাটের ফেরি চলাচল ব্যবস্থা চালু হয়। ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৬০-৬১ সাল নাগাদ তেলিনীপাড়া স্কুলে পড়াশুনা করতে আসতেন। ত্রৈলোক্যনাথের জীবনী গ্রন্থ হতে এই তথ্য পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতূ-হলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করছি। শ্যামনগর নিবাসী এক তরুণ গবেষক (অলোকেশ মুখোপাধ্যায়) ত্রৈলোক্যনাথের জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণাকালে যখন জানতে পারেন যে ত্রৈলোক্যনাথ তেলিনীপাড়ার স্কুলে পড়াশুনা করেছেন, তিনি বহু অনুসন্ধান করেও তেলিনীপাড়ায় ১৮৬০-৬১ সালে কোন স্কুলের সন্ধান পাননি। তিনি অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছে তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়। যখন তিনি প্রায় হতাশ হয়ে অনুসন্ধান ত্যাগের সংকল্প করেন, তখন ঘটনাচক্রে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। তিনি তখন জানতে পারেন, অন্নদাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী পাঠশালাতেই ত্রৈলোক্যনাথ পড়াশুনা করেছিলেন। কেবল ত্রৈলোক্যনাথই নয়, রাহুতা

গ্রামের আরেকজন কীর্তিমান পুরুষ দেওয়ান কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ এক পয়সার ঘাট পেরিয়ে তেলিনীপাড়া স্কুলে পড়াশুনা করতে আসতেন। কান্তিচন্দ্র রাজস্থানের জয়পুর রাজ্যের দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কান্তিচন্দ্রের নাম আজও জয়পুর অঞ্চলে সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখিত হয়। বর্তমানে কান্তিচন্দ্রের নামে তাঁর স্বগ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে শাসকবর্গ ভারতবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির ব্যাপারে নিজেদের দায়দায়িত্ব স্বীকার করতেন না। পরবর্তী-কালে পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশীয় শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যাপারে কিছু কিছু সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেযুগে বেসরকারী ইংরেজরা এবং মিশনারী সম্প্রদায় কিছু কিছু স্কুল স্থাপন করে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন শুরু করেন। রবার্ট মে নামক লণ্ডন মিশনারী সোসাইটিভুক্ত একজন ধর্মপ্রচারক চুঁচুড়া শহরে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি স্কুল খোলেন। পরবর্তীকালে রেভারেন্ড মুণ্ডী হুগলী জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কোম্পানী চুঁচুড়ায় একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। বেসরকারী ইউরোপীয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার পাশাপাশি দেশীয় ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদাররা ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনে মুক্ত হস্তে দান করেছিলেন। হুগলীর জিলা জজ মিস্টার ডি. সি. স্মিথের আগ্রহে হুগলীর জমিদারগণ উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে "সাবস্ক্রিপশন স্কুল" অথবা জমিদারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। স্মিথ সাহেব বিদ্যালয় ভবনের জন্য অর্থসংগ্রহ করে দেন আর জিলার জমিদারবৃন্দ বিনা বেতনে ছাত্রদের শিক্ষার জন্য নিজেরা মাসিক চাঁদা দিতেন। জমিদারদের চাঁদায় স্কুল চলত বলে স্কুলের নাম সাবস্ক্রিপশন স্কুল। ১৮৩৪ সাল নাগাদ এই ঘটনা ঘটে।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় চন্দননগরে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের সংবাদ প্রকাশিত হয়। ভারতস্থ ফরাসী অধিকৃত স্থানসমূহের মূল শাসনকেন্দ্র ছিল পণ্ডিচেরী।

পণ্ডিচেরীর ফরাসী গভর্নমেন্ট ঐ বিদ্যালয় স্থাপনের আংশিক ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে সেন্ট জোসেফ কনভেন্ট স্কুল স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টিতে কেবলমাত্র ছাত্রীগণের শিক্ষালাভের অধিকার আছে। মিশনারী রমণীগণ স্কুলটি পরিচালনা করেন। শিক্ষাদান পদ্ধতি ও নিয়মানুবর্তিতার জন্য স্কুলটি অচিরেই খ্যাতিলাভ করে। চন্দননগর নিবাসী শ্রীকালীকিংকর পালিত মহাশয় চন্দননগরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে অমরপুর নামক স্বগ্রামে একটি ইংরাজী শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল। বিদ্যালয় স্থাপনের প্রসঙ্গটি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত হয়। কালীকিংকর পালিত মহাশয় দানবীর শ্রীতারকনাথ পালিতের পিতা। বিদ্যালয়টির নাম বেনাভোলেন্ট ইন্সটিটুশন। এখানে ছাত্রের সংখ্যা ছিল দেড়শত জনের অধিক। সকল ছাত্রই বিনা বেতনে পড়াশুনা করতেন। বিদ্যালয় পরিচালনার যাবতীয় ভার বহন করতেন কালীকিংকর পালিত মহাশয়।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলাতের কর্তৃপক্ষ ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সেই অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব পাঠান। দক্ষিণবঙ্গের স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর প্রাট্ সাহেব বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গ্রামবাসীদের নিকট হতে তিনখানি আবেদনপত্র পান। দুখানিই হুগলী জিলার। একটি হরিপাল থানার দারহাট্টা গ্রাম ও আরেকটি সিঙ্গুর থানার গোপালনগর গ্রাম হতে আসে। গোপালনগর গ্রামটি আমাদের অঞ্চল হতে মাত্র ৪/৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আজ থেকে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে গোপালনগরের মত পল্লীগ্রাম হতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব আমাদের মনে বিস্ময় ও গর্বের সৃষ্টি করে। সুদূর গ্রামাঞ্চলেও যে স্ত্রীশিক্ষার আগ্রহ জেগেছিল এটাই আমাদের বিস্ময় ও গর্বের কারণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হুগলী জিলার যে ১৭টি বিদ্যালয় ছিল তার কয়েকটি আমাদের অঞ্চলেরই আশেপাশে অবস্থিত ছিল। এদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য বৈদ্যবাটী, তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর, চাতরা, চুঁচুড়া ফ্রী চার্চ ও কোন্নগর এর স্কুলসমূহ।

চন্দননগর শহরের অন্যতম প্রাচীন বিদ্যালয় 'বঙ্গবিদ্যালয়'। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১২৮৮ সালে) বিদ্যালয়টি স্থাপিত। বিদ্যালয় স্থাপনে যারা উদ্যোগী ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানকুণ্ডুর জমিদার ও ব্যবসায়ী কানাইলাল খাঁ, গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ডু, গিরিশচন্দ্র শ্রীমানী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গোন্দলপাড়া নিবাসী কালিদাস বসু, শ্রীশচন্দ্র বসু, রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তেলিনীপাড়া নিবাসী অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুল বন্ধ হয়ে যাবার ফলে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই শূন্যতা দূর করার জন্য স্থানীয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ যে সচেষ্ট হয়েছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ১৮৭১ থেকে ১৮৮১—এই দশ বছর তেলিনীপাড়া অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষার স্কুল ছিল না। ১৮৮১ সাল নাগাদ দক্ষিণ চন্দননগরের বারাসতে স্থাপিত হল বঙ্গবিদ্যালয় এবং ঐ ১৮৮১ সালেই ভদ্রেশ্বর নিবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্যামদাস মণ্ডল নিজের গুদাম বাড়িতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় জমিদারগণের প্রদত্ত গঙ্গাতীরবর্তী ভূমিখণ্ডে তেলিনীপাড়া--ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন হয়। এই প্রসঙ্গে তেলিনীপাড়া--ভদ্রেশ্বর বিদ্যালয়ের একসময়ের সম্পাদক ডাঃ বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'A Glimpse of School History' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—"Though it is a very old message, every student and the local people should always bear in mind the good names of the Founders of this almamater, namely, Late Shyamdas Mondal, the Zamindar of Telinipara, Late Rameswar Khan, Zamindar of Mankundu, Kundus of Mouri and Deys of Barasat, whose fore-

sight removed the darkness of illiteracy of the local people to a great extent."

উপরোক্ত তথ্যসমূহ তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় পত্রিকা 'উন্মেষ' (১৯৬০-৬১'র উদ্বোধন সংখ্যা) হতে গৃহীত। বিদ্যালয় পত্রিকাটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন শ্রীসন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও সুশীলকুমার ভৌমিক। উক্ত পত্রিকা প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বৎসর কোনটি ধরা হবে? ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ নাকি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ? যদি শ্যামদাস মণ্ডল স্থাপিত বিদ্যালয়টি তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর বিদ্যালয়ের অঙ্কুর রূপ হয়, তবে তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বৎসর ১৮৮১ হিসাবেই দাবি করা উচিত। স্কুলের নামাঙ্কিত ফলকে কিন্তু প্রতিষ্ঠা বৎসর হিসাবে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দেরই উল্লেখ আছে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে শ্যামদাস মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর স্কুল উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক কি ছিল। একটিকে কি অপরটির পূর্বরূপ হিসাবে গ্রহণ করা যায়? দুটি এক স্কুল, না পৃথক স্কুল—এ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।

ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রেভারেণ্ড মুণ্ডী সর্বপ্রথম এ অঞ্চলে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নির্দেশে ও অর্থসাহায্যে রেভারেণ্ড মুণ্ডী ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে মানকুণ্ডুতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী সাহায্যের অভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। পরবৎসরেই ইংরাজী বিদ্যালয়ের অভাব দূর হল ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থাপিত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। আবার সেই বিদ্যালয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে গেলে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে সাময়িক শূন্যতা আসে। দশ বৎসরের শূন্যতার পর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ভদ্রেশ্বরের শ্যামদাস মণ্ডল মহাশয় তাঁর গুদামঘরে বিদ্যালয় স্থাপন করে শূন্যতা দূর করেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থাপনের পর ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করে।

শিক্ষাবিস্তারের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে পৃথক পৃথক ভাবে না দেখে একই উদ্দেশ্য ও উদ্যমের ক্রমপরিণতি হিসাবে দেখতে হবে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের রেভারেণ্ড মুণ্ডীর প্রচেষ্টা নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিক ও স্থায়ী রূপ ধারণ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তক ও পথিকৃৎ হিসাবে রেভারেণ্ড মুণ্ডী ও প্রবর্তনের স্থান হিসাবে মানকুণ্ডু আমাদের নিকট চিরস্মরণীয়। মানকুণ্ডুর ঐ স্কুলবাড়ী কোথায় ছিল সে বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন কৃষ্ণপটীর ভূপালচন্দ্র বাগ মহাশয়। কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বাড়ীর সন্নিকটে "স্কুলবাড়ীর পুকুরে"র উল্লেখ করেন। বর্তমানে যে স্থানে আজাদ সংঘের খেলার মাঠ তার পাশেই ঐ পুকুর। ভূপালবাবুরা স্কুল দেখেননি তবে শুনেছেন ওখানে স্কুল ছিল। আমাদের অনুমান ঐ স্কুলবাড়ী রেঃ মুণ্ডীর মানকুণ্ডুর স্কুলবাড়ী। কারণ পূর্বে কৃষ্ণপটীর ঐ অংশ মানকুণ্ডু গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অঞ্চলের প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়সমূহ

প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রতি অঞ্চলেই পাঠশালার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত। ভদ্রেশ্বরে শিবনাথ রানা ও অবিনাশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পাঠশালার সুনাম ছিল। তেলিনীপাড়া অঞ্চলে কানাইলাল বিশ্বাস (প্রতিবন্ধী) ও সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালা ছিল। কানাইলাল বিশ্বাসের পাঠশালা দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল চালু ছিল। তেলিনীপাড়ার মনসাতলার বেচন সা তাঁতীর ও ফেরীঘাট স্ট্রীটে বিজয় সাধুখাঁর দোকানের সম্মুখে খীরু ঠাকুরের পাঠশালা ছিল।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ঊর্ধ্বতন আধিকারিক মিঃ বিশ সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়। ভদ্রেশ্বর পুর এলাকায় দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়। হিন্দী ও উর্দু ভাষার মাধ্যমে বিদ্যাদানের জন্য ভিক্টোরিয়া ওয়ার্ড প্রাথমিক

বিদ্যালয়, যেটি ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে নাম হয় জহরলাল নেহের্ বিদ্যাপীঠ। অপরটি তেলিনীপাড়াতে জুবিলি বিশ ফ্রি প্রাইমারী স্কুল। এই বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব ১৯৭৯ খৃঃ মার্চমাসে অনুষ্ঠিত হয়। আবৃত্তি, বসে আঁকো, নাট্যাভিনয়, ফুটবল প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রধান শিক্ষক শম্ভুনাথ সাধুখাঁর নেতৃত্বে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মানকুণ্ডুর খাঁ পরিবারের কাচারী বাড়িতে মানকুণ্ডু প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টি তেঁতুলতলা লেনে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। পূর্বতন কাচারী বাড়িতে জুনিয়র হাই শ্রেণীর পঠনপাঠন হয়। বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব ১৯৮৭ খৃঃ আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাতফেরী, ব্রতচারী, সঙ্গীতালেখ্য ও নাটিকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রধান শিক্ষক শঙ্করনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

ভদ্রেশ্বরের পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ৩রা জানুয়ারি, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। স্থানীয় ব্যবসায়ী গোপীজীবন ও ভূষণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গদি বাড়িতে। বর্তমানে এটি নিমতলা লেনে নিজস্ব ভবনে উঠে গেছে। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণপটী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শুরু। কৃষ্ণপটী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ওড়িয়াভাষী ছাত্রদেরও পঠনপাঠন হয়।

পৌরসভা পরিচালিত পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা কাউন্সিলের পরিচালনাধীনে আরও কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু আছে। এর মধ্যে বাংলা মাধ্যমের ১৭টি, হিন্দী মাধ্যমের ৬টি এবং উর্দু মাধ্যমের ৫টি বিদ্যালয়। এছাড়া একটি করে বাংলা, হিন্দী ও উর্দু মাধ্যমের জুনিয়র হাইস্কুল বর্তমান। কয়েকটি অননুমোদিত বিভিন্ন ভাষাভাষীদের বিদ্যালয়ও চালু আছে।

বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র—ভদ্রেশ্বর গ্রামের বটকৃষ্ণ ঘোষ তাঁর নিজ বসতবাড়ীতে বিদ্যায়তন নামে একটি বয়স্ক অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র

১৯৩৫/৩৬ সাল নাগাদ স্থাপন করেন। এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগী ছিলেন—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পশুপতি সাহা, অমরেন্দ্রনাথ মিত্র, অমর ঘোষ ও রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি অনাথ ভাণ্ডার ছিল। অর্থ, বস্ত্র ও চাল সংগ্রহ করে দীনদুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করা হত।

ভদ্রেশ্বর বাজারের নিকট বালক সেনের নামাঙ্কিত বাড়ীতে তৎকালীন মালিক মণিলাল সাঁবুই মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ১৯২৫ সাল নাগাদ একটি নাইটস্কুল চালু হয়। ঐ স্কুলে লেখাপড়ার সঙ্গে শরীর চর্চাও হত। স্কুলের পরিচালকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন—সুধীরকুমার মণ্ডল, গোপীনাথ ঘোষ, গণেশচন্দ্র ঘোষ ও ধর্মদাস ঘোষ।

মাদ্রাসা শিক্ষা—তেলিনীপাড়ার ধর্মপ্রাণ মুসলমান সম্প্রদায় বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বাই লেনে হাজিনা সিদুবিবির বাড়িতে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেন। এখানে পড়ানো হয় আরবী, ফার্সী ও উর্দু। শিক্ষার মান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমান। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে আরবিয়া হালফিয়া কাশমীনোলুম মাদ্রাসার বুড়া দেওয়ানতলার পূর্বতন কবরস্থানে বিদ্যালয় গৃহ নির্মিত হয়। মাদ্রাসা জনসাধারণের চাঁদায় চলে। সরকার বিনামূল্যে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান হাদিশ ছাড়া আর কিছুই দেয় না। মাদ্রাসা পরিচালক সমিতি শিক্ষকদের বেতন, তাঁদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। দেড়শ ছাত্রছাত্রীসহ কুড়িজন অনাথ শিশু আছে। অনাথ শিশুদের ভরণপোষণ ইত্যাদি সবকিছুর দায়িত্ব পরিচালন সমিতির। বিদ্যালয় গৃহের মেরামতি ও সম্প্রসারণ প্রভৃতির সব দায়িত্ব পরিচালন সমিতির। বর্তমানে পরিচালন সমিতির সভাপতি আবিদ হুসেন এবং সম্পাদক মহম্মদ ইসলাম নোমানী।

অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

ভদ্রেশ্বর ধর্মতলা বালিকা বিদ্যালয়—প্রেমচাঁদ শিরোমণি লেনে একটি ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে। ঐ মন্দির প্রাঙ্গনে ১৯২৫ খৃঃ নারী

শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ও পরিচালক ছিলেন আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। সুপরিচালিত ঐ বিদ্যালয় বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় রূপে নিজস্ব গৃহে শিক্ষাদান কার্যে রত। এই অঞ্চলে নারীশিক্ষা প্রসারে ভদ্রেশ্বর ধর্মতলা বালিকা বিদ্যালয়ের অবদান সর্বজনস্বীকৃত।

মাতৃভবন—নারী শিক্ষাপ্রসারে তেলিনীপাড়ার "মাতৃভবন" বালিকা বিদ্যালয় দীর্ঘ ষাট বৎসরের অধিককাল ধরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের মাতা পূর্ণাদেবী "মাতৃভবনের" প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের সমগ্র পরিবার বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সে যুগে এ অঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না—তখন পূর্ণাদেবী স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করতেন। মাতৃভবনে শিক্ষাদানের মান অত্যন্ত উন্নত ছিল। নানা প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে "মাতৃভবন" তার ঐতিহ্য বজায় রেখেছিল।

তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চবালিকা বিদ্যালয়—১৯৫১ খৃঃ স্থাপিত তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চবালিকা বিদ্যালয় এ অঞ্চলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ক্ষুদ্র অবস্থা হতে ক্রমশ উন্নতি করে বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। উন্নতমানের শিক্ষাদান ও সুপরিচালনা এই উন্নতির প্রধান কারণ।

কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়—আমাদের অঞ্চলের একমাত্র মহাবিদ্যালয় ১৯৮৬ খৃঃ ভদ্রেশ্বর স্টেশনের পার্শ্বে রবীন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়ের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মহাবিদ্যালয়টি ক্রমশ উন্নতির পথে। বর্তমানে এখানে মাত্র বাণিজ্য শাখায় পাশকোর্স পড়ান হয়। ভবিষ্যতে এটিকে সর্বশাখা বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মহাবিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য পরিচালকবৃন্দ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

রবীন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়—আদর্শ শিক্ষক ও পরিচালকবৃন্দ একটি প্রতিষ্ঠান কতদূর উন্নত করতে পারেন, তার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র-স্মৃতি বিদ্যালয়। স্থাপিত হওয়ার স্বল্পকালের মধ্যেই এটি এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে রয়েছেন কবি, সাহিত্যিক ও সমাজসেবী। ক্রমবর্দ্ধমান ছাত্রমণ্ডলীর চাপ সহ্য করে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার শিক্ষাদানের উন্নতমান বজায় রেখে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়—হুগলী জেলার প্রাচীনতম বিদ্যালয়গুলির অন্যতম তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের সূত্রপাত করেন ভদ্রেশ্বরের শ্যামদাস মণ্ডল মহাশয়। পরে সহযোগিতা করেন মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবার, বারাসাতের দে পরিবার, মৌড়ীর (আন্দুল) কুণ্ডু পরিবার ও তেলিনীপাড়ার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। শ্যামদাস মণ্ডল প্রদত্ত ঘরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয় গঙ্গার তীরে তেলিনীপাড়ার জমিদারদের প্রদত্ত বাটীতে। আরও পরবর্তীকালে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর বর্তমান স্থানে বিদ্যালয় গৃহ নির্মিত হয়।

শতাধিক বৎসরের অধিক কাল ধরে বিদ্যালয় এ অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারে নিযুক্ত আছে। ১৯৭৬ সালে বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম চালু হয়। বহু কৃতী ছাত্র এই বিদ্যালয় হতে শিক্ষাগ্রহণ করে দেশ ও দশের সেবা করেছেন। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ভদ্রেশ্বর প্রেমচাঁদ শিরোমণি লেন নিবাসী আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, পি, এইচ, ডি, ও পি, আর, এস, অধ্যক্ষ জম্মু (কাশ্মীর) কলেজ। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। তেলিনীপাড়া নিবাসী বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডি, ও, (অক্সান), ডি, ও, এম, এস (লণ্ডন), এফ, আর, সি, এস (এডিন) ও এফ, এস, এম, এফ (বেঙ্গল)

বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী উৎসব উপলক্ষে বহু জ্ঞানীগুণী

ব্যক্তি বিদ্যালয়ে পদার্পণ করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রাক্তন রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও ডঃ কৈলাশনাথ কাটজু, মন্ত্রী নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

গুণী শিক্ষকবৃন্দের সমাবেশ, উন্নতমানের শিক্ষাদান ও পরিচালকবর্গের সুপরিচালনা বিদ্যালয়কে এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পরিণত করেছে।

গ্রন্থাগার

ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপ্যাল টাউন লাইব্রেরী, তেলিনীপাড়া—

আশির দশকের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিটি পৌর এলাকায় একটি করে সরকারী গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা অনুসারে তেলিনীপাড়া এলাকায় সরকারী গ্রন্থাগার স্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য গ্রন্থাগারপ্রেমী বিদ্যোৎসাহী মানুষদের নিয়ে "তেলিনীপাড়া সাধারণ পাঠাগার" গঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে উক্ত পাঠাগার "ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরী" রূপে ১৯৮৩ সালে সরকারী লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৯০ সালে লাইব্রেরী "শহর গ্রন্থাগারে"র মর্যাদায় উন্নীত হয়। ১৯৮৪ সালের জুন মাসে লাইব্রেরীর জন্য জমি ক্রয় করা হয়। ১৯৮৪ সালে ৩০শে জুন সচ্চিদানন্দ দে রায় (D.S.E.O.) মহাশয় গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কমল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা ৩৫০ এবং পুস্তক সংখ্যা ৫২০৬। মাসিক চাঁদার হার পঁচাত্তর পয়সা। শিশু ও কিশোর সদস্যদের কোন চাঁদা দিতে হয় না। ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপ্যাল টাউন লাইব্রেরীর উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী, আলোচনা সভা, দেওয়াল পত্রিকা, রক্তদান শিবির ও নব সাক্ষরদের জন্য কর্মসূচী ইত্যাদি নানা সাংস্কৃতিক ও জনসেবামূলক অনুষ্ঠান সংগঠিত করা হয়। সম্প্রতি টাউন লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করে

স্থানীয় অন্যান্য লাইব্রেরীগুলিকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

হিন্দী পুস্তকালয়, তেলিনীপাড়া—তেলিনীপাড়া শ্রমিক বসতি অঞ্চলে 'ভারতীয় পুস্তকালয়' নামে একটি হিন্দী ভাষার পুস্তকাগার স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে নানা বাধা ও অসুবিধার ফলে পুস্তকালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য স্ট্রীটের নন্দগোপাল প্রসাদের গৃহে স্থাপিত হয় হিন্দী পুস্তকালয়। পুস্তকালয়টি ক্রমে হিন্দীভাষী মানুষের শিক্ষা বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় পুস্তকাগার গৃহ ও আসবাবপত্র ভস্মীভূত হয়। বর্তমানে মনসাতলার এক বাড়িতে হিন্দী পুস্তকালয় নতুন করে চালু হয়েছে। অবশ্য পূর্বগৌরব ফিরে আসেনি। পুস্তকালয়ে বর্তমানে তিন হাজার পুস্তক আছে। ভদ্রেশ্বর পুরসভার সদস্য ভগবান দাশগুপ্তার সভাপতিত্বে ও মুনিলাল প্রসাদের সম্পাদকত্বে পুস্তকালয়টি সুনামের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে।

ইস্‌লাহুল মুসলেমীন লাইব্রেরী, তেলিনীপাড়া—১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু তরুণ ইস্‌লাহুল মুস-লেমীন লাইব্রেরী নামে পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি কেবলমাত্র লাইব্রেরী পরিচালনা করে না—তার সঙ্গে নানা সাংস্কৃতিক ও জনসেবামূলক কাজ করে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলবস্তি লেনের মরহুম মকবুল হুসেনের দেওয়া ২৯টি বই দিয়ে লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা। অর্থ সংগ্রহের জন্য রমজান মাসে কাফেলা বার করে ও ঈদের দিনে চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। পুরসভা সামান্য বার্ষিক অনুদান দেন। উর্দু একাডেমী এককালে কিছু সাহায্য করেছিলেন। ছাত্র পাঠ্য পুস্তক সমেত বর্তমান পুস্তক সংখ্যা তিন হাজার। পুস্তকাগারের পরিচালনায় সারা ভারতের কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী ও মির্জা গালিবের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯৭৭

খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাগারের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থ ও মুশায়েরার আয়োজন করা হয়। বর্তমান সভাপতি হাজি মহম্মদ লোকমান এবং সম্পাদক হলেন মহম্মদ মুস্তাক আহম্মদ।

মানকুণ্ডু সাধারণ পাঠাগার—মানকুণ্ডু সাধারণ পাঠাগার ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা ঘোষের বাড়িতে স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে শান্তিরাম ঘোষ তাঁর পরলকগতা কন্যা কমলা ও পুত্র গোরাচাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পাঠাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করে দেন। বর্তমানে পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা প্রায় চার হাজার এবং সভ্য/সভ্যা সংখ্যা প্রায় তিনশত। আগামী ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঠাগার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করবে। সেই উপলক্ষে পাঠাগারের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। পাঠাগারের সরকারী অনুদান ও জনসাধারণের সাহায্য যাতে আরও বাড়ান যায় তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভদ্রেশ্বর সাধারণ গ্রন্থাগার—১৯১০ সালে স্থাপিত ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার এ অঞ্চলের পুরাতন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। তৎকালীন আদর্শবাদী যুবকবৃন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসার মানসে পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠা করেন।

ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা কম নয়। দেশভাগের পর ওপার বাংলা হতে আগত সাংস্কৃতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষদের পাঠস্পৃহার ফলে সদস্য সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই, তবুও আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়নি। পাঠাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আয় বৃদ্ধি প্রয়োজন। সরকারী অনুদান আশানুরূপ নয়। এসব সত্ত্বেও সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে পাঠাগার নিজ আদর্শ ও লক্ষ্যে অবিচল।

ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাব, টাউন লাইব্রেরী, ভদ্রেশ্বর—১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাব সভ্যদের পুস্তক পাঠে উৎসাহিত করার জন্য পাঠাগার বিভাগটি চালু করেন। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে পাঠাগারটি টাউন লাইব্রেরী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন লাভ করে। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাব

পাঠাগার ভবনের জমি ক্রয়ের জন্য ২৪,০০০ টাকা পাঠাগারকে দান করে। কাজেই ক্লাবের অর্থ, পুস্তক ও আসবাবপত্র সমৃদ্ধ এই পাঠাগারের নাম হয় ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাব টাউন লাইব্রেরী।

সরকারী অনুমোদন লাভের পর থেকে ১৯৮৫'র মে মাস পর্যন্ত পাঠাগার পরিচালনার দায়িত্ব সরকারী প্রশাসকের উপর ন্যস্ত ছিল। ১৯৮৫ খ্রীঃ হতে পরিচালকমণ্ডলী পাঠাগার পরিচালনা করেন। বর্তমানে স্থানাভাবের দরুণ নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যা দূরীকরণের জন্য পাঠাগার ভবনের সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

অল্প সময়ের মধ্যেই টাউন লাইব্রেরী সাধারণ মানুষের মধ্যে পাঠস্পৃহাকে জাগিয়ে দিয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বোধ প্রসারে পাঠাগার প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

আমাদের অঞ্চলে বহু ভাষাভাষীদের বাস। বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষীদের যেমন পাঠাগার আছে, তেমনি আছে ওড়িয়া ও তেলুগুভাষীদের পাঠাগার। এ অঞ্চলের অধিকাংশ পাঠাগারই পুরসভার অনুদান পায়।

অন্নপূর্ণা পুস্তকাগার, তেলিনীপাড়া—বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তেলিনীপাড়া অঞ্চলের কিছু আদর্শবাদী তরুণের স্বপ্ন আজ ৮০ বৎসর অতিক্রম করে প্রবীনতা অর্জন করেছে। ১৯১২ খৃঃ (১৩১৯ সাল) স্থাপিত হয়ে অন্নপূর্ণা পুস্তকাগার দীর্ঘ দিন ধরে তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু ও দক্ষিণ চন্দননগর এলাকার জনসাধারণের জ্ঞান-পিপাসাকে তৃপ্ত করে চলেছে। তার চলার পথ সব সময়ে কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি, কিন্তু অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা মাতার আশীর্বাদ, পরিচালক-মণ্ডলীর অদম্য প্রাণ-শক্তি ও স্থানীয় জনগণের অকুণ্ঠ সহায়তায় পুস্তকাগার সব প্রতিকূলতাকে জয় করে শতাব্দীর পথের পথিক।

পুস্তকাগার যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বা যাঁরা সহযোগিতা করে-ছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সনৎকুমার রায়চৌধুরী, সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রানন চক্রবর্তী। যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন তাদের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়), হরিসাধন পাল, ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যয় এবং বহু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি।

ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ও সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। প্রথম যুগে পুস্তকাগারের নিজস্ব জমি ও গৃহ ছিল না। পরবর্তীকালে তৎকালীন সম্পাদক সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য বহুব্যক্তির প্রচেষ্টায় তেলিনীপাড়ার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণের পূর্বপুরুষের ভিটায় জমি সংগৃহীত হয় এবং নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয়।

পুস্তকাগারে বাংলা, ইংরাজী ও কিছু সংস্কৃত পুস্তক আছে। পুস্তকের সংখ্যা আনুমানিক আট হাজার। অবশ্য বহু পুরাতন পুস্তকগুলি বর্তমানে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে গেছে। পুস্তকাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুস্তক আছে। পুস্তকাগারের সদস্য/সদস্যা সংখ্যা দুই শতের অধিক। পুস্তকাগার সংশ্লিষ্ট "বৈদ্যনাথ পাঠকক্ষে" বসে সদস্য বা অসদস্য যে কেউ পুস্তক বা পত্র পত্রিকা পাঠ করতে পারেন।

পুস্তকাগারের মালিকানাধীন "বৈদ্যনাথ পার্ক"—এ অঞ্চলের খেলাধুলোর অন্যতম কেন্দ্র। প্রতিদিন বৈকালে কয়েক শত শিশু, কিশোর ও তরুন বয়স্করা এখানে শরীর চর্চা করে। পুস্তকাগারের উদ্যোগে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পুস্তকাগারের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবে সারা বৎসর ব্যাপী নানা বৈচিত্রপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—মার্চ '৮৬ হতে ফেব্রুয়ারী '৮৭ পর্যন্ত প্রতিমাসে পূর্ব নির্ধারিত নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির আলোচনা সভা। আলোচ্য বিষয় ছিল—ধর্ম, দর্শন, আঞ্চলিক ইতিহাস, সামাজিক বিবর্ত্তন, সঙ্গীত ও শিল্পচর্চা ইত্যাদি।

পুস্তকাগার পরিচালিত হয় একটি নির্বাচিত কার্যনির্বাহী সমিতি দ্বারা। অর্থের অভাব পুস্তকাগার পরিচালনা ও সম্প্রসারণের পথে বড় বাধা। পুরসভার সামান্য অনুদান ব্যতীত সদস্যগণের দেয় চাঁদাই একমাত্র আয়। আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও পুস্তকাগার নিজ কর্তব্য পালনে তৎপর।

একাদশ অধ্যায়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষা প্রচলনের পূর্বে আমাদের অঞ্চলে চতুষ্পাঠী বা টোলের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। ঐসব চতুষ্পাঠীতে কাব্য, অলঙ্কার ও রসশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা ও শিক্ষাদান নিশ্চয়ই হত। কিন্তু পণ্ডিত-মহাশয়গণ কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব সংস্কৃত ভাষায় কাব্য সাহিত্য চর্চা হলেও কোন মৌলিক গ্রন্থ এ অঞ্চলে রচিত হয়নি। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যখন এ অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার প্রচলন শুরু হয়, তখনই পাশ্চাত্য কাব্য ও নাটকের পঠনপাঠন ও আলোচনার সূত্রপাত হয়। নবজাগরণের ঢেউ কলকাতায় শুরু হবার কিছু পরেই কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত আমাদের অঞ্চলেও এর প্রভাব পড়ে। আমাদের অঞ্চলে নবজাগরণের ধারক, বাহক ও প্রবর্তক তেলিনীপাড়ার স্বনামধন্য জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্নদাপ্রসাদ ছিলেন ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগী ও ঘনিষ্ট বন্ধু। তিনি রামমোহনের বাংলা গ্রন্থের অন্তত দুবার প্রকাশ করেন। মুদ্রণ ও প্রকাশনার যাবতীয় ব্যয় তিনি বহন করেছিলেন ও ঐসব গ্রন্থ বিনামূল্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমবার এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার রামমোহনের বাংলা

গ্রন্থাবলী তিনি প্রকাশ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক জার্নালে' প্রথম সংস্করণের একটি পরিচয় পত্র আছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে—

—"বিতরণার্থ/শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইল/কলিকাতা ভাস্কর প্রেস/শকাব্দ ১৭৭৯/তেলিনীপাড়াস্থ ব্রাহ্ম সমাজ।"—

আনুমানিক ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শ্রীরামপুর চাতরার ঘাটে অন্নদাপ্রসাদের মা 'সতী' হন। অন্নদাপ্রসাদের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বৎসর। স্বাভাবিক কারণেই অন্নদাপ্রসাদ সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন ভারত সচিব ডাউডস্ ওয়েলকে এক পত্র লিখে তিনি সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের জন্য সর্বতোভাবে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে পুস্তিকাটি রচনা করেছিলেন, তা অন্নদাপ্রসাদের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। পুস্তিকাখানি কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন জেলা আদালত ও সুপ্রীম কোর্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পণ্ডিত মহাশয়দের কাছেও তা প্রেরণ করা হয়।

অন্নদাপ্রসাদ প্রচলিত সনাতন ধর্মব্যবস্থা ও পূজাপদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করে একটি গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকা তাঁকে এই প্রচেষ্টা ত্যাগ করে তিনি যে শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হয়েছেন সেই ব্যাপারেই ব্যাপৃত থাকতে উপদেশ দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অন্নদাপ্রসাদ তাঁর স্বগ্রামে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি "ইংরাজী পাঠশালা" স্থাপন করেন। গ্রন্থটি মুদ্রিত না হলেও এটি রচনার কৃতিত্ব অন্নদাপ্রসাদের প্রাপ্য।

কেবলমাত্র সৎসাহিত্য প্রচারেই অন্নদাপ্রসাদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল না। ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় (ইং ১৮৩৯ খ্রীঃ) হতে "সংবাদ প্রভাকরকে" দৈনিক পত্রিকায় পরিণত করা হয়। ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে সংবাদ প্রভাকরই প্রথম দৈনিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে যাঁরা যাঁরা অর্থসাহায্য

করেছিলেন, তাঁদের সেই আর্থিক সহায়তা ও অন্যান্য সাহায্যদানের জন্য ১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখ (ইং ১৮৪৭ খ্রীঃ) সংবাদ প্রভাকরে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়। ঈশ্বর গুপ্তের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাটি নিম্নরূপ ঃ—

—"বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের পত্রের সমাদর করিয়া উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ যত্নশীল আছেন।"

তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশীয় মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতির্বিজ্ঞানে (Astronomy) বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি তৎকালে প্রচলিত হিন্দু পঞ্জিকাসমূহের স্ফুটাদির গ্রহ ও সংস্কার অভাবে গ্রহণ ও তিথি গণনার নানা ভুলত্রুটি দেখিয়ে "বঙ্গবাসী" ও "সাধারণী" প্রভৃতি সংবাদপত্রে নানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ইংরাজী নাবিক পঞ্জিকা (Nautical Almanac) হতে কিভাবে বিশুদ্ধ তিথি নির্ণয় করা যায় তা দেখাবার জন মনোমোহন কলকাতাবাসী মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে—"বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা"—প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

ইংরেজ আমলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর জমিদারগণের "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন" নামে একটি সমিতি ছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর তারিখের সভায় সমিতির সদস্যবৃন্দ "হুগলী ড্রেনেজ আইন (Hooghly Drainage Act) সম্বন্ধে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁদের প্রতিবাদের কথা মনে রেখে তৎকালীন ইংরেজ সরকার ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তেলিনীপাড়ার জমিদার সত্যদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজনকে বাংলাদেশের জলনিকাশী ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও মতামতের জন্য ড্রেনেজ কমিশনার নিযুক্ত করেন। নীলমণি মুখোপাধ্যায় "A Bengali Zaminder" গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—"Joykrishna had much to say on this question when in January, 1872, he along with Satyadayal

Banerjee, Hemchandra Goswami and others, was appointed drainage commissioner under Section 4 of act V of 1871 to facilitate drainage in certain district of Bengal."

ড্রেনেজ কমিশনার হিসাবে যে প্রতিবেদন রচিত হয়, তাতে সত্যদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশের জলনিকাশী ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান এই প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে। মজা নদী ও জলনিকাশী ব্যবস্থার সমস্যা সম্বন্ধে প্রতিবেদনটি অন্যতম পথপ্রদর্শক। পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে যাবতীয় প্রচেষ্টার মূল উৎস এই প্রতিবেদন।

জমিদার বংশীয় সত্যশান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র তেইশ/চব্বিশ বছর বয়সে তেলিনীপাড়া--ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক হয়েছিলেন। তিনি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ছাত্রদের উপযোগী করে "The First Book of Reading"-এর একটি অর্থপুস্তক রচনা করেন। এবং ইংরাজী শিক্ষার সুবিধার্থে "সরল ইডিয়ম সংগ্রহ" নামে আরো একটি পুস্তক রচনা করেন। ছাত্রপাঠ্য আরো কয়েকখানি পুস্তক তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর এইসব রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্ররা যাতে সহজে ইংরাজী শিক্ষালাভ করতে পারে।

গিরিশচন্দ্র পাল সাধারণ ঘরের সন্তান হয়েও নিজের একক প্রচেষ্টায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের নববিধান ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে 'ব্রহ্মর্ষি ভাই ব্রহ্মানন্দ' নাম গ্রহণ করেন। তিনি মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন এবং প্রচলিত মত ও পথের বিরোধিতা করে নানা গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থগুলির বিষয় ও নামকরণ বেশ চমকপ্রদ। যেমন—'গীতার গলদ', 'কোরাণের কেচছা', 'বুদ্ধের দুর্বুদ্ধি', 'জাতের নামে বজ্জাতি' এবং 'রামের পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যাওয়া অন্যায়'—শীর্ষক নানা গ্রন্থ রচনা করেন।

তেলিনীপাড়ার একটি বিশিষ্ট পরিবার বংশপরম্পরায় সাহিত্য রচনা ও সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন। অন্তত চার পুরুষ ধরে এই

পরিবারটি সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা করেছে। এ অঞ্চলে তাদের বাড়িকে বলা হয় "দেওয়ানবাড়ি"। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই দেওয়ানবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ানবাড়ির রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সে যুগের গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। রাজকুমারবাবুর ছোট ভাই বিনয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাম 'কনক'। রাজকুমারবাবু নিজের আত্মজীবনীমূলক যে উপন্যাস রচনা করেন, তার নাম 'গৃহলক্ষ্মী'। তাঁর স্ত্রী বিদুষী ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর রচিত ও মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'শরৎশশী'। দেওয়ানবাড়ির অন্যতম সন্তান সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এম. এ. ছিলেন। তিনি সংগীত ও যন্ত্রসংগীতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় 'খেলাঘর' নামে একটি কিশোর পত্রিকা কয়েক বৎসর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হত। তিনি সিনেমা শিল্পের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সন্তোষবাবু ভদ্রেশ্বর পুরসভার সদস্য ও ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র কবি সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ও বংশের সাহিত্য ধারাকে বজায় রেখে চলেছেন। তিনিও বাংলা সাহিত্যে এম, এ, ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক। তিনি বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করে কবি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি কবিতা পাঠ করেন। তিনি বেনজিয়ান পাদ্রী খ্রিশ্চিয়ান মিসো S. J. সঙ্গে যুগ্মভাবে "মঙ্গলবার্তা" নামে বাইবেলের বাংলা অনুবাদ করেছেন। দীর্ঘ ১৫ বৎসরের প্রচেষ্টায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

"হুগলী জেলার ইতিহাসে" উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্ধমান মহারাজার সভার গায়ক ও কবি ধীরাজ তেলিনীপাড়ায় বাস করতেন। তাঁর আসল নাম বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ তাঁর স্বরচিত কবিতা ও গানে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'ধীরাজ' পদবী দিয়েছিলেন। চন্দননগর ষ্টেশনের কাছে কালিদাস শেঠ যে

কালীমন্দির নির্মাণ করেন সেই মন্দিরের কালীমূর্তি ধীরাজ ওরফে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বভাব কবি ছিলেন। এবং সমসাময়িক সমাজজীবনের নানা ঘটনা অবলম্বন করে অসংখ্য সংগীত রচনা করেন। তাঁর সংগীত লঘু রঙ্গরসে ভরা থাকত। ধীরাজ বর্ধমান রাজের আশ্রয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। পরবর্তীকালে কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার বড় তরফের মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও ছোট তরফের রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহনের এমারেল্ড বাওয়ার বা মরকতকুঞ্জে তিনি প্রায় স্থায়ীভাবে বাস করতেন। আবার কোন কোন সময়ে ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) পেনেটির বাগানবাড়িতে গানবাজনার আসরে রঙ্গব্যঙ্গের গান গেয়ে দিনের পর দিন কাটাতেন।

ধীরাজ একাধারে সংগীত রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন শুধু নয়, অনেকটা কবিওলাদের মত চটজলদি কবিতা মুখে মুখে রচনা করতে পারতেন। সেযুগের বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিরা ধীরাজের গানের ভক্ত ছিলেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময় ধীরাজ বিদ্যাসাগরের নামে কিছু কুরুচিপূর্ণ গান রচনা করেন। অসীম উদারতার সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু ধীরাজকে বাড়িতে ডেকে সেইসব গান গাইতে বলতেন। অনুরোধমাত্র ধীরাজ অমনি গেয়ে উঠতেন—

—"বিদ্যাসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে
পরাশরের…… গিয়েছে।"

তাঁর সমালোচন সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর মহাশয় ধীরাজকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

মিস্ মেরি কার্পেণ্টারকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন উত্তরপাড়ায় স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তখন ঘোড়ার গাড়ি উল্টে উভয়ে আহত হন। বিশেষত বিদ্যাসাগরের বুকের পাঁজরে আঘাত লাগে! ঐ শোচনীয় ঘটনাকে উপলক্ষ করে ধীরাজ গান বেঁধেছিলেন—

"অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে।

ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে।

....

উত্তরপাড়ায় স্কুল যেতে
বড়ই রগড় হইল পথে, এট্‌কিনসন উড্রো
আর সাগর সঙ্গেতে।
নাড়াচাড়া দিলে ঘোড়া, মোড়ের মাথাতে
গাড়ী উলটে পড়লেন সাগর
অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে।

বিপিনবিহারী গুপ্ত তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে ধীরাজকে প্যারীমোহন কবিরত্ন বলে উল্লেখ করেছেন। এর ফলেই ধীরাজেরই অপর নাম প্যারীমোহন কবিরত্ন কিনা—এ নিয়ে একটি বিতর্কের সূচনা হয়েছে। সে যুগের বিখ্যাত ব্যক্তি বিপিনবিহারী গুপ্তের মতকে উপেক্ষা করা যায় না। তাই আমরা প্যারীমোহন কবিরত্নের কিছু পরিচয় দিলাম। ধীরাজ আর প্যারীমোহন একই ব্যক্তি হোন্ বা না-ই হোন্ যখন ধীরাজের সঙ্গে প্যারীমোহনের অভিন্নতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তখন আমরা প্রসঙ্গটি উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি।

বর্ধমানরাজ মহতাবচাঁদের অন্যতম সভাগায়ক ও গীতিকার প্যারী-মোহন কবিরত্ন তাঁর জীবনে প্রথমদিকে কিছুকাল বর্ধমান রাজসভার কবি হিসেবে বর্ধমানে বাস করেছিলেন। ইনি বিখ্যাত সাধক কমলাকান্তের বংশের লোক। এঁর জন্ম সময় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। কবিরত্ন উপাধি দিয়েছিলেন বর্ধমানরাজ মহতাবচাঁদ। ত্রিশ বৎসর বয়সে সমসাময়িক আশ্বিনের ঝড়ের তাণ্ডব নিয়ে তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। পরবর্তীকালে প্যারীমোহন পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করেন। প্যারীমোহনের অধিকাংশ জনপ্রিয় কবিতাই সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। তাঁর রচনায় উল্লেখিত ব্যক্তিরা হচ্ছেন বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি ব্যক্তিরা। ধনী ও মোসাহের পরিবৃত নব্যবাবুদের নিয়ে তিনি ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ বহু কবিতা রচনা করেন।

ধীরাজ ও প্যারীমোহন কবিরত্নের জীবনকাহিনীতে অনেক মিল থাকার জন্য আমরা মনে করি বিপিনবিহারী গুপ্তের মতে কিছু তথ্য-ভিত্তি আছে। 'পুরাতন প্রসঙ্গে' আছে—"ধীরাজ (ও ইদানিং প্যারীমোহন কবিরত্ন) গান বাঁধিতেন এবং আমরা গাইতাম।"

বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটির জন্ম হয় তেলিনীপাড়ার জমিদার মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অ্যানি বেসান্ত সিংহল থেকে প্রথম ভারতবর্ষে এসে মনোমোহনবাবুর তেলিনীপাড়ার বাসভবনে আশ্রয় নেন। ঐসময় থিয়সফিক্যাল সোসাইটিতে আত্মা ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে নানা আলাপ আলোচনা হত। মনোমোহনবাবুর ভাগ্নে কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় থিয়সফি সংক্রান্ত বেশ কিছু পুস্তক প্রকাশ করেন। মনোমোহনবাবুর দৌহিত্র ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং সেযুগের নানা সভা সমিতিতে ঐসব প্রবন্ধ পঠিত হত। কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল তেলিনীপাড়ার পাইকপাড়ায়।

বিংশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেছেন বা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (পাহাড়ী-বাবু)। কলকাতার 'শিশু' পত্রিকায় রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হত। আজীবন শিক্ষক রামকৃষ্ণবাবু "Ever Green Word Book" নামে একটি ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচনা করেন।

তেলিনীপাড়ার 'গাঙ্গুলীবাড়ির' তারকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেন। শিশির পাবলিশিং কোম্পানীর শিশির কুমার মিত্র বইগুলি প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—'অভিনেত্রী' নামক উপন্যাস।

শিবশংকর মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'লোকবাণী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা বেশ কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বেচু প্রামাণিক ওরফে সম্রাট সেন 'রূপসী বাংলা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

প্রখ্যাত ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তেলিনীপাড়ায় সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহশিক্ষক-রূপে অবস্থান করেছিলেন। সেইসময় তেলিনীপাড়ায় অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সময় উৎসব কর্তাদের অনুরোধে 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধটির সূত্র ধরে প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তথা বিশ্বভারতীর যোগাযোগ ঘটে। ফলশ্রুতি হিসাবে দেখি, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বিশ্বভারতীর অধ্যাপক হিসাবে প্রবোধচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। ঐ প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ হয় মূলত অন্নপূর্ণা পুস্তকাগারের সঞ্চিত পুস্তকভাণ্ডার হতে। তেলিনীপাড়া নিবাসী সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ গ্রন্থের যাবতীয় সহায়ক গ্রন্থ সংগ্রহ করে দেন। রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্রের মধ্যে সেতুবন্ধনে তেলিনীপাড়ার কিছু ভূমিকা আছে।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তেলিনীপাড়ার জমিদার মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহেই থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে থিয়সফিক্যাল আন্দোলনের প্রধান হোতা শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর সিংহল হয়ে ভারতে আসেন। তিনি এসেছিলেন মাদাম ব্লাভাটস্কি এবং কর্নেল অলকটের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কার্যকে ভারতে প্রসারিত করতে। সোসাইটির সভাপতি অলকটের মৃত্যুর পর (১৯০৭ খ্রীঃ) থেকে তাঁর নিজের মৃত্যুকাল অবধি (১৯৩৩ খ্রীঃ) পৃথিবীব্যাপ্ত থিওসফিক্যাল সোসাইটির তিনি সভানেত্রীত্ব করেন। তিনি "দি লর্ডস প্রেয়ার" নামে ভাগবৎগীতার ইংরাজী অনুবাদ করেন। তীর্থস্থান বারানসী তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। তাই বারানসীতে তিনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। পরে সেই কলেজটি বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতে নবাগতা শ্রীমতী বেসান্তকে তেলিনীপাড়ার জমিদার মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ গৃহে সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এবং

ভারতবর্ষের থিয়সফিক্যাল আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে আর্থিক ও কায়িক সহায়ত: দান করেছিলেন। আমাদের অঞ্চলের ইতিহাসে ঘটনাটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা প্রয়োজন।

সাহিত্যিক সম্রাট সেন—বেচু প্রামানিক ওরফে সম্রাট সেন গৌরহাটী গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। কিন্তু কিশোর বয়স হতেই তেলিনীপাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা। সম্প্রতি "দেহলি" নামে তেলিনীপাড়া ফেরিঘাট ষ্ট্রীটে নিজস্ব গৃহনির্মান করেন। তিনি তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা রবীন্দ্রসদনের গ্রন্থাগারিক হিসাবে কর্মজীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৯১ সালে। ১৯৯৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

ঝরাবকুল, শ্রীমন্ত সওদাগর ও সম্রাট সেন ছদ্মনামে লিখতেন। তাঁর স্ত্রী সুভদ্রা অধিকারী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলায় এম, এ। শ্রীমতী অধিকারী "ভারতীয় নৃত্যকলা" (প্রচ্ছদ রামকিংকর, ভূমিকা এন, শিবশঙ্করম) নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

সম্রাট সেন বিভিন্ন নামে ত্রিশটি উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—শঙ্খবতী, এর পূরবী ওঘ বিভাস, সায়াহ্নে সপ্তদুর্গা, অগ্নিতট সপ্তগ্রাম, মহানগর বাদশা নগর, সপ্তদুর্গার উদয়াস্ত, পদ্ম ডুবছে ভাসছে, যে পাপ পুণ্যের অধিক ইত্যাদি। এছাড়া বহুশত কবিতা ও শতাধিক গল্প রচনা করেছেন। সম্পাদনা করেছেন—রাজা শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর রচিত "যন্ত্রকোষ" নামক গ্রন্থ। "রূপসী বাংলা" নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। নানা সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান তাঁকে পুরস্কার প্রদান করে এবং অভিনন্দন জানিয়ে সম্মানিত করেছেন। কয়েকটি পত্র-পত্রিকা তাঁর নামাঙ্কিত সংখ্যা বার করেছে।

সম্রাট সেন বহু উদীয়মান সাহিত্যিককে সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছেন। বহু লিটল ম্যাগাজিন তাঁর অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছে। সম্রাট সেন বড় সাহিত্যিক ছিলেন কিন্তু মানুষ হিসাবে

আরও বড় ছিলেন। সাহিত্যিক সম্রাট সেন আমাদের গর্ব এবং অঞ্চলের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

কবি অনাথ চট্টোপাধ্যায়—সহজাত কবিত্ব শক্তির অধিকারী কবি অনাথ চট্টোপাধ্যায় তেলিনীপাড়ার বাসিন্দা। তিনি বহু পত্র পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সম্রাট সেনের সমসাময়িক এবং একই সঙ্গে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর রচিত কবিতা মাসিক বসুমতী, পাঠশালা ও সেযুগের নানা বিখ্যাত পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত।

তেলিনীপাড়া অঞ্চলে প্রায় দেড়শত বৎসর ধরে ধারাবাহিকভাবে সাহিত্যচর্চা চলে আসছে। নানা সাহিত্য গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। হাতে-লেখা পত্র পত্রিকাও আলোচনাচক্রের মাধ্যমে সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে।

উনবিংশ শতকে মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বাবুর বৈঠকখানায় প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা সভা বসতো। চন্দ্রমোহন বাবুর পৌত্র পূর্ণচন্দ্র নিজের বাড়ীতে একটি গ্রন্থাগার ও ষ্টাডি সার্কেল গড়ে তোলেন। ঐ ষ্টাডি সার্কেলে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, "লৌহকপাট" খ্যাত "জরাসন্ধ" বা চারুচন্দ্র চক্রবর্তী নিয়মিত আসতেন। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র তার দিদির (সম্পর্কীয়) শ্রীরামপুরের বাড়ীতে যাতায়াত সূত্রে তেলিনীপাড়ায় এসে পাঠচক্রে যোগ দিতেন।

অনাদি মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "অর্ঘ" নামে হাতেলেখা পত্রিকা প্রকাশিত হত। পরবর্তীকালে খেয়ালী সংঘের "আহুতি" পত্রিকা ও সম্রাট সেন, অনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "উল্কা" নামে হাতেলেখা পত্রিকা বেশ কিছুদিন প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা

ভদ্রেশ্বর

ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের সাহিত্যচর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়না। যেটুকু সংগৃহীত হয়েছে তার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

রায়সাহেব কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস "ব্রহ্ম সংগীত" রচনা করেন। "ব্রহ্ম সংগীত" গ্রন্থটি জনপ্রিয় ছিল। কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলের ব্রাহ্ম মন্দিরে তাঁর রচিত সংগীত নিয়মিত পরিবেশিত হত। তিনি আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। আমরা চেষ্টা বহু করেও তাঁর রচিত কোন গ্রন্থের সন্ধান পাইনি।

ভদ্রেশ্বরে দুটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হত। "শব্দ-বর্ণ" ও "শব্দ-স্রোত"। শব্দ-বর্ণ সুন্দর প্রচ্ছদ নিয়ে প্রকাশিত হত বছরে চারটি সংখ্যায়। প্রধান সম্পাদক ছিলেন স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রমানাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি মূলতঃ গল্পকার তবে কবিতাও লেখেন। দেশ, অমৃত, কৃত্তিবাস ও দর্পন প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

"শব্দ-স্রোত" পত্রিকার সম্পাদক শিবশঙ্কর রায়চৌধুরী। তিনি মূলত কবি। সমকালীন কবিতা রচনায় তাঁর নৈপুণ্য-প্রশংসনীয়। অন্যান্য কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দন বসু, বিদ্যুত বিশ্বাস, সুশীল বসু ও মধুময় পাল।

ভদ্রেশ্বরের সাহিত্যজগতে দুর্গাপদ তরফদারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত "পরিব্রাজক বিবেকানন্দ" অনবদ্য শিক্ষামূলক গ্রন্থ। সুহাস চক্রবর্তী রচনা করেছেন একাধিক গীতি আলেখ্য। যার কয়েকটি "আকাশবানী"তে পরিবেশিত হয়েছে। তিনি রবীন্দ্র কবিতা নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। কবি জয়ন্ত চক্রবর্তী কিছু বিদেশী কবিতার অনুবাদ করেছেন। তিনি গল্প ও নাটক রচনা করেছেন। বিখ্যাত রূপকথা ও কাহিনীকার দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের পরিবার

বর্তমানে ভদ্রেশ্বরের বাসিন্দা। কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা বর্তমানে ভদ্রেশ্বর হতে প্রকাশিত হয়।

সন্নিহিত অঞ্চলের সাহিত্য সাধনা

অতীত যুগের ভদ্রেশ্বরের নিকটবর্তী এলাকার সাহিত্য সাধকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

রসিকচন্দ্র রায়—সুপ্রসিদ্ধ পল্লীকবি ও পাঁচালীকার পালাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে **১২২৭** সালে (ইং **১৮২০** খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। সিঙ্গুর থানার বড়া গ্রামে কবির পিত্রালয়। "জীবনতারা" নামে তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ **১২৪৫** সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাঙ্কুর, হরিভক্তি চন্দ্রিকা, পদ্মাঙ্ক দূত, দশ মহাবিদ্যা, বৈষ্ণব মনোরঞ্জন, নবরসাঙ্কুর, কুলীন কুলাচার, পদ্যসূত্র (দুইখণ্ড), শকুন্তলা বিহার, বর্ধমান চন্দ্রোদয় ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

রসিকচন্দ্র রায়, গোবিন্দ অধিকারী, রাধাকৃষ্ণ, নবীন গুঁই, মহেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাদের এবং সোনা পটুয়া, শশী চক্রবর্তী ও ত্রিপুরা বিশ্বাসকে পাচালী গান ও ছড়া লিখিয়া দিতেন। পাঁচালীকার হিসাবে দাশরথি রায়ের পরই তাঁর স্থান ছিল।

নগেন্দ্রবালা সরস্বতী (মুস্তাফী)—সিঙ্গুরের নিকট দলুইগাছা গ্রামের নৃত্যগোপাল সরকারের কন্যা নগেন্দ্রবালা। মাতুলালয় পালাড়া (ভদ্রেশ্বরের নিকট) গ্রামে **১২৮৪** সালে (ইং **১৮৭৭** খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। সুখড়িয়ার মুস্তাফী বংশে তাঁর বিবাহ হয়। সে যুগের সমস্ত বিখ্যাত পত্র পত্রিকায় তাঁর রচিত নানা গদ্য ও পদ্য রচনা প্রকাশিত হত। "নব্যভারত", "সাহিত্য", "বামাবোধিনী", "বীরভূম", "পূর্নিমা" "জন্মভূমি" প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত হত। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম—"মর্মগাঁথা", "প্রেমগাঁথা", "ব্রজগাঁথা", "নারীধর্ম" ও "ধবলেশ্বর"।

নগেন্দ্রবালার বাঙলা, উড়িয়া, সংস্কৃত, ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায়

সময়িক ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯০৬ খৃঃ) তাঁর মৃত্যু হয়। শত বৎসর পূর্বের এই বিদূষী মহিলা কবি ও সাহিত্যিককে আমরা প্রায় ভুলে গেছি।

কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের বাড়ি ছিল গৌরহাটী গ্রামে। তাঁর রচিত "গৌরীবিলাস" ও "কঙ্কাবতীর অভিশাপ" ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ঐ কাব্যগ্রন্থে কবির বংশপরিচয় এইভাবে দেওয়া আছে—

"গরিটি সমাজ ধাম গোপাল মুখুটি নাম
তার সুত দ্বিজ রামধন।
তাহার তনয় তিন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন
গৌরীগুণ করিল রচন ॥"

রামচন্দ্র "নল দময়ন্তী", "হরপার্বতীমঙ্গল", "অক্রূর সংবাদ" ও "মাধবমালতী" নামে চারখানি কাব্য রচনা করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শেষ গ্রন্থ মাধবমালতী প্রকাশিত হয়। কবিকেশরী রামচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক যুগে বিশিষ্ট কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত কাব্যসমূহ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিখ্যাতি বিলীন হয়ে যায়। তিনি পুরাতন আদর্শে কবিতা রচনা করেছিলেন। তাই ইংরাজী শিক্ষিত মানুষের রুচি বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়

(খ) সংগীত ও যন্ত্রসংগীতচর্চা
তেলিনীপাড়া

ভদ্রেশ্বর-তেলিনীপাড়া-মানকুণ্ডু অঞ্চলে ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ীর অভাব ছিল না। সে কারণে এ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে উচ্চাঙ্গ সংগীত, যন্ত্রসংগীত ও নাট্যচর্চার ধারা অব্যাহত ছিল। অঞ্চলের অভিজাতবৃন্দ

সংগীত ও নাট্যচর্চার সহায়তা করেছিলেন দুভাবে—প্রথমত পৃষ্ঠপোষকতা করে ও দ্বিতীয়ত নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে চর্চা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতচন্দ্র চন্দননগরের গোন্দলপাড়া অঞ্চলে বাস করতেন এবং দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সহায়তায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে সভাকবি রূপে আশ্রয় পান। পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্র তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত করেন তেলিনীপাড়ার অপরপারে মূলাজোড় গ্রামে। ভারতচন্দ্রের কবি প্রতিভার বিকাশে এই অঞ্চলের পরোক্ষ অবদান আছে। তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় জমিদারগণ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অংশ বিদ্যাসুন্দর কাব্যের গুণগ্রাহী ছিলেন। পরবর্তীকালে বিদ্যাসুন্দর অংশ যখন অন্নদামঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে "বিদ্যাসুন্দর" নামে নাট্যপালায় পরিণত হল, তখন জমিদার মহাশয়গণ বিদ্যাসুন্দর পালা অভিনয়ের জন্য দল গঠন করেন। ঐ নাট্যদলের যাবতীয় ব্যয় বহন করতেন জমিদাররাই। মহড়ার খরচা, সাজসজ্জা এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অভিনেতাদের পারিশ্রমিক বা দক্ষিণা দিয়ে দল গড়ে তুলেছিলেন। নিজেদের উৎসব অনুষ্ঠানে বা স্থানীয় ব্যক্তিদের আমন্ত্রণে এই 'বিদ্যাসুন্দর' পালা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নিয়মিত অভিনীত হত। পরবর্তীকালে ইংরাজী শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ফলে বিদ্যাসুন্দর পালা নৈতিকতা দোষে দুষ্ট এই অপবাদে কিছুটা অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছিল। কিছুটা কোণঠাসা হলেও বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত বিদ্যাসুন্দর পালার অভিনয় হত।

ঠাকুরবাড়ির দ্বারকানাথ, যতীন্দ্রমোহন, সৌরীন্দ্রমোহন প্রভৃতি প্রখ্যাত ব্যক্তিরা তেলিনীপাড়ার জমিদারদের বিদ্যাসুন্দর পালার অভিনয় দেখেছেন। অবশ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হয়ত তাঁর প্রখর নীতিজ্ঞানের জন্য এই জাতীয় পালার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ঠাকুরবাড়ি ও কলকাতার অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তিবর্গ তেলিনীপাড়ার জমিদারদের বিদ্যাসুন্দর পালার গুণগ্রাহী ছিলেন। এ ঘটনার বহু পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশব স্মৃতি সূত্রে বিদ্যাসুন্দর পালা সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথই ভারতচন্দ্রকে অশ্লীলতার দায় হতে মুক্ত করে

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সম্মান দিয়েছেন। পারিবারিক সূত্রে রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন যে, তেলিনীপাড়ার জমিদারদের বিদ্যাসুন্দর পালার নিজস্ব দল আছে। রবীন্দ্রনাথ যখন শেষবার তেলিনীপাড়ায় আসেন, তখন সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ঐ পালা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সত্যবিকাশ এই অনুরোধে কিছুটা বিব্রত হন। কারণ তখন দল ভেঙে গেছে। অভিনেতারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তবু রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ এড়ানো কঠিন। তাই সমগ্র বিদ্যাসুন্দর নয়, তার অংশবিশেষ অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথকে দেখানো হয়।

ঐ অভিনয়ের প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট হতে জানা যায় যে, অভিনয় অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। অভিনেতাদের মধ্যে নিত্যগোপাল দাস (নিত্যবাবু), যাঁর আসল বাড়ি নবদ্বীপ, যিনি প্রথম জীবনে বিদ্যাসুন্দর পালায় প্রথমে সখীর ভূমিকায় ও পরে মালিনীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। নিত্যবাবু প্রখ্যাত গায়ক ছিলেন। ঐ অভিনয়ের সময় তিনি প্রায় বৃদ্ধ, তবুও মালিনীর অভিনয় ও সংগীতে রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিলেন।

জমিদার বংশীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র মনীন্দ্রনাথ (ঝড়ুবাবু) নিজে যেমন গায়ক ছিলেন, তেমনি সমঝদার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বাড়িতে বিখ্যাত গায়ক লালচাঁদ বড়াল নিয়মিত আসতেন। মাঝে মাঝেই গানের আসর বসত। সেই আসরে বাংলাদেশের বহু সংগীতজ্ঞরা অংশগ্রহণ করতেন। ঝড়ুবাবুর বাড়িতে গান শুনতে আসতেন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ, কৃষ্ণনগরের মহারাজা এবং কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মত ব্যক্তিরা।

জমিদার বংশীয় ভগবতীচরণের পুত্রদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালোবাবু)। তাঁর অপর দুই পুত্র শচীন্দ্রনাথ (নালুবাবু) ও হৃদয়চন্দ্র (ভুলিবাবু) যন্ত্রসংগীতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। শচীন্দ্রনাথ ভগবতীচরণের মধ্যম পুত্র। তাঁর মত হারমোনিয়াম ও ক্ল্যারিওনেট সেযুগে কেউ বাজাতে পারতেন না। তিনি বাঁশি ও ফ্লুট বাজানোতেও ছিলেন পারদর্শী। ভগবতীচরণের তৃতীয়

পুত্র জিতেন্দ্রনাথ (কালোবাবু) বাল্যকাল হতেই সংগীতে পারদর্শীতা অর্জন করেন। পরিণত বয়সে তাঁর গুরু ছিলেন বিখ্যাত টপ্পা গায়ক ওস্তাদ রমজান আলি খাঁ। তিনি গুরুকে নিজের বাড়িতে সসম্মানে আশ্রয় দিয়ে গুরুর সেবাশুশ্রূষা করতেন। গুরুর নিকট হতে তিনি শোরি মিঞার টপ্পা শিক্ষালাভ করেন। কালোবাবু শোরীর টপ্পা ও নিধুবাবুর টপ্পা—উভয়েতেই পারদর্শীতা অর্জন করেন। যন্ত্রসংগীতেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সারেঙ্গী ও সেতার বাদনে তাঁর সুনাম ছিল।

কলকাতা, এলাহাবাদ, দিল্লী ইত্যাদি স্থানের সর্বভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন করেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৭ সালে যখন তেলিনীপাড়ার সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসেন, তখন তাঁকে গান শোনানোর জন্য কালোবাবু আমন্ত্রিত হন। তাঁর কণ্ঠমাধুর্যে কবিগুরু মুগ্ধ হয়ে ঐ সংগীত আসরেই তাঁকে "সুরসাগর" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজ কালোবাবুকে "বীণাকণ্ঠ" উপাধি দেন।

সংগীতসাধক আলাউদ্দীন খাঁ ও তাঁর ভাই আফতাবউদ্দীন খাঁ তাঁর বাড়িতে কয়েকবার এসেছেন। সংগীত সম্রাজ্ঞী গওহরজানবাঈ তাঁর বাড়িতে আসা যাওয়া করতেন ও কয়েকবার সংগীত পরিবেশনও করেছেন। সংগীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কুটে গোপাল, গায়ক দানীবাবু, দিলীপচাঁদ বেদি, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং বদল খাঁ সাহেব তাঁর বাড়িতে আসতেন। তানসেন ঘরানার প্রসিদ্ধ বীণকার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। বোম্বাইবাসী বিখ্যাত গায়ক মনোহরদাস বারভে যখন কিছুদিন চন্দননগরে ছিলেন, তখন প্রায়ই আসতেন এবং কালোবাবুর নিকট কয়েকটি টপ্পাগান শেখেন।

কালোবাবুর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে আজকের যুগে বিখ্যাত গায়ক রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তবলাবাদক হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আছেন। এঁরা দুজনেই তাঁদের স্মৃতিচারণে কালোবাবুর গানের কথা উল্লেখ

করেছেন। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর পিতামহ রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু তেলিনীপাড়ার জমিদার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে গান শিখেছেন—একথা উল্লেখ করেছেন। সংগীত বিষয়ে কালোবাবু ভারতবিখ্যাত ছিলেন। সুদূর পাঞ্জাবের মুলতান শহরে তাঁর গুণগ্রাহীর সংখ্যা কম ছিল না। ভারতব্যাপী নানা উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রতিযোগিতার তিনি আজীবন বিচারক ছিলেন।

কালোবাবুকে ঘিরে একটি সংগীত পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। প্রতি শনি ও রবিবার তাঁর বাড়িতে গান বাজনার আসর বসত। সেই আসরে আসতেন রাণাঘাটের নির্মল চট্টোপাধ্যায় ও বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ অমিয়নাথ সান্যাল। সেই আসরে স্থানীয় সংগীতানুরাগী চন্দননগরের মণি মিত্র, গৌরহাটীর হরিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দননগর বারাসতের শান্তিরাম শেঠ, তেলিনীপাড়ার বরদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সিদ্ধেশ্বর, রঙ্গলাল ও সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকতেন। এছাড়া স্থানীয় সংগীতানুরাগী হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও পদ্মানন চক্রবর্তী ঐসব আসরের নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন।

কালোবাবু (জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) তেলিনীপাড়াতে সঙ্গীত-চর্চার আবহাওয়া গড়ে তুলেছিলেন। সেই আবহাওয়াতে মানুষ কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পদ্মানন চক্রবর্তী উত্তরজীবনে বিশিষ্ট গায়ক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পদ্মানন চক্রবর্তী সুগায়ক ও সুঅভিনেতা ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতচর্চার গুরু ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালোবাবু), তারাপদ চক্রবর্তী ও পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় (গোন্দলপাড়া)। পদ্মাননবাবু প্রধানত গায়ক হলেও অভিনেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। বিখ্যাত নট ছবি বিশ্বাস তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করতেন। পদ্মানন চক্রবর্তী কর্মজীবনে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সঙ্গীতের দেশ লক্ষ্ণৌতে তিনি সঙ্গীতসাধনার উপযুক্ত সাধনক্ষেত্র পেয়েছিলেন।

তেলিনীপাড়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতসাধক কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে সমান পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ

যখন চন্দননগরে পাতালবাড়িতে কিছুদিন বাস করেছিলেন, সেই সময়ে তিনি সত্যকিশোর, সত্যব্রত ও সত্যশরণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের হাটখোলার বাড়িতে প্রতি সন্ধ্যায় গান শুনতে আসতেন। কাশীনাথবাবু সেই সময়ে কবিগুরুকে নিয়মিত গান শোনাতেন।

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরবাড়ির সুধীন্দ্রনার ঠাকুরের কন্যা রমা ঠাকুরের নিকট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষালাভ করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স হয়। তার সংগঠন-সচিব ছিলেন কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কাশীনাথবাবুর অগণিত ছাত্রছাত্রী তাঁর সংগীতশিক্ষার ধারাকে আজো বহন করে নিয়ে চলেছে।

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিদি ইন্দিরাদেবী ব্রতচারী আন্দোলনের হোতা গুরুসদয় দত্তের স্নেহধন্যা ছিলেন। গুরুসদয়-পত্নী সরোজনলিনী দেবীর নামাঙ্কিত "সরোজনলিনী মেমোরিয়াল স্কুলের" সহসম্পাদিকা ছিলেন ইন্দিরা দেবী। তিনি তেলিনীপাড়াতে সরোজনলিনী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই বিদ্যালয়ের পরিচালিকা ছিলেন 'মাতৃভবন' বিদ্যালয়ের পূর্ণা দেবী।

রবীন্দ্রনাথ যখন তেলিনীপাড়ার লালকুঠীতে সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসেন, তখন তাঁর সংবর্ধনা সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন কলিকাতার "বাসন্তী বিদ্যাবীথি।" ইন্দিরা দেবীই বাসন্তীবিদ্যাবীথিকে কবিগুরুর মনোরঞ্জনের জন্য কলকাতা হতে তেলিনীপাড়ায় নিয়ে আসেন।

কালোবাবু শুধু গায়কই ছিলেন না, বেশ কিছু শিষ্যকেও তিনি তৈরি করেছিলেন। এঁদের অন্যতম চন্দননগরের বলাইচন্দ্র সাহা, তেলিনীপাড়ার শিশিরকুমার ও পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শিষ্যানুরাগী কালোবাবু ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভূপেন্দ্রকিশোর ঘোষের প্রচেষ্টায় কলকাতায় যে "অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স" হয় এবং ডাঃ প্রসাদ ভট্টাচার্যের আনুকূল্যে এলাহাবাদে যে "অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স" হয়, উভয়ক্ষেত্রেই কালোবাবু বিচারক ছিলেন। ঐসব প্রতিযোগিতায় তাঁর

শিষ্য শিশিরকুমার উচ্চাঙ্গ সংগীতে ও টপ্পা গানে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কালোবাবু ইংরাজী ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ভগবতীচরণের কনিষ্ঠ পুত্র হৃদয়চন্দ্র (ভুলিবাবু) হারমোনিয়ম বাজানোয় খ্যাতি অর্জন করেন। সংগীত ও যন্ত্রসংগীতে তাঁর যথেষ্ট পারদর্শীতা ছিল। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র তারাদাস চট্টোপাধ্যায় (খোতনবাবু) উচ্চাঙ্গ সংগীতে পারদর্শী ছিলেন।

দেওয়ানবাড়ির অন্যতম সুসন্তান সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যন্ত্রসঙ্গীতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাদের সমস্ত পরিবারটি সাহিত্য ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সন্তোষকুমার মাতৃকুল হতে সঙ্গীত প্রবণতা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। তিনি ওস্তাদ রমজান আলি খাঁর নাড়াবাঁধা শিষ্য ছিলেন। তিনি কিছুদিন কালোবাবু, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জি খাঁ সাহেব ও ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের নিকট সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষালাভ করেন। তিনি মূলত ক্ল্যারিওনেট বাদক ছিলেন। তাঁর ক্ল্যারিওনেট বাদনের প্রথমে গুরু ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, পরে ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ। সেই সূত্রে নাজির হোসেন তাঁর গুরু ভাই। সারেঙ্গী ও ক্ল্যারিওনেট শিক্ষার জন্য তিনি দীর্ঘ আট বৎসর বেনারসে অবস্থান করেন।

সন্তোষবাবুর সম্পর্কীয় মামা ছিলেন বিখ্যাত হারমোনিয়ম বাদক মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়। মণ্টুবাবুর গুরু ছিলেন মুনেশ্বর দয়াল। মণ্টুবাবুর বাড়িতেই মুনেশ্বর দয়াল থাকতেন। সন্তোষবাবু মুনেশ্বর দয়ালের নিকট কিছুদিন হারমোনিয়াম বাজনার তালিম নেন। সন্তোষবাবু ভালো তবলা বাজাতেন। সম্ভবত রাইচাঁদ বড়ালের নিকট তিনি তবলা বাজানো শেখেন। লালচাঁদ বড়াল, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ও ভীস্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

সন্তোষবাবুদের কলকাতার বৌবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ি ও তেলিনী-পাড়ার বাড়িতে প্রায়ই গানবাজনার আসর বসত। নানা গুনীজনের আসা-যাওয়া ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত গায়ক

হরিশচন্দ্র বালি, নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীনদাস মতিলাল, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (সরোদ), কালীপদ পাঠক, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, এ, টি, কানন, গোকুল নাগ (সেতার), মহাপুরুষ মিশ্র, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, কার্ত্তিক রায় (চুঁচুড়া) ও বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক সন্তোষ সেনগুপ্ত।

বিখ্যাত গায়িকা রোশেনারা বেগম একাধিকবার সন্তোষবাবুর তেলিনী-পাড়ার বাড়িতে সারারাতব্যাপী গানবাজনার আসরে যোগদান করেছেন। তাঁর বিয়েয় সময় পাঁচদিন ধরে সানাই বাজিয়েছিলেন বিসমিল্লা খাঁ, নাজির হোসেন, আলি হোসেন ও তাঁদের সম্প্রদায়।

তেলিনীপাড়া নিবাসী হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিজে যেমন সংগীতানুরাগী ছিলেন তেমনি তার পুত্রেরা সকলেই সংগীত ও অভিনয়ে দক্ষ ছিলেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র (জ্যোতির্ময়) মধ্যম (শিশির) কনিষ্ঠ (পূর্ণচন্দ্র) —সকলেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী এবং দক্ষ অভিনেতা ছিলেন।

কৃষ্ণপটীর মিত্রবাড়িতে বিখ্যাত গায়ক জগন্ময় মিত্র আসা-যাওয়া করতেন। মিত্রবাড়ির সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। মিত্রবাড়ির সুবোধ মিত্র ও দুলাল মিত্র গায়ক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

লোকসংগীত ও লৌকিক উৎসবের নানা অনুষ্ঠান এ অঞ্চলে নিয়মিত হত। তেলিনীপাড়ার বসন্তপুকুরের উত্তর পশ্চিম কোণে পুকুরের পাড়ে প্রতি বৎসর শীতকালে বাদাই ও তরজা গানের আসর বসত। অন্নপূর্ণা মন্দির প্রাঙ্গণে পাঁচালি, কথকতা ও ধর্মীয় সংগীতের নিয়মিত অনুষ্ঠান হত। বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার শিব-অন্নপূর্ণার রথযাত্রা উপলক্ষে দেবদেবীর বন্দনামূলক গান গাওয়া হত। আজও এই সংগীতানুষ্ঠান রথযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ। বিখ্যাত সংগীতসাধক কালোবাবুর রচিত গান এখনো পর্যন্ত ঐ উপলক্ষে গাওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যাত্রা, পালাগান, কথকতা ও ধর্মীয় সংগীতের অনুষ্ঠান নিয়মিত হত ভদ্রেশ্বর শ্যামসুন্দর বাটীর ভিতরের প্রাঙ্গণে। মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবারের রাসযাত্রা উপলক্ষে একমাসব্যাপী মেলায় যাত্রা ও ধর্মীয় সংগীতের নিয়মিত অনুষ্ঠান হত।

তেলিনীপাড়া অঞ্চলে উচ্চাঙ্গ সংগীতের শেষ সারারাতব্যাপী অনুষ্ঠান হয় ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে। এর উদ্যোক্তা ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সংগীতজ্ঞ বেচু প্রামাণিক ওরফে সম্রাট সেন ও কালোবাবুর শিষ্য শ্রীশিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি হয় "সা রে সা নি" সংস্থার পরিচালনায়। সারারাতব্যাপী এই উচ্চাঙ্গসংগীত আসরের গায়ক ও বাদকরা ছিলেন এ, টি, কানন, গোন্দলপাড়ার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় (বেহালা), হারমোনিয়মে মনোহর মঙ্গেশকর, মহাপুরুষ মিশ্র ইত্যাদি।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান মানিকলাল মণ্ডল অসাধারণ কণ্ঠমাধুর্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক পঙ্কজকুমার মল্লিকের স্নেহধন্য সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। মানিকলালের আকৃতি ও কণ্ঠধ্বনি পঙ্কজকুমারের মতই ছিল। তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করলেও মূলত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসাবেই তাঁর সুনাম ছিল। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সাধককে হারিয়েছি।

তেলিনীপাড়ার হাবুল দাস ও বিশ্বনাথ দাস যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। হাবুল দাস তবলা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে এবং তাঁর ভাই বিশ্বনাথ দাস সঙ্গীতে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতচর্চা
ভদ্রেশ্বর

ভদ্রেশ্বরের সঙ্গীতচর্চা মূলত ধর্মউৎসব-কেন্দ্রীক। জন্মাষ্টমীর দিন প্রতি বৎসর বাদাইগান হত। সঙ্ সেজে বাড়ী বাড়ী গিয়ে সঙ্গীতসহ অভিনয় দেখান হত। চৈত্র সংক্রান্তির দিন ও ঘেঁটুপূজার শেষদিনে ধর্মীয় সংগীত গাওয়া হত। ভদ্রেশ্বর-গৌরহাটী অঞ্চলে নগর পরিক্রমা করে কীর্তনগান করা হত। কীর্তনগান পরিবেশনের কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত দল ছিল।

কথক ঠাকুর পুরাণ কাহিনী পাঠ ও সঙ্গীত সহযোগে পরিবেশন করতেন। কথকতা অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল। জগদ্ধাত্রী পূজার

সময় প্রতি রাত্রে যাত্রা, নাটক ও ধর্মসংগীত পরিবেশন করা হত। তেঁতুলতলা ও ভদ্রেশ্বরগঞ্জের পূজা প্রাঙ্গণে তর্জা, মহিলা গায়িকা কর্তৃক কীর্তনগান পরিবেশন করা হত।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের ব্যাপক চর্চা না হলেও চর্চা হত। সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শম্ভুচরণ রায় ধ্রুপদ গান গাইতেন। সংগীতসাধক কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, গোষ্ঠবিহারী মালিক (শিক্ষক), তুলসীচরণ চট্টোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা করতেন। একত্র বসে এঁরা নিয়মিত রেওয়াজ করতেন।

তটিনী টকিজের নিকট কনসার্ট পার্টি ছিল। বেহালা, ফ্লুট প্রভৃতি নানা যন্ত্রসংগীত চর্চা হত। যাত্রার আসরে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে এই কনসার্ট পার্টি নিয়মিত বাজাতেন। মটরবাবু ও সুরো (হাতকাটা) ভাল বেহালা বাজাতেন। ভদ্রেশ্বরের সিদ্ধেশ্বর সুর ও বটকৃষ্ণ সুর কনসার্ট পার্টির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এঁরা নিজেরা বাজাতেন এবং সংগীত পরিচালনা করতেন।

(গ) নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয়
তেলিনীপাড়া

আগেকার যুগে জমিদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি ধনী ও অভিজাতবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয় হত। এছাড়া দেবালয়ভিত্তিক নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরাণিক যাত্রা ও পালাগানের আসর বসত। আমাদের অঞ্চলে দুয়েরই অভাব ছিল না। তেলিনীপাড়ার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানকুন্ডুর জমিদার ও ব্যবসায়ী খাঁন পরিবার দীর্ঘদিন ধরে নাট্যাভিনয় ও নাট্যচর্চায় উৎসাহ দান করে এসেছেন। ভদ্রেশ্বরগঞ্জের ধনী ব্যবসায়ীবৃন্দ নাট্যাভিনয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তেলিনীপাড়ার অন্নপূর্ণা মন্দির, ভদ্রেশ্বরে ভদ্রেশ্বরনাথের মন্দির ও মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবারের ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে পৌরাণিক পালাগান ও যাত্রাভিনয় নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত।

আমরা ইতিপূর্বে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের নাট্যরূপ 'বিদ্যাসুন্দর'

পালার দল গঠনের কথা উল্লেখ করেছি। জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়দের অর্থানুকুল্যে ও পরিচালনায় 'বিদ্যাসুন্দর' পালার নিয়মিত অভিনয় এ অঞ্চলে ও দূরবর্তী অঞ্চলে আমন্ত্রণমূলক অনুষ্ঠান হিসেবে পরিবেশিত হত। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় নাট্যাভিনয় হত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূচনা হতেই স্থানীর নাট্যানুরাগী ব্যক্তিরা অভিজাতবর্গের আওতার বাইরে নিজস্ব নাট্যচর্চা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে প্রায় এক শতাব্দী ধরে সৌখীন নাট্যাভিনয়ের ধারাবাহিকতা এ অঞ্চলে বজায় আছে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে বাঙালীর মনে জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার আসে, তারই ফলে নানা দেশপ্রেমমূলক নাটক অভিনীত হত। তেলিনীপাড়া অঞ্চলে গড়ে ওঠে "সঙ্গীত সমাজ" নামে একটি সৌখীন নাট্যগোষ্ঠী। এই নাট্যগোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। মূলত তাঁরই নেতৃত্বে ও পরিচালনায় একের পর এক নাটকের অভিনয় হয়। দেবেন্দ্রনাথের বৈঠকখানা গৃহে ঐ নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম এবং তাকে কেন্দ্র করেই সবকিছু। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন অসাধারণ নাট্যপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সাতাশ বছর তিনি সুনামের সঙ্গে বহু নাটক অভিনয় ও পরিচালনা করেছিলেন। তিনি যেমন বড় অভিনেতা ছিলেন, তেমনি বড় মাপের পরিচালকও ছিলেন। তাঁর অভিনীত প্রথম নাটক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত'। পরবর্তীকালে রাণা প্রতাপ, বঙ্গে বর্গী, সাজাহান, কর্ণার্জুন, পথের শেষে ইত্যাদি বহু নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ অসাধারণ সংগঠনশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে স্থানীয় যুবকসমাজ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে বহু উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। অন্নপূর্ণা পুস্তকাগারের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

যখন তাঁর বয়স ত্রিশ/বত্রিশ বৎসর, তখন অভিনয়ের জগতে তাঁর সুনাম এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র সুবিখ্যাত

দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) তাঁকে কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে সুযোগ তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। একটি চোখে সামান্য ত্রুটি থাকার জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁর পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা হয়ে ওঠেনি।

পরবর্তীকালে 'সবুজ সমিতি', 'খেয়ালী সঙ্ঘ' ও স্থানীয় নানা সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় নাট্যাভিনয়ের ধারাটিকে বজায় রেখেছেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন লালকুঠি বাড়িতে এসেছিলেন, তখন বিদ্যাসুন্দর পালার সঙ্গে 'পথের শেষে' নাটকটি অভিনয় করেন তেলিনীপাড়ার সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়। অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন নীলমণি গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র নলিনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের গৃহে কয়েকবার সেযুগের বিখ্যাত 'হাওড়া সংগীত সমাজ' কর্তৃক 'নদের নিমাই' পালাটি অভিনয় হয়েছিল। ঐ পালায় একটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত নট ছবি বিশ্বাস। তেলিনীপাড়ার চক্রবর্তী পরিবারের দৌহিত্র সন্তান বিখ্যাত অভিনেতা তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তেলিনীপাড়ার নাট্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তেলিনীপাড়ায় নাট্যরসিক ব্যক্তির অভাব ছিল না। যাঁদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল কয়েকটি নাট্যচর্চা কেন্দ্র। অভিনয় ছিল যাঁদের ধ্যানজ্ঞান। দলগঠন ও পরিচালনার জন্য যাঁরা অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। সংস্কৃতিমনা জীবন-রসিক এই ধরণের মানুষ আজ আর নেই।

তেলিনীপাড়া-পাইকপাড়ার শ্যামাচরণ দাস মহাশয় একাই একটি প্রতিষ্ঠান ছিলেন। কর্মসূত্রে স্থানীয় জুটমিলে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। কিন্তু তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল নাট্যাভিনয়। তাঁর উপযুক্ত সহযোগী ছিলেন পাইকপাড়ার সন্তোষকুমার আদক। সু-অভিনেতা সন্তোষবাবু প্রায়শই রাজা রাজড়ার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। এই দুজনের সঙ্গে ছিলেন—চারুচন্দ্র কয়াল ও নিত্যগোপাল দাস।

শ্যামবাবুর নেতৃত্বে এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় 'বিল্বমঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' নামে দুটি যাত্রাপালা প্রস্তুত হয়। শ্যামবাবুর পাইকপাড়াস্থ ভাড়া-বাড়িতে ঐ যাত্রাপালার মহড়া হত। "বিদ্যাসুন্দর" অভিনয়ের এটি দ্বিতীয় প্রচেষ্টা।

'বিল্বমঙ্গল' পালায় অভিনয় করতেন সন্তোষকুমার আদক, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বারাসত দশভুজাতলায় শিকদার-পুকুর ধারে নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় বিদ্যাসুন্দর পালার মহড়া দেওয়া হত। বিদ্যাসুন্দরের নৃত্যশিক্ষক ছিলেন নিত্যগোপাল দাস। তিনি নিজে মালিনীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। মানকুণ্ডুর নিকটবর্তী ব্যাজড়া গ্রামের পঙ্কজ কুমার রায় বিদ্যার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। ভিস্তির ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করতেন মানকুণ্ডুর খাঁ পরিবারের কৃষ্ণচন্দ্র খাঁ। তিনি ভালো ফ্লুট বাজাতে পারতেন। বর্ধমানরাজের ভূমিকায় অভিনয় করতেন সন্তোষ কুমার আদক।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হতে জানা যায় যে—বিদ্যাসুন্দর সঙ্গীতবহুল যাত্রাপালা। তাই সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের মুখ্য ভূমিকা ছিল। অভিনয় আসরে কালোবাবু (জিতেন্দ্রনাথ) সারেঙ্গী বাজাতেন। ভুলু-বাবু (হৃদয়চন্দ্র) হারমোনিয়ম বাজাতেন। পাখোয়াজ বাজাতেন শিকদারবাবু আর তবলা বাজাতেন হারু বন্দ্যোপাধ্যায়। এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শিল্পীসমন্বয়ে প্রস্তুত বিদ্যাসুন্দর পালা দেখতে দেশবিদেশের লোক আসতেন। একবার গিরিশ ঘোষের পুত্র অভিনেতা দানীবাবু বিদ্যাসুন্দর পালা দেখতে এসেছিলেন। আমন্ত্রিত হয়ে বিদ্যাসুন্দর ও বিল্বমঙ্গলের যাত্রাপালার দল নানা স্থানে অভিনয় করতে যেতেন। শতাধিক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হত। সেই অর্থ যোগাতেন প্রথমদিকে তেলিনীপাড়ার জমিদারগণ, পরবর্তী-যুগে শ্যামাচরণ দাসের মত নাটকপাগল ধনী পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ। বিদ্যাসুন্দর পালার খ্যাতি এতই ছড়িয়ে পড়েছিল যে, স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই পালা দেখতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

তেলিনীপাড়ার দুই নাট্যরসিক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে দুটি পৃথক

অভিনয় ধারা ও গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। প্রথম গোষ্ঠী থিয়েটার করতেন আর দ্বিতীয় গোষ্ঠী যাত্রাপালার আসর বসাতেন। প্রথমটির নেতৃত্বে ছিলেন তেলিনীপাড়া সঙ্গীত সমাজের দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আর দ্বিতীয়টি শ্যামাচরণ দাস ও সন্তোষ কুমার আদকের যুগ্ম পরিচালনায় পাইকপাড়া নাট্যগোষ্ঠী। উভয় গোষ্ঠীতে সুঅভিনেতার অভাব ছিল না। অভিনয় করতেন পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, সুধীর চট্টোপাধ্যায়, দুলালচন্দ্র দাস, বলাইচন্দ্র ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভোর চট্টোপাধ্যায়, পদ্মানন চক্রবর্তী, অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র কয়াল, হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অকিঞ্চন মুখোপাধ্যায়।

পরবর্তীযুগে খেয়ালী সঙ্ঘের পরিচালনায় অভিনীত নাটকের অভিনেতা ছিলেন—সতীশ দাশগুপ্ত, শম্ভুরাজ চট্টোপাধ্যায়, প্রণত মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

অন্নপূর্ণা পুস্তকাগারের ৬২তম বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে অভিনীত 'ঘণ্টাফটক' নাটকের নাটক ও সঙ্গীত পরিচালনা করেন কলকাতার বিখ্যাত যাত্রাশিল্পী তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়। তেলিনীপাড়াতে নাট্যাভিনয়ের ধারা আজো অব্যাহত। অভিনয় করে চলেছেন—শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণাদিত্য চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার নিয়োগী, চম্পক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রঞ্জিত মিত্র প্রভৃতি অভিনেতাগণ।

নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয়

ভদ্রেশ্বর

ভদ্রেশ্বর-গৌরহাটী অঞ্চলে পূর্বে যাত্রা, পালাগান যতো চর্চা হত বা জনপ্রিয় ছিল, সেই তুলনায় থিয়েটার ততো জনপ্রিয় ছিল না। শীতলা-মনসা ক্লাব (মানিকনগর), ভবানী ক্লাব (ভদ্রেশ্বরগঞ্জ), ভদ্রেশ্বর ইয়ং ম্যানস্ এ্যাসোসিয়েশন, মিতালী সংঘ, জগদ্ধাত্রী মাতা নাট্য সমিতি নিয়মিত নাট্যচর্চা করতেন। এদের মধ্যে ইয়ং ম্যানস্ এ্যাসোসিয়েশন কেবল থিয়েটার করতেন।

রাজেন্দ্রনাথ নিয়োগীর পরিচালনায় ইভনিং ক্লাব নামে একটি সংস্থা নিয়মিত অভিনয় করতেন। ভদ্রেশ্বর আর্ট প্লেয়ার্স সংস্থা বহু নাটক অভিনয় করেছেন। আর্ট প্লেয়ার্সের নাট্য পরিচালক ছিলেন শ্রদ্ধেয় পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়। রাজেন্দ্রনাথ নিয়োগী, কমল ঘোষ, দ্বিজেন সরকার, সনৎ চক্রবর্তী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল সাধুখাঁ প্রভৃতি নাট্যামোদী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন ভদ্রেশ্বরের নাট্যচর্চা ও অভিনয়ের মূল স্তম্ভ। আর্ট প্লেয়ার্স সংস্থা সর্বপ্রথম অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।

আর্ট প্লেয়ার্সের অভিনেতাদের মধ্যে পান্নালাল চট্টোপাধ্যায় এখনও নিয়মিত অভিনয় করে চলেছেন। তিনি বেতার, পেশাদার মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। এ অঞ্চলে অভিনীত বহু নাটকের তিনি নাট্যনির্দেশনা করেছেন। সুঅভিনেতা ও সুপরিচালক হিসাবে তাঁর খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর পূর্বে ভদ্রেশ্বরে কেহই বেতার ও পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন নি।

কলকাতার যাত্রাসমাজে পেশাদার শিল্পী হিসাবে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন—রামচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অনিল ভাদুড়ি মহাশয়। তাঁরা বহু নামী দামী যাত্রাদলে অভিনয় করেছেন।

রবিচক্র—ভদ্রেশ্বর

ইংরাজী ১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডে (ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগারের পুরাতন গৃহে) রবিচক্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও রবীন্দ্রানুরাগী দুর্গাপদ তরফদারের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী" নাটক মঞ্চস্থের মাধ্যমে রবিচক্রের সাংস্কৃতিক জীবন সুরু।

সঙ্গীত-নৃত্য-নাটককে কেন্দ্র করে এর কর্মধারা যেমন বিস্তৃত ছিল তেমনি নানা সমাজসেবামূলক কাজে এদের উৎসাহের অভাব ছিল না। নিয়মিত ক্লাসের মাধ্যমে রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি, নৃত্য (কথক ও ভারত-নাট্যম), গীটার, আবৃত্তি ও নাট্য অভিনয় শিক্ষাদান রবিচক্রের কর্মসূচীর অন্যতম অংগ। এছাড়া বাৎসরিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার

মাধ্যমে আবৃত্তি, রবীন্দ্র-নজরুল সংগীত, যন্ত্রসংগীত, বিতর্ক ও ছোটগল্প লেখার আয়োজন করা হয়।

নাট্যবিভাগ রবিচক্রের অন্যতম বলিষ্ঠ শাখা। এই বিভাগ রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী", "গোরা", "মুক্তধারা", "চিরকুমার সভা", গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল", দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পন", বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও তারাশঙ্করের "গণদেবতা" প্রভৃতি নাটকের অভিনয় সাফল্যের সঙ্গে করেছেন। মহাকবি সেকস্‌পীয়ারের "ম্যাকবেথ" ও "ওথেলো" সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছে রবিচক্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, তুলসী লাহিড়ী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শ্রীমতী ছায়াদেবী। এসেছেন সঙ্গীতাচার্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, ধীরেন মিত্র, গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। আবৃত্তিকার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও জগন্নাথ বসু, শাঁওলী মিত্র।

সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য রবিচক্রের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রবিচক্র আমাদের গর্ব ও গৌরবের কারণ হয়ে আছে।

নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয়

মানকুণ্ডু

মানকুণ্ডু অঞ্চলে নাট্য আন্দোলন ও নাট্যচর্চার পুরোধা ও প্রাণপুরুষ ছিলেন মানকুণ্ডু বামুনপাড়া নিবাসী কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণকুমার ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। নাট্যশিল্পে নিবেদিত প্রাণ কৃষ্ণকুমার সারাজীবন অভিনয় করেছেন। ভদ্রেশ্বর, তেলিনীপাড়া ও চন্দননগরের প্রায় সব নাট্যচর্চা কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। অভিনয় ব্যতীত নাট্য নির্দেশনাতেও তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য দেখা যায়।

তাঁর অভিনীত শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিতে তাঁর ভূমিকা ছিল নিম্নরূপ—মিশরকুমারীতে আবন, সীতাতে শম্বুক, কর্ণার্জুনে কর্ণ, শাজাহানে শাজাহান, বঙ্গে বর্গিতে ভাস্কর পণ্ডিত, চন্দ্রগুপ্তে সেলুকস্। মিশরকুমারীতে আবনের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে তৎকালীন ফরাসী কন্সাল তাঁকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানসূচক পুরস্কার দেন। নাট্যজগতের সম্রাট কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে আমরা আমাদের অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভাকে হারিয়েছি।

(ঘ) অন্যান্য শিল্পচর্চা

সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, অভিনয়—এই তিনটি ধারাতেই এ অঞ্চলের শিল্পচর্চা কেন্দ্রীভূত ছিল। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে কেবলমাত্র চিত্রাঙ্কন বিদ্যার সামান্য চর্চা হয়েছিল। জমিদার বংশীয় মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অভিজ্ঞ চিত্রশিল্পী ছিলেন। তিনি নিজের বাড়িতে সৌখীন শিল্পী হিসাবে বহু চিত্র অঙ্কন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার সেই চিত্রশিল্পচর্চার ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছিলেন। ইনি চিত্রশিল্পী হিসাবে কলকাতার সুধী সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। রাজা হৃষিকেশ লাহার পুত্র ভবানীচরণ লাহা যখন তাঁর পক্ষী সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থের নানা শ্রেণীর পক্ষীর যাবতীয় চিত্র অঙ্কন করেন যোগেশচন্দ্র।

দেওয়ানবাড়ির চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন অংকনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেযুগে কলকাতার প্রায় সব পত্রপত্রিকায় চঞ্চলকুমারের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হত।

দ্বাদশ অধ্যায়

খেলাধূলা ও শরীরচর্চা

ভদ্রেশ্বর-তেলিনীপাড়া-মানকুণ্ডু অঞ্চলের আদি অধিবাসী ছিলেন বাগ্দী, কৈবর্ত ও পাইক সম্প্রদায়। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তেলিনীপাড়া অঞ্চলের পূর্ব ইতিহাসের মধ্যেই লুকিয়ে আছে নানা সামরিক স্মৃতি। ফরাসীদের তৈলংগী (দক্ষিণ ভারতীয়) সৈন্যদের আবাসস্থল হিসেবেই তেলিনীপাড়ার নামকরণ। তেলিনীপাড়ার একটি অংশ পাইকপাড়া। পাইকপাড়া বহু পুরাতন স্থান। হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের যুগে তাদের পাইক সৈন্যদের ঘাঁটি বা আবাস্থল ছিল এই পাইকপাড়া। গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল হওয়ার জন্য কৈবর্ত বংশীয় ধীবর সম্প্রদায় এই অঞ্চলের প্রাচীন বাসিন্দা। বর্গক্ষত্রিয় বা বাগ্দী সম্প্রদায়ও এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন বসবাস করছে। কৈবর্ত ও বাগ্দী সম্প্রদায় রণনিপুণ সম্প্রদায়। অতীতে একদিন বাংলাদেশের কৈবর্তরাজ দিব্যোক ও ভীমের সামরিক নৈপুণ্যের কথা ইতিহাসে লেখা আছে। নানা রণনিপুণ সম্প্রদায়ের বাসভূমি হিসেবে এই অঞ্চলে শরীরচর্চা ও খেলাধুলোর প্রচলন ছিল।

বর্তমানে যেখানে নর্থ শ্যামনগর জুটমিল, সেইস্থানে জুটমিল স্থাপনের পূর্বে একটি বড় বাগান ছিল। তার নাম 'আখড়ার বাগান'। স্থানটি নিম্নাঞ্চল হবার জন্য বর্ষাকালে গঙ্গার জল বাগানে ঢুকত আবার শীতকালে ঐ বাগান ছিল কুস্তি ও লাঠি খেলার আখড়া। মূলত ঐ

আখড়ায় কুস্তি ও লাঠি খেলার চর্চা করতেন কৈবর্ত, বাগদী ও পাইক সম্প্রদায়। পাইকরা ছিলেন হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের যুগে পদাতিক সৈনিক। এঁরা মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরে, খালি পায়ে হাতে লাঠি সড়কি ও বেতের ঢাল নিয়ে লড়াই করতেন। বাগদী ও কৈবর্ত সম্প্রদায় ভালো লাঠিয়াল ছিলেন। ইংরেজ আমলের পূর্বে তৎকালীন দেশীয় জমিদারবৃন্দ কৈবর্ত, বাগদী ও পাইক লাঠিয়ালদের দিয়ে শান্তিরক্ষা করতেন। এই কাজের পরিবর্তে তাদের 'চাকরানভূমি' দেওয়া ছিল। পুরুষানুক্রমে তারা ঐ ভূমিচাষ করতেন ও যুদ্ধবিগ্রহে লাঠি ধরতেন। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঐসব চাকরানভূমি বাজেয়াপ্ত করে নিলেন ও স্থানীয় শান্তিরক্ষার দায়িত্ব জমিদারদের হাত থেকে তুলে নিয়ে থানার দারোগাদের হাতে দিলেন। ফলে ঐ যোদ্ধৃ সম্প্রদায় বৃত্তিহীন হয়ে অন্য রুজিরোজগারের পথে গেলেন। আবার কেউ কেউ ডাকাইত দলভুক্ত হলেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় এসব অঞ্চলের বসবাসকারী নিম্নশ্রেণীর মানুষদের পূর্বপুরুষরা যে যোদ্ধৃ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তার একটি উদাহরণ স্বরূপ স্থানীয় বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক গর্ব করে বলতেন -- "আমরা জাতে বাগদী বুঝলি, আমরা লেঠেলদের বংশধর। আমাদের পূর্বপুরুষরা কোম্পানীর আমলে রুজিরোজগার হারিয়ে ডাকাতি করত।" ছাত্ররা একদিকে সেই শিক্ষক ও অন্যদিকে নামকরা লাঠিয়ালটির কথা শুনে বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো। ভদ্রেশ্বরে তাঁর লাঠিখেলার আখড়া ছিল। হাতে লাঠি নিয়ে যখন দাঁড়াতেন, তখন তাঁর অন্য চেহারা। মানিকনগর অঞ্চলের ডাকসাইটে 'ইন্দুরে ডাকাত' রণপায়ে চড়ে ভদ্রেশ্বর থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত যাতায়াত করত। আগেকার যুগে শরীরচর্চা বলতে কুস্তি আর লাঠিখেলা বোঝাত। পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের লোকেদের মধ্যেও কুস্তি ও লাঠিখেলার চর্চা হত। আমাদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণপটী নিবাসী ভূপালচন্দ্র বাগ মহাশয় সগর্বে উল্লেখ করেন যে তাঁর প্রপিতামহ বিখ্যাত লাঠিয়াল ছিলেন। তাঁদের আদি বাসস্থান মেদিনীপুর হতে মানকুণ্ডুর জমিদার খাঁন পরিবারের গৃহরক্ষী

হিসাবে পাইকান জমি পেয়ে কৃষ্ণপটীর বাগপাড়ায় বসবাস শুরু করেন।

তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রামধন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকায় বলশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁর বাল্যকালে পেশাদার কুস্তিগীরদের কাছে তিনি কুস্তিশিক্ষা করেন। তিনি অশ্বচালনা, নৌচালনা, বাইচ খেলা, কুস্তি, লাঠিখেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মানিকনগরে পৃথক বাড়ি করে তিনি বাস করতেন। সেই বাড়িতে শক্তিচর্চার সবরকম আয়োজন ছিল।

সেযুগে গঙ্গাতীরবর্তী শহরের মানুষদের মধ্যে নৌকা বাইচ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। গঙ্গাতীরবর্তী প্রায় প্রতিটি শহরে বাইচের দল ছিল। ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি বৎসর বাইচ প্রতিযোগিতা হত। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যে দল জয়লাভ করত, তার ভাগ্যে জুটত অনেক পুরস্কার। বাইচকে উপলক্ষ করে মাঝে মাঝে হারজিত নিয়ে লাঠালাঠি পর্যন্ত হত। রামধনবাবুর নেতৃত্বে তেলিনীপাড়ার বাইচের দল প্রতিযোগিতায় জিতে গ্রামের সুনাম বৃদ্ধি করেছিল। পরবর্তীকালে নদীতীরে কলকারখানা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বাইচখেলা পরিত্যক্ত হয়।

তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশীয় যোগেশচন্দ্র, অক্ষয়কুমার ব্যায়ামবীর ছিলেন। অক্ষয়কুমার নিজ ব্যয়ে তেলিনীপাড়ায় ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে স্থানীয় যুবকবৃন্দ নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করত। সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় অশ্বচালনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর আস্তাবলে বেশ কয়েকটি বিদেশী ভালো জাতের অশ্ব ছিল। তাঁর পুত্র সত্যশান্তি খুব অল্প বয়সেই অশ্বচালনা করে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে গোরা সৈন্যদের ফুটবল খেলা ক্রমশ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ীগণ অগ্রনীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁদেরই অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ফুটবল নামক সাহেবী খেলাটি এ অঞ্চলের জনপ্রিয় খেলায় পরিণত হয়। জমিদার সত্যদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র

সত্যকুমার (সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) ফুটবল খেলায় অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। নিজে ভালো ফুটবল খেলতেন এবং একটি ফুটবলের দল গড়ে তোলেন। সেকালের ভারতীয়রা সবাই খালি পায়ে খেললেও সত্যকুমার বুট পরে খেলতেন। চন্দননগরের কুঠির মাঠে নিয়মিত ফুটবল খেলা হত। ঐ মাঠের তিনি মালিক ছিলেন। তিনি চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ফুটবল খেলার জন্য ঐ বিরাট মাঠটি তিনি দান করেন। যখন স্পোর্টিং ক্লাব হাউসটি নির্মিত হয়, তখন তার নির্মাণব্যয়ের সিংহভাগ তিনিই বহন করেন। বর্তমান সময়ে কুঠির মাঠে 'কানাইলাল স্টেডিয়াম' গড়ে উঠেছে।

বিখ্যাত টপ্পা গায়ক কালোবাবুর ছোট ভাই হৃদয়চন্দ্র (ভুলিবাবু) শুধু গানবাজনা নয়, খেলাধুলাতেও অনুরাগী ছিলেন। গ্রামের আদি ফুটবল ক্লাব, অন্নপূর্ণা ফুটবল ক্লাবে তিনি নিয়মিত ফুটবল খেলতেন। পরবর্তীকালে যখন ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাথলিটিক ক্লাব স্থাপিত হয়, ভুলিবাবু তখন তার সভাপতি ছিলেন ও এই ক্লাবের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

এ অঞ্চলে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে ফুটবল খেলা শুরু হয়ে যায়। বাংলাদেশে ফুটবল খেলার স্বর্ণযুগ শুরু হয় যখন ১৯১১ সালে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব আই, এফ, এ, শীল্ডের চূড়ান্ত খেলায় জয়লাভ করে। সেই জয়লাভের উদ্দীপনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। উৎসাহের জোয়ার এ অঞ্চলে এসেও পৌঁছোয়। তেলিনীপাড়া--ভদ্রেশ্বর--মানকুণ্ডু অঞ্চলের ছেলেরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে নিয়মিত ফুটবল খেলা শুরু করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাথলেটিক ক্লাব' স্থাপিত হয়। বর্তমানে যেখানে নর্থ শ্যামনগর জুটমিল, তার উত্তরে যে কুলিলাইন আছে, সেখানে আগে 'বন্ধুর বাগান' বলে একটি ফাঁকা মাঠ ছিল। ঐ মাঠে তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, মানিকনগর, কৃষ্ণপটী অঞ্চলের ছেলেরা ফুটবল খেলত। খেলোয়াড় বেশি হবার জন্য বন্ধুর

বাগানের দক্ষিণে, এখন যেখানে নর্থ শ্যামনগর জুটমিলের চিমনি আছে, তখন সেখানে তেঁতুলতলার মাঠ ছিল। বড় ছেলেরা তেঁতুলতলার মাঠে ও ছোটরা বন্ধুর বাগানে খেলত। পরবর্তীকালে যখন নর্থ শ্যামনগর জুটমিল হল, তখন ঐ দুটি মাঠই খেলোয়াড়দের হাতছাড়া হয়ে গেল। খেলার উৎসাহ এত বেশী ছিল যে এই অঞ্চলের সব ছেলেরা গৌরহাটীতে বর্তমানে যেখানে ই. এস, আই, হসপিটাল আছে, সেখানে খেলতে যেত। শেষে যখন গৌরহাটীর মাঠও হাতছাড়া হল, তখন ভদ্রেশ্বর জুটমিলের ম্যানেজার মিঃ শেফার্ড ছেলেদের অনুরোধে বর্তমানে যেখানে বেলিশ কারখানা, ঐ স্থানে তখন একটি ঘেরামাঠ ছিল। সেই মাঠে এ অঞ্চলের ছেলেদের ফুটবল খেলার অনুমতি দেন। খেলার মাঠের এই অসুবিধা দূর হয় ভদ্রেশ্বর পুরসভার উপ-পৌরপ্রধান কানাই-লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায়। কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিহর বন্দ্যো-পাধ্যায়—দুই ভাইয়ের খেলাধুলায় খুব আগ্রহ ছিল। কানাইবাবু ভদ্রেশ্বর পৌরসভার ফকিরডোবা অঞ্চলে একটি মাঠ দীর্ঘদিনের লীজে ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাথলেটিক ক্লাবকে খেলাধুলার জন্য বন্দোবস্ত করে দেন। কানাইবাবুরা শুধু ফুটবল খেলা নয়, ক্রিকেটেও উৎসাহী ছিলেন। তাঁরা কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলের নানা নামকরা খেলাধুলার দলকে ডেকে এনে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার আয়োজন করতেন। এ অঞ্চলে ফুটবল খেলার প্রসারে চন্দননগর বোড়াইচণ্ডীতলা নিবাসী ও তৎকালীন বাংলাদেশের খ্যাতনামা খেলোয়াড় সতীশচন্দ্র পলসাই মহাশয়ের অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত।

তেলিনীপাড়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় বংকুবিহারী চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৩ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১১ খ্রীঃ চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে ট্রেডস্ কাপ বিজয়ী ফুটবল দলে অংশগ্রহণ করেন। মোহনবাগান ক্লাবের হয়েও তিনি কিছুদিন খেলেছিলেন। তিনি ভাল শিকারী ছিলেন। এ অঞ্চলের নানা খেলাধুলার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। ১৯৩৮ সালে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

অন্যান্য ক্রীড়া ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা

ফুটবল ছাড়া জিমন্যাস্টিকস্, ভলিবল, হাডুডু ও যোগব্যায়ামচর্চার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে গড়ে উঠেছে। উদয়ন ব্যায়াম সমিতি প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে জিমন্যাস্টিক চর্চার কেন্দ্র হিসেবে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছে। এখানকার ছাত্রেরা সারা ভারতবর্ষের নানা প্রতিযোগিতায় বহু পুরস্কার পেয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। এখানকার শিক্ষার্থীরা উত্তর জীবনে বহু ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বেসরকারী সংস্থার খেলাধূলা সংক্রান্ত পদে কর্মরত আছেন।

ভদ্রেশ্বরের ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাব ও ভবানী সংঘ নামকরা প্রতিষ্ঠান। তাঁদের সুপরিচালনায় ফুটবল, ভলিবল, খো-খো ইত্যাদি ক্রীড়ার প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা অত্যন্ত সুনাম ও সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের অঞ্চলকে সর্বভারতীয় খেলাধূলার মানচিত্রে স্থান করে দেবার জন্য উদয়ন ব্যায়াম সমিতি, ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাব ও ভবানী সংঘের প্রচেষ্টাকে আমরা অকুণ্ঠচিত্তে সাধুবাদ জানাই। তেলিনীপাড়ার তাঁতীপাড়া হা-ডু-ডু ক্লাব মাঝে মাঝেই জেলা ও প্রাদেশভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে অবহেলিত হা-ডু-ডু খেলাকে খেলার জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তেলিনীপাড়ার জাগরনী সংঘ হুগলী জেলার যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতার আয়োজন করে যোগব্যায়াম চর্চায় নব দিগন্তের উন্মোচন করেছে। তেলিনীপাড়ার অন্নপূর্ণা বয়েজ ক্লাবের পরিচালনায় সারা বাংলা জুনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গঙ্গার উভয়তীরে যেসব পাটকল ছিল, আগেকার যুগে তাদের অধিকাংশ উচ্চপদে স্কটল্যাণ্ডের স্কচ সাহেবরা নিযুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ বিদেশী জুটমিলের মূলকেন্দ্র ছিল স্কটল্যাণ্ডের ড্যাণ্ডী শহর। স্কটল্যাণ্ডের জনপ্রিয় খেলা গল্ফ। স্কচ সাহেবরা তাদের অবসর

বিনোদনের জন্য এ অঞ্চলে কয়েকটি গল্‌ফ ক্লাব ও মাঠ গড়ে তুলেছিলেন। আমাদের অঞ্চলে নর্থ শ্যামনগর জুটমিলের পূর্বদিকে গঙ্গাতীরে একটি বিরাট গল্‌ফ গ্রাউন্ড ছিল। এছাড়া আমাদের পার্শ্ববর্তী শহর চন্দননগরের গোন্দলপাড়া জুটমিলের সীমানার মধ্যে আরেকটি গল্‌ফ ক্লাব ছিল। গল্‌ফ সম্পূর্ণ বিদেশী খেলা এবং সেযুগে কেবলমাত্র সাহেবরাই খেলতেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত তেলিনীপাড়ার গল্‌ফ ক্লাবে বহু দূরবর্তী জুটমিলের সাহেবরা ছুটির দিনে গল্‌ফ খেলতে আসতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ঐ গল্‌ফ মাঠে কয়লার ডিপো তৈরী হল। ফলে এ অঞ্চলের একটি অতি সুন্দর গল্‌ফ খেলার মাঠ আমরা চিরকালের মত হারিয়েছি। যুদ্ধ থামলো। দেশ স্বাধীন হল। স্কচ সাহেবরা চলে গেলেন। গল্‌ফ খেলা বন্ধ হয়ে গেল।

অঞ্চলের বিভিন্ন খেলাধুলা সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইনটারন্যাসনাল এ্যাথেলেটিক ক্লাব, তেলিনীপাড়া—

১৯১১ খৃঃ মোহনবাগান ক্লাব আই, এফ, এ, শীল্ড লাভ করায় দেশব্যাপী উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সেই উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তেলিনীপাড়ার তরুন দল ইনটারন্যাসনাল এ্যাথলেটিক ক্লাব নামে একটি ফুটবল খেলার সংস্হা গড়ে তোলে। নর্থ শ্যামনগর জুট মিলের উত্তরে "বন্ধুর বাগান" এ ক্লাবের খেলাধূলার সূচনা হয়। পরবর্তীকালে স্হানীয় জুটমিল কর্তৃপক্ষের সহায়তার বিনিময়ে ক্লাবের পরিবর্তিত নাম হয়— "ইনটারন্যাসনাল ডাফ ক্লাব"। কারণ টমাস ডাফ কোম্পানীর বহু ইউরোপীয় কর্মচারী এই ক্লাবে খেলতেন। পরে অবশ্য "ডাফ" অংশটি বাদ দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে জুটমিলের কুলি লাইন হওয়ার জন্য খেলার মাঠ হস্তচ্যুত হয়। মাঠের অভাব দূর করেন কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে দুই ভ্রাতা। কানাইবাবু ভদ্রেশ্বর পুরসভার

উপ-পুর প্রধান থাকাকালে ফকির ডোবার মাঠটি (বর্তমান সুভাষ ময়দান) ক্লাবকে দীর্ঘদিনের মেয়াদে লীজ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

উত্তর চন্দননগর বাসী সতীশচন্দ্র পলসাই মহাশয়ের প্রচেষ্টায় কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলের নামী ক্লাবসমূহ খেলতে আসতেন। ফলে এ অঞ্চলের ফুটবল খেলার মান উন্নত হয়। ক্লাবের সভ্য বহু কৃতী খেলোয়াড় খেলাধুলার জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরবর্তীকালে ক্লাবের হাল ধরেন বীরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, সত্যেন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদন মাঝি। ক্লাবের সবচেয়ে দুর্দিনে বুক দিয়ে আগলে রেখে ক্লাবকে রক্ষা করেন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে অবশ্য বহু ঐতিহ্যের অধিকারী এই ক্লাবের অস্তিত্ব বজায় নেই।

বান্ধব সমিতি, তেলিনীপাড়া—তেলিনীপাড়ার অন্যতম প্রাচীন ফুটবল খেলার সংস্থা বান্ধব সমিতি বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সৃষ্টি হয়। এরও সূচনা "বন্ধুর বাগান" এ—নাম হয় বান্ধব সমিতি। সংস্থার কর্ণধার ছিলেন শ্যামাচরণ দাস, সংক্ষেপে শ্যামবাবু ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত ও অভিনয়ের মত খেলাধুলাতেও শ্যামবাবুর অসীম উৎসাহ ছিল। স্থানীয় জমিদারবৃন্দের অনেকে বান্ধব সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পরবর্তীকালে বান্ধব সমিতির খেলার মাঠ হয়, বর্তমানে যেখানে বেলিশ ইণ্ডিয়ার কারখানা। সেখানে পাচিলঘেরা সুন্দর খেলার মাঠ ছিল।

ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ইনটারন্যাশনাল ক্লাব ও বান্ধব সমিতির মধ্যে বন্ধুত্বমূলক প্রতিযোগিতা হত। বান্ধব সমিতির মাধ্যমে বহু কৃতী ফুটবল খেলোয়াড়ের সৃষ্টি হয়েছিল। বান্ধব সমিতির শেষ কর্ণধার ছিলেন, বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিক্স ডেনজারর্স ক্লাব, তেলিনীপাড়া—স্থানীয় অল্পবয়সী ফুটবল খেলোয়াড়রা "লালকুঠির" মাঠে সিক্স ডেনজারর্স ক্লাবের সৃষ্ঠি করে। বহু তরুণ খেলোয়াড়ের এখানে হাতেখড়ি হয়, যারা পরবর্তীকালে দক্ষ খেলোয়াড় হিসাবে সুনাম অর্জন করে। ক্লাবের তত্ত্বাবধানে প্রতি

বৎসর আকর্ষণীর ফুটবল প্রতিযোগিতা হত। বর্তমানে এই ক্লাবের অস্তিত্ব আর বজায় নেই।

উদয়ন ব্যায়াম সমিতি, তেলিনীপাড়া—বর্তমান শতাব্দীর চারের দশকে স্থাপিত হয় উদয়ন ব্যায়াম সমিতি। নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা এই সংস্থা বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শরীরচর্চা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। নিজস্ব বৃহৎ ব্যায়ামাগারে প্রতিদিন কয়েকশত শিক্ষার্থী শরীর-চর্চা করে। সমিতির সদস্যগণ প্রাদেশিক ও জাতীয়স্তরে জিমন্যাসটিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বহু পুরস্কার ও পদক লাভ করে আমাদের অঞ্চলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। সমিতির সদস্য জয়দেব দাস, রবীন দাস, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, সুশীল সরকার, সমীর কাঁড়ার, কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন ঘোষ, সমীর দাস ও আরও অনেকে রাজ্য ও জাতীয় প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ সংগঠকের আপ্রাণ চেষ্টায় উদয়ন ব্যায়াম সমিতি আমাদের গর্ব ও গৌরবের কারণ হয়েছে।

অন্নপূর্ণা বয়েজ ক্লাব, তেলিনীপাড়া—তেলিনীপাড়ার অন্নপূর্ণা বয়েজ ক্লাব দীর্ঘদিন ধরে ভলিবল খেলা প্রসারের কাজে সচেষ্ট। ক্লাবের পরিচালনায় বেশ কিছু তরুণ নিয়মিত ভলিবল চর্চা করে। বহিরাগত ক্লাবের সঙ্গে যেমন প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয় তেমনি অন্নপূর্ণা বয়েজ ক্লাবের খেলোয়াড়রা অন্যান্য স্থানে খেলতে যান। কিছুদিন পূর্বে ক্লাবের পরিচালনায় সারা বাংলা জুনিয়ার ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্লাবের দক্ষ ও সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য প্রতিযোগিতা সর্বাঙ্গীন সাফল্য লাভ করায় আমাদের অঞ্চলের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউনাইটেড এ্যাথলেটিক ক্লাব, ভদ্রেশ্বর—১৯৩৩ খ্রীঃ ইলেভেন বুলেটস্ ক্লাব ও ১৯৪৮ খ্রীঃ অগ্রগামী সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫৭ সালে ঐ দুই ক্লাব মিলিত হয়ে ইউনাইটেড এ্যাথলেটিক ক্লাবের সৃষ্টি হয়। বর্তমান বর্ষে (১৯৯৩ খ্রীঃ) সংযুক্ত সংস্থা ৬০ বৎসরের

হীরক জয়ন্তী বর্ষ পালন করছে।

ক্লাবের বহুমুখীন কর্মধারার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য নিজস্ব গৃহের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালে ক্রীত জমির উপর ক্লাবের সুরম্য দ্বিতল গৃহ নির্মিত হয়।

বর্তমানে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল খেলার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ক্রীড়া ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। ফুটবল, ভলিবলের বহু কৃতী খেলোয়াড় এই ক্লাব হতে শিক্ষা লাভ করে ক্রীড়া জগতে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। মেয়েদের ভলিবল খেলা শুরু হয় ১৯৭০ সালে। এই সংস্থার পরিচালনায় বহু জেলা, রাজ্য ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বভারতীয় ক্রীড়া জগতে ইউনাইটেড এ্যাথলেটিক ক্লাব দক্ষ সংগঠকের প্রশংসা লাভ করেছে। সর্বভারতীয় ক্রীড়া জগতে ভদ্রেশ্বরের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভবানী সংঘ, ভদ্রেশ্বর—১৯৪৮ খৃঃ ভদ্রেশ্বরের স্থানীয় তরুনদের উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে ভবানী সংঘ। বিশ্বনাথ ঘোষ, মন্মথনাথ ঘোষ ও আশুতোষ দাসের সহায়তায় বিনা ভাড়ায় একটি ঘর ও অন্যান্য সাহায্য পাওয়া যায়। সংকটের মুহূর্তে তাঁদের উদার সহায়তায় ক্লাবের অস্তিত্ব রক্ষা পায়। শক্তিদেবী ভবানীর নামে ক্লাবের নামকরণ করা হয়।

প্রথমযুগে কেবলমাত্র ফুটবল খেলার মধ্যেই ক্লাবের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল। পরে ভলিবল (পুরুষ ও, মহিলা), যোগব্যায়াম, টেবিল টেনিস খেলা ও শিল্প সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে ক্লাবের বহুমুখী কর্মধারা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা পরিচালনার মধ্য দিয়ে ক্লাবের সংগঠন শক্তি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাবের তৎকালীন সভাপতি মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য ক্রীড়াপ্রেমিক মানুষের সহায়তায় গ্র্যান্ড ট্রাংক রোডের ধারে একখন্ড জমি কেনা হয়। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক অমল দত্ত মহাশয় ক্লাবের বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে

তৎকালীন শ্রম ও ক্রীড়ামন্ত্রী গোপাল দাস নাগ মহাশয় ক্লাবের বাড়ির একতলা অংশ উদ্বোধন করেন। শ্রীমতী আরতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ভবানী সংঘ জাতীয় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার দায়িত্ব পায়। বিগত চল্লিশ বছর ধরে এ অঞ্চলের বিভিন্ন খেলাধূলা পরিচালনা ও জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার সংগঠক হিসেবে ভবানী সংঘ নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

তরুণ সংঘ ব্যায়ামাগার, ভদ্রেশ্বর—এই ব্যায়ামাগারটি **১৯৪৫** খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে বাবুঘাটের সামনে জি, টি, রোডের ধারে এই ব্যায়ামাগারটি প্রথম চালু হয়ে পরে বর্তমান বিদ্যাসাগর সরনীতে স্থানান্তরিত হয়। সঙ্ঘের বহু সদস্য জাতীয় যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ও সাফল্য অর্জন করে।

দেবী সংঘ ব্যায়ামাগার, ভদ্রেশ্বর—ভদ্রেশ্বরের একটি পুরাতন শরীরচর্চা কেন্দ্র দেবী সংঘ ব্যায়ামাগার। পূর্বে গঙ্গার ধারে এই ব্যায়ামাগার অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে শ্যামসুন্দর মন্দিরের লাগোয়া ঘরে ব্যায়ামাগার স্থানান্তরিত হয়। ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের বহু তরুণ এই ব্যায়ামাগারে শরীরচর্চা করেছে।

খেয়ালী খেলাঘর, চণ্ডীতলা মানকুণ্ডু—খেয়ালী খেলাঘরের খো-খো দল (পুরুষ ও মহিলা) জেলা ও রাজ্যস্তরে নানা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে সাফল্য অর্জন করেছে। এই সংস্থার সাতজন ক্রীড়াবিদ জাতীয় বৃত্তি পেয়েছে। এছাড়া চণ্ডীতলার ছেলেমেয়েরা ক্রিকেট, ফুটবল, জিমন্যাস্টিক ও যোগাসন চর্চা করে থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পথ ও পরিবহন ব্যবস্থা

ভাগীরথী ও সরস্বতী—এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল হওয়ার দরুণ আমাদের অঞ্চলের বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক এমনকি ধর্মীয় গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী ছিল। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে পূর্ব ভারতের প্রধান বন্দর গংগে বা গংগা বন্দরের বাণিজ্যিক পণ্য সম্ভার এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে সারা উত্তর ও পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ত। গংগে বন্দরের পতনের পর তাম্রলিপ্ত বন্দর এল। তাম্রলিপ্ত বন্দরের পণ্য আসা যাওয়ার জলপথ ও স্থলপথ এখানে অবস্থিত ছিল। সবশেষে সপ্তগ্রাম বন্দরের পণ্য চলাচল এই অঞ্চলের উপর দিয়েই হত। দ্বিতীয়ত প্রাচীনকালে বর্ধমানভুক্তির আঞ্চলিক প্রশাসনকেন্দ্র ছিল ত্রিবেণীর নিকট বিজয়পুর। বিজয়পুর সপ্তগ্রাম অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। মুসলমান শাসনকালে সপ্তগ্রাম একটি বিরাট সরকারের (বিভাগ) শাসনকেন্দ্র ছিল। তৃতীয়ত আবহমান কাল ধরে উত্তর ভারতের তীর্থযাত্রীরা গঙ্গাসাগর তীর্থে যেতেন এই অঞ্চলের উপর দিয়ে।

মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে গঙ্গাসাগর যে একটি বড় তীর্থ, একথার উল্লেখ আছে। গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস যে পথ ধরে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানীতে এসেছিলেন, সেই রাস্তা যে সরস্বতী নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে এমন ইঙ্গিত আছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিং ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত

বন্দরে অবতরণ করে তীর্থযাত্রার জন্য বুদ্ধগয়া গিয়েছিলেন। পরবর্তী-কালে ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাঙ্ তাম্রলিপ্ত বন্দরের আসা যাওয়ার পথ হিসেবে গঙ্গাতীরবর্তী একটি পথের উল্লেখ করেছেন।

সেযুগের ব্যবসাবাণিজ্য মূলত নদীপথেই হত। গঙ্গে বন্দর, তাম্রলিপ্ত বন্দর ও সপ্তগ্রাম বন্দরের পশ্চাৎ ভূমির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হত মূলত সরস্বতী ও ভাগীরথী নদীপথে। জলপথের সঙ্গে সঙ্গে স্থলপথেও ব্যবসাবাণিজ্য চলত। রাঢ় ও সুহ্ম অঞ্চলে দুটি স্থলপথের সন্ধান পাওয়া গেছে। একটি গঙ্গার তীর ধরে কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ), কজঙ্গল ও চম্পার মধ্য দিয়ে পাটলিপুত্র হয়ে উত্তর ভারতের সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় স্থলপথটি গঙ্গার তীরবর্তী পথ থেকে সপ্তগ্রাম--ত্রিবেণী অঞ্চলের কোন এক স্থান থেকে পশ্চিম--উত্তর পথে বুদ্ধগয়া, বারানসীর মধ্য দিয়ে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। গঙ্গার কূলে কূলে পথটি মূলত তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের জন্য হরিদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহু প্রাচীনকাল হতেই দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের প্রশাসনকেন্দ্র ত্রিবেণী--সপ্তগ্রাম অঞ্চল ছিল। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শাসনকেন্দ্র হতে সমুদ্র তীরবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত রাস্তা ছিল।

আমাদের সৌভাগ্য যে ঐসব জলপথ ও স্থলপথ আমাদের অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বা প্রান্তসীমা স্পর্শ করে গিয়েছে। বর্তমানে আমাদের অঞ্চলের উপর দিয়ে দুটি প্রধান জাতীয় রাজপথ চলে গেছে। এর মধ্যে জাতীয় সড়ক নং ২ বা গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড চাঁপদানী, গোরহাটীর মধ্য দিয়ে আমাদের অঞ্চলে প্রবেশ করে চন্দননগরের উপর দিয়ে উত্তর ভারতে চলে গেছে। দ্বিতীয় পথটির আন্ত প্রাদেশিক রূপটি হারিয়ে গেছে। গঙ্গাসাগর থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত পথটি বর্তমানে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে তার জাতীয় রূপটি হারিয়ে ফেলেছে। রাস্তাটির নাম দ্বারি জাঙ্গাল বা দ্বারিক জাঙ্গাল। বর্তমানে আমরা অবশ্য দ্বারিক জাঙ্গালের সঙ্গে 'রোড' শব্দটি যোগ করি, কিন্তু জাঙ্গাল মানেই বাঁধ বা বাঁধের উপর বিস্তৃত রাস্তা। দ্বারিক জাঙ্গাল আমাদের অঞ্চলে বৈদ্যবাটী--চাঁপদানী

হয়ে প্রবেশ করে তেলিনীপাড়া--কৃষ্ণপটী অঞ্চলে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটি গঙ্গার কুলে কুলে তেলিনীপাড়ার মালাপাড়ার ভিতর দিয়ে চন্দননগর গোন্দলপাড়ায় প্রবেশ করেছে। অপর শাখাটি কৃষ্ণপটী বারাসত (চন্দননগর) এর মধ্য দিয়ে হরিদ্রাডাঙা অঞ্চলে চুঁচুড়ায় প্রবেশ করেছে। প্রথম শাখাটি গঙ্গার তীরবর্তী গোন্দলপাড়া, হাটখোলা, লক্ষ্মীগঞ্জ, গোস্বামীঘাটের পথে চুঁচুড়া, হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, কালনা, কাটোয়ার পথে চলে গেছে। এই পথটিই গঙ্গার তীরবর্তী পথ। এর উপর দিয়েই একদিন ফাহিয়েন, হিউয়েন সাঙ্ যাতায়াত করেছিলেন। পরবর্তীকালে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই পথেই নীলাচল যাত্রা করেছিলেন। দ্বিতীয় শাখা রাস্তাটি চন্দননগরের মধ্য দিয়ে চুঁচুড়া ষ্টেশনের রেললাইনের তলা দিয়ে সরস্বতী নদীর পূর্ব তীর ধরে উত্তর সিমলা, দেবানন্দপুর, কৃষ্ণপুর হয়ে সরস্বতী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল ত্রিবেণী পর্যন্ত গেছে। সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী হতে এই রাস্তা পাণ্ডুয়া, বর্ধমান হয়ে গয়া, বুদ্ধগয়াকে স্পর্শ করে বারানসীর পথে উত্তর ভারতে চলে গেছে।

আমাদের অঞ্চলে পথ ও পরিবহন ব্যবস্থাকে জলপথ, স্থলপথ— এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। স্থলপথ আবার রাজপথ ও রেলপথ— দুই ভাগে বিভক্ত। আমরা সর্বপ্রথমে জলপথের বিবরণ দেব।

জলপথ

প্রধানত গঙ্গানদীপথেই এ অঞ্চলের যাতায়াত ও ব্যবসাবাণিজ্য চলত। কিন্তু পাঁচশত বৎসর পূর্বে সরস্বতী নদী গঙ্গার থেকেও বড় নদী ছিল। তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতনের পর মূলত সরস্বতী নদীপথে সামুদ্রিক ব্যবসাবাণিজ্য চলত। আমাদের উপকণ্ঠে অবস্থিত খলিসানী, ব্যাজড়া, বাঘডাঙা--নপাড়া সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। সরস্বতী নদীপথে ব্যবসাবাণিজ্যের দৌলতে বিঘাটী--আলতাড়া--ধিতাড়া--পালাড়া ইত্যাদি জনপদ এককালে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল। সরস্বতীর পতনের পর ঐ পথে ব্যবসাবাণিজ্য তো বন্ধ হলই, এমনকি অবরুদ্ধ নদীর জল

জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল। মহামারীর ভয়ে দলে দলে ঐ অঞ্চলের মানুষ গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে ও কলকাতা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে বর্গীর আক্রমণ এই অঞ্চলকে আরো শ্রীভ্রষ্ট করে। সরস্বতী নদীপথে যাতায়াত ও ব্যবসাবাণিজ্য আজ স্মৃতিকথায় পরিণত। কিন্তু মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে, বিদেশী বণিক ও পর্যটকদের বিবরণী থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, একদিন আমাদের অঞ্চলের পশ্চিমে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ব্যবসাবাণিজ্যে কত উন্নত ও সমৃদ্ধশালী ছিল।

সরস্বতী নদী ও সপ্তগ্রাম বন্দরের পতনের পর এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য ভাগীরথী নদীপথেই হত। মঙ্গলকাব্যের বণিকরা তাদের সপ্তডিঙা মধুকর সাজিয়ে ভাগীরথী ও আদিগঙ্গার পথে ছত্রভোগ হয়ে সিংহল পাটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গলে চাঁদ সওদাগরের যে যাত্রাপথের বর্ণনা আছে, তাতে আমাদের অঞ্চলের কয়েকটি স্থানের উল্লেখ আছে—

"ডাহিনে হুগলী রহে বামে ভাটপাড়া।
পশ্চিমে রহিল বোরো পূর্বে কাঁকিনাড়া॥
মূলাজোড়, গারুলিয়া বাহিল সত্বর।
পশ্চিমে পাইকপাড়া রহে ভদ্রেশ্বর॥
চাঁপদানী ডাহিনে, বামে ইছাপুর।
বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকিছে প্রচুর॥
বামে বাঁকিবাজার বহিয়া যায় রঙ্গে।
চাঁপদানী বাহি রাজা প্রবেশে দীঘাঙ্গে॥"

গঙ্গা নদীপথে কেবলমাত্র মাল পরিবহনই হত না, যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা চালু ছিল। মধ্যযুগে যারা উত্তর ভারতে তীর্থ করতে যেতেন, তাঁরা নদীপথেই যেতেন। অবশ্য নদীপথে জলদস্যুর ভয় থাকার জন্য এইসব যাত্রীরা দলবদ্ধ হয়ে কোন ধনী ব্যবসায়ী, জমিদার বা রাজপুরুষ-দের নৌকার সঙ্গে তীর্থযাত্রা করতেন। পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জলংগী ও গঙ্গা নদীপথে মুর্শিদাবাদ ও

কলকাতা যাতায়াত করতেন। কলকাতা যাতায়াতকালে তিনি ফরাসডাঙা চন্দননগরে তাঁর বৈষয়িক বন্ধু দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর ফরাসডাঙার বাড়িতে যাত্রাবিরতি করতেন। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে ত্রিবেণী হতে কলকাতার পথে সাধারণ যাত্রীবাহী নৌকাও চলাচল করত। প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থ হতে আমরা জানতে পারি, বৈদ্যবাটী হতে বালি বা কলকাতা যাত্রীবাহী নৌকাই চলাচল করত।

ভদ্রেশ্বরগঞ্জের বড় বড় ব্যবসায়ীরা এবং মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবার তাদের ব্যবসাস্থল ভদ্রেশ্বরগঞ্জ হতে উত্তর কলকাতার বড়বাজার ও হাটখোলা অঞ্চলে নৌকাপথেই যাতায়াত করতেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গা নদীপথে কলকাতা থেকে হুগলী পর্যন্ত বাষ্পচালিত স্টীমারে যাতায়াত শুরু হয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম দৈনিক যাত্রীবাহী স্টীমার কলকাতার সঙ্গে হুগলীর ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়ে দেয়। কলিকাতা হতে চুঁচুড়া পর্যন্ত প্রতি আরোহীর ভাড়া লাগত ৮ টাকা। এই পথে প্রথম যে দুটি স্টীমার চলাচল করত, তাদের নাম "কমেট" ও "ফায়ারফ্লাই"। রেলগাড়ি চালু হবার আগের যুগে এই স্টীমারই ছিল গঙ্গাযোগে কলকাতা যাত্রার প্রধান উপায়। কলকাতার স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী কলকাতার হাটখোলাঘাট থেকে কালনা পর্যন্ত যাত্রী ও মালবাহী স্টীমার চালাতো। হাটখোলা ও কালনার মধ্যে ২২টি ষ্টেশন ছিল। এর মধ্যে আমাদের অঞ্চলে শেওড়াফুলি, ভদ্রেশ্বর ও চন্দননগর ছিল। জলপথে নৌকা ও স্টীমারযোগে যাত্রী পরিবহন ক্রমশ পরিত্যক্ত হল। এর দুটি কারণ—প্রথমটি দীর্ঘ সময়, অপরটি রেলপথ চালু হওয়া।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নির্দেশে গঙ্গা নদীপথে যাত্রী ও মাল পরিবহনের উপযোগিতা সম্বন্ধে সমীক্ষা করার জন্য ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মেজর রেনল এর এবং পরবর্তীকালে কোলব্রুকের ওপর ভার অর্পণ করা হয়। ঐসব সমীক্ষায় জল পরিবহনের অনুকূলে মত প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত নিয়মিত স্টীমার ব্যবস্থা চালু করেন। পরবর্তীকালে

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পর যখন পূর্ব ভারতে রেলপথ চালু হল তখন নদীপথে যাত্রী ও মাল পরিবহন দ্রুত গতিতে হ্রাস পেল। ক্যালকাটা স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কলকাতা—কালনা পথে তাদের স্টীমার চলাচল বন্ধ করে দেয়। জলপথে পরিবহন ব্যবস্থায় শুধু রেলপথই প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়েছিল, তাই নয়, স্থলপথে লরিযোগে মাল পরিবহন ব্যবস্থার জন্যও জলপথে যোগাযোগ পরিত্যক্ত হল।

রেলপথ

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পূর্ব ভারতেই রেলপথ চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁদের সেই উদ্দেশ্যের মূলে যাত্রী ও মাল পরিবহনের অপেক্ষা এদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব বজায় রাখাই মূল লক্ষ্য ছিল। সামরিক প্রয়োজনে যাতে দ্রুত গতিতে ব্রিটিশ ভারতের উপদ্রুত অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যই তারা রেলপথ স্থাপনের সমীক্ষা করেন। কলকাতা থেকে (হাওড়া) উত্তর ভারতের রেলপথের সমীক্ষা করার পথে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় চন্দননগরের ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল ও চুঁচুড়ার ডাচ অধিকৃত অঞ্চল। ঐ দুই অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ তাদের অধিকৃত ভূমির উপর দিয়ে রেলপথ নির্মাণের অনুমতি দেবার ব্যাপারে টালাবাহানা শুরু করে। প্রায় তিন বৎসর এভাবে সময় নষ্ট হবার পর ফরাসী ও ডাচ সীমানার বাইরে দিয়ে রেলপথ নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (E.I.R.) হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা শুরু করে। পক্ষকাল পরে এই রেল ব্যবস্থা পাণ্ডুয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। পরবর্তী বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাসে ঐ রেলপথ রাণীগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। প্রথম যুগে হাওড়া—পাণ্ডুয়া রেলপথে বৈদ্যবাটীর পরবর্তী স্টেশন ছিল চন্দননগর। অর্থাৎ কার্যত আমাদের অঞ্চল রেল পরিষেবা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হয়। ভদ্রেশ্বরগঞ্জের ব্যবসায়ীবৃন্দ ভদ্রেশ্বরে রেলস্টেশন স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হন।

তাঁদের আবেদন নিবেদন এবং আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত ভদ্রেশ্বরে রেলস্টেশন স্থাপিত হয়। অবশ্য তৎকালীন রেলকোম্পানী নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই ভদ্রেশ্বরে রেলস্টেশন স্থাপনে অনুমতি দেয়। সেযুগে ভদ্রেশ্বরগঞ্জ কলকাতা থেকে কালনা পর্যন্ত মাল আমদানি রপ্তানীর বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। মূলত মাল পরিবহনের দিকে লক্ষ্য রেখেই ভদ্রেশ্বর স্টেশন হতে গঙ্গানদীর তীর পর্যন্ত একটি মালগাড়ীর সাইডিং লাইন খোলা হয়। গঙ্গাতীরে এই মালগাড়ি সাইডিং এর পাশেই ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর যাত্রী ও মাল পরিবহনের জেটি। ফলে ভদ্রেশ্বর রেলপথ ও জলপথের সংযোগকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

আরো পরবর্তী সময়ে মানকুণ্ডু রেলওয়ে স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। মানকুণ্ডু স্টেশন প্রতিষ্ঠার মূলে স্থানীয় জনসাধারণের যেমন দাবি ছিল, তেমনি মানকুণ্ডু অঞ্চলের জমিদার ও ব্যবসায়ী খাঁন পরিবারেরও যথেষ্ট অবদান ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের অঞ্চলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হলেও বেসরকারী উদ্যোগে গঠিত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। হুগলী জেলার ব্যবসায়ী, জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমদিকে এর প্রধান কার্যালয় ছিল ৩০৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই রেল কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার ক্রেতা ছিলেন হুগলী জেলার ব্যবসায়ী, জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে শেয়ার হোল্ডারদের সাধারণ সভায় কোম্পানীর যে পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয় তার সদস্যবৃন্দ ছিলেন—

১। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)

২। বাবু নন্দলাল গোস্বামী (জমিদার, শ্রীরামপুর)

৩। বাবু চণ্ডীলাল সিংহ (জমিদার, দেবীপুর)

৪। বাবু জানকীনাথ রায়

৫। বাবু কানাইলাল খাঁ (জমিদার ও ব্যবসায়ী, মানকুণ্ডু)

৬। রায়বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মিত্র (পৌরপতি, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভা)
৭। বাবু রামগতি মুখোপাধ্যায় (ইঞ্জিনিয়ার)

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এই রেলপথ প্রথম যাত্রী ও মাল পরিবহনের জন্য খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই রেলপথ তার কাজকর্ম গুটিয়ে নেয়। প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে এই রেলপথ বন্ধ হয়ে গেলেও প্রথম যুগে হুগলী জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

সম্পূর্ণ ভারতীয় উদ্যোগে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রেলপথ স্থাপনের পশ্চাতে দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী সামরিক ও নিজস্ব ব্যবসাগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সারা ভারতবর্ষে একের পর এক রেলপথ স্থাপন করেছিল। বিদেশী রেলপথগুলিতে স্থানীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ায় বহু অঞ্চলের মানুষ নিজেদের বঞ্চিত বলে মনে করত। অথচ রেলপথ স্থাপন এবং পরিচালন খুব সহজ কাজ নয়। এর প্রযুক্তিগত, পরিচালনগত ও ব্যবসায়িক দক্ষতা ভারতবাসীর অজানা ছিল। এসব অসুবিধা সত্ত্বেও হুগলী জেলার উদ্যোগী মানুষরা বিরাট ঝুঁকি নিয়ে একটি রেলপথ স্থাপন করেছিল। কেন তারা এই বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলো, সে বিষয়ে আমাদের একটু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এঁরা কি নিতান্তই ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এ কাজ করেছিলেন ? আমাদের মনে হয় অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য জাতীয়তাবাদী মনোভাবই বাংলাদেশের জমিদার, ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্তকে স্বদেশী উদ্যোগে পুঁজি বিনিয়োগে অনুপ্রাণিত করেছিল।

হুগলী-চুঁচুড়া শহর থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে কটি পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হত তাদের অন্যতম ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'চুঁচুড়া বার্তাবহ' পত্রিকা। ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক দীননাথ মুখোপাধ্যায় দেশের শিল্প বাণিজ্য উন্নতির জন্য যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য দেশীয় শিল্পপতি ও ভূস্বামীদের স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন।

কয়েকটি পত্রিকার আবেদনে এবং ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরাজী বণিকদের সমকক্ষতা অর্জনের জন্য হুগলী জেলার কয়েকজন জমিদার, ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কৃষি অর্থনীতির স্বার্থে জেলার মধ্যে ছোট রেলপথ গড়ার কথা চিন্তাভাবনা শুরু করে দেন। ১৮৬০ সালে কলকাতার হাটখোলা অঞ্চলে প্রথম দেশীয় ব্যবসায়ী সমিতি স্থাপনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবার এবং ভদ্রেশ্বরগঞ্জের ব্যবসায়ীবৃন্দ। যাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য সমিতি গড়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। হাটখোলার ব্যবসায়ী সমিতি কালক্রমে ১৮৮৭ সালে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সে পরিণত হয়। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন মানকুণ্ডু খাঁন পরিবারের কানাইলাল খাঁন মহাশয়। ব্রিটিশ বণিকদের একচেটিয়া বাণিজ্যিক একাধিপত্যের বিরুদ্ধে দেশীয় ব্যবসায়িরা একতাবদ্ধ হতে বাধ্য হন। ঐ সমিতির নামকরণের মধ্যেই রয়েছে 'ন্যাশনাল' শব্দটি। ঐ সমিতিবদ্ধ বণিকরা, তারা কেবলমাত্র ব্যবসায়ী ছিলেন না, জাতীয়তাবাদীও ছিলেন।

আজকের যুগে আমরা শুনছি যে, ব্রিটিশ আমলে দেশীয় ব্যবসায়ী ও জমিদাররা জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। কথাটির মধ্যে আংশিক সত্য থাকতে পারে, কিন্তু স্বদেশী মনোভাবসম্পন্ন জাতীয়তাবাদী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও জমিদারের অভাব ছিল না। হাটখোলার ব্যবসায়ী সমিতি স্থাপনের মূলে যে মনোভাব কাজ করেছিল, সেই মনোভাবই বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স স্থাপনের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিদেশী রেলপথের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের জন্ম দেয়।

আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের 'স্টেটসম্যানে' প্রকাশিত একটি সংবাদের সারমর্ম উদ্ধৃত করছি—"ভারতীয় ব্যবসায়ীবর্গ বড়বাজার, হাটখোলা, কুমারটুলি, চিৎপুর, উল্টাডিঙ্গি, বেলিয়াঘাটা ও আমড়াতলার ব্যবসায়ীবৃন্দ নতুন ব্যবসায়ী সমিতি সংস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ঐ ব্যবসায়ীবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কানাইলাল খাঁন ও হাজি নূর

মোহাম্মদ জাকারিয়া। সভায় কানাইলাল খাঁন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।"

জাতীয় জীবনে স্বাদেশিকতাবোধ জাগ্রত হলেও ব্যবসায়ী সমাজ কিছুটা দূরে থাকতেন। কিন্তু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হাটখোলার ব্যবসায়ীবৃন্দ "হাটখোলা মহাজন সমাজ" নামে ব্যবসায়ী সংঘ গড়ে তোলেন। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন খাঁন, মণ্ডল ও সিংহ প্রভৃতি বাঙালী ব্যবসায়ীবৃন্দ। ঐ হাটখোলা মহাজন সমাজই পরবর্তীকালে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সে পরিণত হয়।

হুগলী জেলার অন্যতম প্রাচীন পত্রিকা "চুঁচুড়া বার্তাবহ"তে ৭ই আগষ্ট ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ঐ সংবাদে বলা হয়েছে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে চালু হলেও যাত্রী অভাবে বিশেষ লাভ হচ্ছে না। আর্থিক সঙ্কট হতে উদ্ধার পাবার জন্য—"বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেল কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের এক সভায় শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল খাঁন প্রস্তাব করেন, কোম্পানীকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইলে যাত্রীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করিতে হইবে। সভায় উপস্থিত বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের অন্যান্য সদস্যরা তাঁহার প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান।" সত্যসত্যই কানাইবাবুর প্রস্তাব কার্যে পরিণত হবার পর রেলপথ লাভজনক হয়ে ওঠে। কানাইবাবুর দূরদর্শীতা ও ব্যবসায়িক বুদ্ধি বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে।

গত শতাব্দীর শেষদিকে ভাগীরথী নদীর অপর পারে ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের শ্যামনগর স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে আমাদের অঞ্চলের সঙ্গে কলকাতা শহরের যোগাযোগের আরেকটি পথ উন্মুক্ত হয়। নদীতীরবর্তী অঞ্চলের লোকেরা তেলিনীপাড়া--মূলাজোড় ফেরি যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ নেয়। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের অঞ্চলে জলপথে ফেরি চলাচল সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। ভদ্রেশ্বর পুরসভার সীমানার মধ্যে তিনটি ফেরি ব্যবস্থা আছে। এক তেলিনীপাড়া বাজার—শ্যামনগর, দুই তেলিনীপাড়ার কাঙালীবাবার ঘাট—গাড়ুলিয়ার পিনকল ঘাট, তিন ভদ্রেশ্বর মানিকনগরের বাবুঘাট—

গাড়ুলিয়া। এছাড়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গৌরহাটী—ইছাপুর, চাঁপদানী—পলতা (নবাবগঞ্জ) ফেরিঘাটেরও সুযোগ সুবিধা এ অঞ্চলের মানুষ গ্রহণ করে।

গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চল হবার দরুণ এখানে বেশ কয়েকটি স্নানঘাট আছে। তার কোন কোনটি নিছক স্নানের জন্য নির্দিষ্ট। আবার কয়েকটি ঘাট স্নান ও ফেরিব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। এমনকি মানিকনগরের বাবুঘাট একাধারে স্নান, ফেরি ও শ্মশানঘাট। তেলিনীপাড়ার গঙ্গা-স্নানঘাট দুটি। একটি শিবতলা ঘাট এবং অপরটি তেলিনীপাড়া বাজার তথা মালাপাড়ার ঘাট। মালাপাড়ার ঘাটটি সোপানযুক্ত বাঁধানো ঘাট নয়। শিবতলা ঘাটটি বর্তমানে যেখানে অবস্থিত তার একশো গজ পশ্চিমে পুরাতন শিবতলা ঘাটটি অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে ভদ্রেশ্বর জুটমিল কর্তৃপক্ষ তাদের সীমানা সুসংহত করার প্রয়োজনে পুরাতন ঘাটের পূর্বদিকে একটি কংক্রিট নির্মিত চাঁদনিযুক্ত ঘাট ও গঙ্গাযাত্রীর ঘর নির্মাণ করে দেয়। ভদ্রেশ্বর অঞ্চলে বেশ কয়েকটি স্নানের ঘাট আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানিকনগরের বাবুঘাট। বাবুঘাট নামকরণের কারণ তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় জমিদারগণ অর্থাৎ জমিদারবাবুরা ঘাটটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। মানিকনগরের ঘাটকে কেউ কেউ বলেন ভোলা সারের ঘাট। মানিকনগর শ্মশানঘাটে বর্তমানে পুরসভা বৈদ্যুতিক চুল্লীর ব্যবস্থা করেছেন।

ভদ্রেশ্বরের অন্যান্য স্নানঘাটের নাম—চালদাতলা ঘাট, নুনগোলা ঘাট, সদর ঘাট ও শ্যামসুন্দর ঘাট। চালদাতলা ঘাটে বারাসতের শ্রীমানী বংশীয়দের একটি গঙ্গাযাত্রী ঘর ও দুটি বসবাসের ঘর আছে। বর্তমানে এর অবস্থা জরাজীর্ণ। সম্প্রতি ঘাটের পাশে বজরঙ্গবলীর মন্দির নির্মিত হয়েছে। C.M.D.A. কর্তৃপক্ষে এখানে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য শৌচাগার নির্মাণ করেছে। ভদ্রেশ্বরে ছোট বড় আরও অনেক স্নানঘাট আছে। তেলিনীপাড়া শিবতলা ঘাট নির্মাণ করেন জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণ। অন্নপূর্ণা মন্দিরের ১৬৬তম বর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে—"সত্যশান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী তেলিনীপাড়ার

জনসাধারণের গঙ্গাস্নানের সুবিধার্থে বহু অর্থ ব্যয়ে ১৩১১ সালে মনোরম 'শিবতলার ঘাট' প্রতিষ্ঠা করান।"

তেলিনীপাড়ায় একটি বহু পুরাতন ঘাটের উল্লেখ পাওয়া যায় মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবারের একটি উইল (একরারনামা) থেকে। দলিলে দাতার নাম হিসাবে উল্লেখ আছে রামেশ্বর খাঁ, কানাইলাল খাঁ, বলদেব খাঁ। দলিলের সময়কাল বাংলা সন ১২৯১ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস)। উক্ত দলিলের অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল—"তেলিনীপাড়া গ্রামের মধ্যে ৺ভাগিরথির পশ্চিম ধারে পশ্চিম-বাহিনী নামক স্থলে আমাদের পূর্ব বংশোদ্ভব মথুরামোহন খাঁ মহাশয়ের কৃত বাঁধাঘাট ও চাঁদনি ও ৺ঈশ্বরবাসের ঘর যাহা বহু পূর্বে ভাগীরথির ভাঙ্গনে এককালীন লুপ্ত হইয়া পরে ক্রমশ ঐ স্থল হইতে চড়া পড়িয়া ৺ভাগীরথির বেগ অর্থাৎ বহোতাস্থল বহুদূরস্থ হইয়া এক্ষণ ঐ ঘাটের উপরিভাগে কোন কোন জায়গায় ঐ বাঁধাঘাট আদি থাকার চিহ্নমাত্র আছে সুতরাং বহুকাল হইতে ঐ বাঁধাঘাট অভাবে স্নানাদির জন্য সাধারণের যাতায়াত যে হইতেছে তাহা সময়ে সময়ে অত্যন্ত ক্লেশজনক হইয়াছে।"

এই দলিলের বক্তব্য অনুযায়ী তেলিনীপাড়া গ্রামে ভাগীরথী নদীর তীরে পশ্চিমবাহিনী নামে একটি স্থল ছিল। সেখানে মথুরামোহন খাঁন বাঁধাঘাট অর্থাৎ শান বাঁধানো পাকাঘাট, চাঁদনি অর্থাৎ আচ্ছাদনযুক্ত চারিদিক মুক্ত কক্ষ এবং ৺ঈশ্বরবাসের ঘর অর্থাৎ গঙ্গাযাত্রীদের সাময়িক আবাসগৃহযুক্ত একটি স্নানঘাট নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে দলিলের সময় অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ ঘাটের সামান্য ভিত ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মথুরামোহন খাঁন এর জীবনকাল ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর কর্মজীবনের মধ্যস্থলে আনুমানিক ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ঘাটটি নির্মিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের অঞ্চলে গঙ্গা নদীর ভাঙন ও গতি পরিবর্তনের কিছু ইঙ্গিত এই দলিল থেকে পাওয়া যায়। ঐ ঘাট নির্মাণের পরবর্তীকালে গঙ্গার ভাঙন ও প্রচণ্ড স্রোতে তেলিনী-পাড়ার দক্ষিণাঞ্চলের অনেকটা অংশই গঙ্গাগর্ভে চলে যায়। পরবর্তীকালে

দলিল লেখার সময় গঙ্গাস্রোত কমে গিয়ে বিস্তীর্ণ চরাভূমির সৃষ্টি হয়। দলিল হতে আরো একটি তথ্য আমরা জানতে পারি, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দলিল লেখার সময় তেলিনীপাড়ার জনসাধারণের গঙ্গাস্নানের উপযুক্ত বাঁধাঘাট ছিল না। এতে প্রমাণ হয়, শিবতলা ঘাট নিশ্চিতভাবে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে নির্মিত হয়েছে।

আরো একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য ঐ দলিল থেকে জানা যায়। তেলিনীপাড়ার গঙ্গার ধারে—"পশ্চিমবাহিনী নামক স্থল" নামে একটি বিশেষ চিহ্নিত স্থল ছিল। অথচ আজকের যুগে তেলিনীপাড়ায় গঙ্গার তীরে কোন স্থান "পশ্চিমবাহিনী" নামে চিহ্নিত নয়। গঙ্গার ধারা যখন দিক পরিবর্তন করে তখন কোন একটি দিক পরিবর্তনের স্থল পুণ্যভূমি রূপে চিহ্নিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বারানসীর গঙ্গা উত্তরবাহিনী বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত। বর্তমানে তেলিনীপাড়ার ভিক্টোরিয়া জুটমিলের ও তেলিনীপাড়ার মুলাজোড়ের ঘাটের পর থেকেই গঙ্গা পশ্চিমবাহিনী হয়ে ভদ্রেশ্বরের মানিকনগর অঞ্চল থেকে আবার দক্ষিণবাহিনী হয়েছে। আমাদের অনুমান, গঙ্গা যেখানে পশ্চিমবাহিনী হতে শুরু হয়েছে, সেই স্থানটির নামই ছিল "পশ্চিমবাহিনী"। ঐ স্থানটি পুণ্যভূমি মনে করে মথুরামোহন খাঁন মহাশয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঁধাঘাট, চাঁদনি ও ৺ঈশ্বরবাসের ঘর নির্মাণ করেন।

বর্তমানে তেলিনীপাড়া ফাঁড়ির পর বুড়া দেওয়ানতলা হতে একটি রাস্তা (বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য স্ট্রীট) ভিক্টোরিয়া জুটমিলের গা ঘেঁসে গঙ্গাতীর পর্যন্ত গেছে। ঐ স্থানটিকে এখন "কাঙালীবাবার ঘাট" বা "এক পয়সার ঘাট" বলা হয়। পূর্বে ঐ রাস্তাটি সরাসরি গঙ্গার তীরে চলে যেত। মিল যখন হয় তখন ঐ রাস্তার অংশবিশেষ মিলের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য পুরাতন ঘাটের প্রায় দুশো গজ পশ্চিমে রাস্তাটি সরে যায়। পশ্চিমবাহিনী স্থলটি যে পবিত্র স্থান ছিল তার আর একটি প্রমাণ পরবর্তীকালে তেলিনীপাড়ার জমিদারবংশীয়গণ যখন অক্ষয়তৃতীয়ার রথ প্রচলন করেন, তখন রথের শেষ গন্তব্যস্থল ছিল ঐ পশ্চিমবাহিনী ঘাট পর্যন্ত। মিল স্থাপিত হবার পর ঐ রথ বর্তমানে

অনেকটা ভেতরে রাস্তার ওপরে দাঁড়ায়। ঐ পুরাতন ঘাটের স্থলটিকে এক সময় "গড়ের ঘাট" বলে অভিহিত করা হত।

তেলিনীপাড়ার দ্বিতীয় ফেরিঘাটকে বলা হয় কাঙালীবাবার ঘাট বা এক পয়সার ঘাট। এটি বহু পুরাতন ফেরিঘাট। ঘাটের বাৎসরিক ইজারা ডাক হয় না, এটি স্থায়ী মালিকানাধীন ঘাট। পূর্বে মাত্র এক পয়সার বিনিময়ে পারাপারের ব্যবস্থা ছিল বলে একে এক পয়সার ঘাট বলা হয়। কিংবদন্তী আছে যে জনৈক বিপন্ন নবাবকে পার করে দেওয়ার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঘাটটি সরকারী শুল্কবিহীন হয়। সেই মর্মে নবাবী পাঞ্জাও নাকি আছে। পাটনী পদবীযুক্ত ঘাটের মালিকরা বাস করেন গোন্দলপাড়ার রাধানাথ শিকদার লেনে। মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা সত্ত্বেও তাঁরা এ সংক্রান্ত কোন তথ্য সরবরাহে অক্ষম জানান।

আমাদের অঞ্চলের প্রধান রাজপথ গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। যাকে বর্তমানে জাতীয় রাজপথ নং ২ নামে অভিহিত করা হয়। যাত্রী ও পণ্যপরিবহন মূলত এই পথেই হয়ে থাকে। কলিকাতা মহানগরী ও বন্দরের সঙ্গে সমগ্র উত্তর ভারত ও উত্তর পূর্ব ভারতের পণ্য পরিবহন এই পথে হয়। স্থানীয় ও বহির্বঙ্গের যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের এই পথ আমাদের শহরের মধ্য দিয়ে যাবার জন্য আমাদের অঞ্চলের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার ওপর প্রভাব পড়েছে। প্রাচীনকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব যুগ হতেই বিভিন্ন বন্দর হতে পণ্যসামগ্রী গরুর গাড়িতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। বণিক বা সার্থপতিগণ শত শত মালটানা গরুর গাড়িতে পণ্য পরিবহন করতেন। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হতে লরি বা ট্রাকযোগে পণ্য পরিবহন শুরু হয়। স্থলপথে ট্রাকযোগে পণ্য পরিবহন শুরু হবার ফলে জলপথে আন্তঃ প্রাদেশিক পণ্য চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য গঙ্গানদীগর্ভের গভীরতা কমে যাওয়ার ফলে জলপথে স্টীমার বা বড় বড় নৌকা চলাচলে অসুবিধা দ্বিতীয় কারণ।

যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রেও ক্রমশ জলপথ পরিত্যক্ত হয় এবং

যাত্রীবাহী বাস মূলত যাত্রী পরিবহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আমাদের অঞ্চলে যেসব যাত্রীবাহী বাস, মিনিবাস, ট্রেকার চলে তাতে পরিবহন সমস্যার সমাধান হয়নি। যাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ২ নং বাস সার্ভিস বর্তমানে ব্যাণ্ডেল হতে রিষড়ার বাগখাল পর্যন্ত চলাচল করে। এছাড়া ৭ নং বাস সার্ভিস বালিখাল হতে বর্ধমান যাতায়াত করে। চুঁচুড়া হতে শ্রীরামপুর তথা মাহেশ পর্যন্ত মিনিবাস সার্ভিস চালু আছে। সম্প্রতি ট্রেকার সার্ভিস চালু হবার পরে সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে আমাদের অঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখ ও আক্ষেপের কথা, অন্যান্য শহরে যে হারে অটো রিক্সা চালু হয়েছে, ঠিক সেই ধরণের অটো রিক্সা চলাচল ব্যবস্থা এখানে গড়ে ওঠেনি। স্থানীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাইকেল রিক্সাই প্রধান বাহন হয়ে আছে।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড

বর্তমানে যেরূপে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তথা জাতীয় রাজপথ নং ২ কলকাতা থেকে উত্তর ভারত পর্যন্ত প্রসারিত, অতীতে কিন্তু এই পথ ঠিক এইরূপ ছিল না। আমরা ইতিহাসে পড়েছি, শেরশাহ কলকাতা থেকে উত্তর ভারতে গমনাগমনের জন্য গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, অবশ্য তখন নাম ছিল বাদশাহী সড়ক, নির্মাণ করেন। তথ্যটি আংশিক সত্য। কিন্তু শেরশাহ নতুন সড়ক নির্মাণ করেন নি। বহু পূর্ব হতেই সাগর তীরবর্তী নদীবন্দরগুলির সঙ্গে উত্তর ভারত যাতায়াতের যে প্রধান পথ ছিল, মূলত সেই পথকেই সংস্কার করে, প্রশস্ত করে, ক্ষেত্রবিশেষে সংযোজন ও পুনর্নির্মাণ করে শেরশাহ বাদশাহী সড়কের উন্নতি করেন। তাছাড়া শেরশাহের আমলে কলকাতা নগর বা বন্দরের অস্তিত্ব ছিল না। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, গঙ্গে বন্দর, তাম্রলিপ্ত বন্দর ও গঙ্গাসাগর তীর্থস্থল হতে উত্তর ভারতে গমনাগমনের একটি আন্তঃ প্রাদেশিক রাজপথ ছিল। পুরাতন বন্দরের পতন ও নতুন বন্দরের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পথ বারবার তার অবস্থান পরিবর্তন করেছে।

ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে মূলত সৈন্য চলাচলের জন্য একটি রাস্তা ভাগীরথীর পূর্ব তীর দিয়ে বর্তমান ব্যারাকপুর ট্রাংক রোড বরাবর ব্যারাকপুর পর্যন্ত এসে আরেকটু উত্তরে পলতা শহরের ভিতর দিয়ে পলতা ঘাটে নদী পেরিয়ে চাঁপদানীতে প্রবেশ করে ঐ পুরাতন বাদশাহী সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। পলতা ও চাঁপদানীর মধ্যে অবশ্য কোন সেতু ছিল না। ঐ অংশটুকু নৌকাযোগেই পারাপার করতে হত। চাঁপদানী অঞ্চলে এই পথের ধারে ইংরেজ সৈন্যদের একটি সামরিক ছাউনি ছিল। ঐ সামরিক ছাউনিতে বেশ কিছু সৈনিকের দল সবসময় কলকাতার প্রবেশ পথ পাহারা দিত।

১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাচেরা তৎকালীন নবাব মীরজাফরের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে বাংলাদেশ থেকে ইংরেজদের উচ্ছেদ করার জন্য ৭০০ ইউরোপীয় সৈন্য ৮০০ মালয়ে তথা যবদ্বীপীয় সৈন্য নিয়ে গঙ্গাবক্ষে যুদ্ধজাহাজে করে হুগলীর দিকে অগ্রসর হন। ঐ ডাচেদের বাধা দেবার জন্য ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল ফোর্ড বরানগরের ডাচ উপনিবেশ দখল করে পলতায় গঙ্গা পার হয়ে চাঁপদানীর সৈনিক শিবিরে নিশিযাপন করেন। "হুগলী মেডিকেল গেজেট" হতে জানা যায়—১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ কলকাতাস্থ কাউন্সিল স্থির করে বেঙ্গল আর্মির অর্ধেক সৈন্য পাটনায় থাকবে এবং বাকি অর্ধেক চাঁপদানীর সৈন্যনিবাসে থাকবে। সৈন্য চলাচলের এই বিবরণ থেকে বুঝতে পারি কলকাতা থেকে চাঁপদানী পলতাঘাট পর্যন্ত জি, টি, রোডের যে অংশ আছে, তা তখন ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে পুরাতন "হুগলী গেজেটিয়ার"-এর সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করা হল—"L.S.S. O' Malley wrote in the old Hooghly Gazetteer (P.P. 196-97) that the new Grand Trunk Road (shown in Rennell's Atlas) from Uttarpara to Palta Ghat, 12 miles 5½ furlongs long..........and the Old Grand Trunk Road from Palta Ghat via Hooghly and Pandua to Burdwan, with a length of 33 miles."

উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যায় উত্তরপাড়া থেকে পলতাঘাট পর্যন্ত গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড পরবর্তীকালে নির্মিত হয় এবং পলতাঘাট হতে বর্ধমানগামী গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডই পুরাতন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। 'উত্তর ২৪ পরগণার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে কমল চৌধুরী পলতা প্রসঙ্গে লিখেছেন—"কলকাতার ১৪ মাইল দূরে পলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড যেখানে হুগলীতে প্রবেশ করেছে, সেখানে পলতার অবস্থান।"—এই মন্তব্যের মধ্যে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন পলতাঘাট হতে উত্তরপাড়া, বালি, সালকিয়া, হাওড়ার শিবপুর পর্যন্ত বর্তমান গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের যে অংশ তা নূতন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। ইংরেজ আমলে কলকাতা মহানগরীর সঙ্গে সুষ্ঠ যোগাযোগের জন্য এই অংশটুকু নির্মিত হয়। আমাদের সন্নিহিত অঞ্চল গৌরহাটী-চাঁপদানী হতেই পুরাতন বাদশাহী সড়কের সূচনা হয়েছিল। নবনির্মিত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড মূলত বহু প্রাচীন দ্বারিক জাঙ্গাল পথকেই আংশিক আত্মসাৎ করে গড়ে উঠেছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নতুন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

দ্বারিক জাঙ্গাল

মানুষের সীমাহীন অজ্ঞতার ফলে অতি পুরাতন এক রাজপথ আজ নামহারা পথে পরিণত। শীঘ্রই সে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে অবলুপ্ত হবে। নামধাম পরিচয়হীন হয়ে অপমৃত্যুর সম্মুখীন পথের নাম—দ্বারিক জাঙ্গাল। বর্তমানে ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে হাওড়ার শালিখা, বালি ও হুগলীর উত্তরপাড়া, কোন্নগর, চাতরা, বৈদ্যবাটী হয়ে ভদ্রেশ্বরের অন্তর্গত কৃষ্ণপটী অঞ্চলে এই পথ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে।

'জাঙ্গাল' শব্দটির অর্থ বন্যা নিরোধক বাঁধ বা পথ বা সেতু। জাঙ্গাল শব্দটির প্রাচীনতম ব্যবহার দেখা যায় বঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাজ হরিবর্মদেবের মহামন্ত্রী "বাল্বলভী ভুজঙ্গ" ভট্ট ভবদেবের পথনির্মাণ ও অন্যান্য পূর্ত কীর্তি সম্পর্কে তাঁর সুহৃদ কবি বাচস্পতি মিশ্র

বলেছেন—"রাঢ় দেশে জলহীন জাঙ্গল পথযুক্ত গ্রামোপকণ্ঠ সীমায় শ্রমার্ত পান্থসমূহের প্রীতিদায়ক জলাশয় যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন।" অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীতে ভবদেবের পূর্বেই রাঢ় দেশে জাঙ্গল পথ ছিল। তবে তা জলহীন ছিল।

বর্তমানে দ্বারিক জাঙ্গাল হাওড়ার সালকিয়া হতে কৃষ্ণপটী পর্যন্ত (চন্দননগরের সীমা) উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত। প্রাচীনকালে এই পথ প্রথমে গঙ্গে বন্দর পরে তাম্রলিপ্ত বন্দর হতে ভাগীরথী নদীর সমান্তরালভাবে উত্তর ভারত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এছাড়া গঙ্গাসাগর হতে একটি তীর্থ পথ ঐ রাস্তায় মিলিত হয়ে উত্তর ভারত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই পথের কথাই চৈনিক পরিব্রাজক ও তীর্থযাত্রী ফাহিয়েন (৪১১--১২ খ্রীষ্টাব্দ) হিউয়েন সাঙ (৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) এবং ঈ চিং (৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁদের ভ্রমণকাহিনীতে উল্লেখ করেছেন। ভাগীরথী নদীর বিভিন্ন সময়ে খাত পরিবর্তনের ফলে বন্দরের স্থান পরিবর্তন ঘটে। সে কারণে হাওড়া অঞ্চলে থেকে কখনো পথটি দক্ষিণ পূর্বে গঙ্গে বন্দর, আবার কখনো দক্ষিণপশ্চিমে তাম্রলিপ্ত বন্দরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আদি গঙ্গার পশ্চিম তীর ধরে গঙ্গাসাগর যাবার প্রাচীন একটি পথ ছিল। দ্বারিক জাঙ্গাল পথটি হাওড়ার দক্ষিণ পূর্বে সরাসরি দক্ষিণে এবং দক্ষিণ পশ্চিমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুখে চলেছে। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার শিলাই নদীর তীরবর্তী অংশে এখনো একটি রাস্তার ধ্বংসাবশেষকে দ্বারিক জাঙ্গাল বলা হয়। মনে হয়, ঐ পথটি তাম্রলিপ্ত বন্দর হতে গঙ্গার তীর ধরে উত্তর ভারতে প্রসারিত ছিল।

'যশোর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় আর এক দ্বারিক জাঙ্গালের কথা উল্লেখ করেছেন। "কলিকাতার নিকটবর্তী সরশুনা গ্রাম হইতে আদি গঙ্গার তীর হইতে একটি প্রশস্ত রাজপথের নিদর্শন পাওয়া যায়, ইহাকে লোকে দ্বারিক জাঙ্গাল বলে। গঙ্গা পার হইয়াও এই রাস্তা পূর্বদিকে বহুদূর গিয়াছে।" দক্ষিণ ২৪ পরগণার রাজপুর, বারুইপুর হয়ে ছত্রভোগ পর্যন্ত একটি প্রাচীন

পথের নাম দ্বারিক জাঙ্গাল।

এসব তথ্য হতে স্পষ্টই বোঝা যায় দ্বারিক জাঙ্গাল, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা—এই চারটি জেলার ভিতর দিয়ে প্রসারিত ছিল। অবশ্য এই রাজপথ একই সময়ে বিভিন্নমুখী হয়নি। বিগত ২০০০ বছরে ভাগীরথী নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও সমুদ্রগামী বাণিজ্যপথের পরিবর্তনের ফলেই এটা ঘটেছে। কিন্তু হাওড়া শহরের উত্তর হতে এই পথটি মোটামুটি প্রাচীনরূপ বজায় রেখেছে।

পথটির নামকরণ সম্পর্কে নানা মত আছে। প্রথমত কেউ পথটিকে বলেন দ্বারিক জাঙ্গাল বা দ্বারি জাঙ্গাল। পথটির এই নামকরণের পিছনে নানা মুনির নানা মত। যশোর খুলনার ইতিহাস প্রনেতা সতীশচন্দ্র মিত্র বলেছেন—দ্বারি নামের রাজবংশীয়া কোন মহিলার অর্থে এটি নির্মিত। 'শালিখার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলা হয়েছে দ্বারিক নামে জনৈক কারিগরের একক উদ্যোগে ঐ বাঁধ তথা পথটি নির্মিত হয়েছে। "বঙ্গাধিপ পরাজয়" উপন্যাসে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ বলেছেন—"বর্ধমানাধিপতির এক রাজধানী এই স্থানে ছিল। দ্বারি নাম্নী রাজবংশীয় কোন মহিলার অর্থেই ইহা নির্মিত তাই দ্বারি জাঙ্গাল।" আবার কেউ কেউ মনে করেন চর্যাগীতির বৌদ্ধ আচার্য দারিক—পা'র নামে এই পথ। এই মত পোষণ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি 'বেনের মেয়ে' নামক তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসে লিখেছেন—"লুই পা (বৌদ্ধ আচার্য) দারিক নামে তাঁহার প্রধান ও প্রবীন চেলার হাতে মহাবিহারের ভার দিয়া ধর্মপ্রচারে বাহির হইলেন। আপনার গ্রামগুলি বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য দারিক যে জাঙ্গাল বাঁধিয়াছিলেন, তাহা কোন্নগরের নিকট আজিও দারিকের জাঙ্গাল বলিয়া বিখ্যাত আছে।" হুগলী জেলার দ্বারহাট্টা ও দ্বারবাসিনী গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দ্বারিকাচণ্ডীর নামে এই নামকরণ। মালদহ জেলার গৌড় নগরে দ্বারবাসিনীচণ্ডীর মন্দির ছিল। কতদিন পূর্বে এবং কার নামে এই পথ, তা আজও সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি।

একসময় গঙ্গার প্রধান প্রবাহ আদিগঙ্গার পথে বইত। বর্তমানে যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, ঐ স্থানে গোবিন্দপুর গ্রামে ছিল। ঐ গোবিন্দপুর হতেই বর্তমান আদিগঙ্গা প্রথমে দক্ষিণপূর্ব মুখে, পরে দক্ষিণ মুখে ছত্রভোগের পাশ দিয়ে গঙ্গাসাগরের পথে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ত। হাওড়ার দক্ষিণে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন হতে দক্ষিণে বর্তমানে যে গঙ্গার প্রবাহ পথ তাকে কাটিগঙ্গা বলা হয়। কারণ সরস্বতী নদী এবং গঙ্গানদীর সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর জন্য একটি খাল কাটা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ঐ খালপথেই গঙ্গার প্রধান ধারা বইতে থাকে, আদিগঙ্গার পথ পরিত্যাগ করে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর ঠিক কোন পথে ছত্রভোগ পৌঁছেছিলেন, সে বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে। চৈতন্যদেবের নীলাচল গমনের পথ সম্বন্ধে নানা আঞ্চলিক দাবিদাওয়া আছে। বঙ্গদেশ বা গৌড়দেশ থেকে তিনি দুবার নীলাচল গমন করেন। প্রথমবার সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পরে আর দ্বিতীয়বার নীলাচল হতে বঙ্গদেশ তথা গৌড় নগরী হয়ে বৃন্দাবন যাবার সংকল্প নিয়ে গৌড় নগরী পর্যন্ত এসেছিলেন। কিন্তু গৌড় নগর হতে বৃন্দাবন না গিয়ে নবদ্বীপ— শান্তিপুর ও কুমারহট্টের পথে নীলাচলে ফিরে যান। এই দ্বিতীয়বার নীলাচল গমনের পথ সম্বন্ধে কিছু সংশয় আছে।

চৈতন্যদেবের ভক্ত কবি কর্ণপুর তাঁর সংস্কৃত ভাষায় 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে বলেছেন যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে নীলাচল যাত্রা করেন। তিনি ভাগীরথীর কুল ধরে অগ্রসর হন। এছাড়া চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবনদাস রচিত 'চৈতন্যভাগবত' এ বর্ণিত আছে—

"নিরবধি জগন্নাথ প্রতি আর্ত করি।
আইসেন সর্বপথ আপনা পাশরি ॥
কারে বলি রাত্রিদিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল কিবা স্থল পার বা ওপার ॥
কিছুই জানে না প্রভু ডুবি ভক্তি রসে।

প্রিয় বর্গ রাখে দেহ রহি চারপাশে ॥
এইমত প্রভু জাহ্নবীর কুলে কুলে।
আইসেন ছত্রভোগ মহাকুতূহলে ॥"

চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা অনুযায়ী মহাপ্রভু শান্তিপুর হতে স্থলপথে জাহ্নবীর কূলে কূলে ছত্রভোগ পৌঁছান। অর্থাৎ জাহ্নবীর কূলে কূলে যে পথ আছে, সেই পথ ধরেই তিনি ছত্রভোগ গিয়েছিলেন। তিনি জলপথে ছত্রভোগ যাননি। কেবল প্রয়োজনে একবার নদী পারাপার করেছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ভ্রমন পর্যাটি এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

"গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চারিজন সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ পথে ।।"

চৈতন্যদেবের গৌড় হতে নীলাচলের প্রত্যাবর্তন পথ সম্বন্ধে শ্রীভূপতিরঞ্জন দাস তাঁর "তীর্থপথিক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—"কুমারহট্ট থেকে কিছুটা এগিয়ে মহাপ্রভু গৌরিভার (বর্তমানের গরিফা) খেয়াঘাটে এসে ভাগীরথী পার হয়ে পশ্চিম তীর ধরে এগোলেন। নদী পার হবার সময় তিনি কঠোর ভাষায় তাঁর অনুগামী ভক্তদের ফিরে যেতে বললেন। অনেকেই ফিরে গেল কিন্তু দু-চারজন ভক্ত গঙ্গার পশ্চিম পারেও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললেন। .... মহাপ্রভু এসে পেঁছিলেন শেওড়াফুলির উত্তরদিকে গঙ্গার ঘাটের সন্নিকটবর্তী নিকিঞ্চন ভক্ত ধ্রুবানন্দের আশ্রমে। বর্তমানে যেখানে হুগলী জেলার নিমাইতীর্থের ঘাট, তার পাশেই ছিল এই ভক্তের কুটি'র। .... মহাপ্রভু নিমাইতীর্থের ঘাটে স্নান করে এসে ধ্রুবানন্দের কুটিরে আতিথ্য গ্রহণ করলেন, সঙ্গে রয়েছেন তাঁর বারজন পরম ভক্ত বা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম খলিজুলির কমলাকার পিপলাই।" পরবর্তীকালে মহাপ্রভু গঙ্গার তীরে তীরের পথ ধরে ছত্রভোগ হয়ে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। ভূপতিবাবু চৈতন্যদেবের যাত্রাপথ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ হতে।

গৌরিভার (গরিফার) পরপারে হুগলী শহরের মধ্য দিয়ে চুঁচুড়া,

বোরো, হাটখোলা, গোন্দলপাড়া (চন্দননগর), তেলিনীপাড়া ও ভদ্রেশ্বরের গঙ্গাতীরবর্তী পথ ধরে চৈতন্যদেব বৈদ্যবাটীতে নিমাইতীর্থের ঘাটে তথা ধ্রুবানন্দের আশ্রম পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আজ থেকে পাঁচশত বৎসর পূর্বে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব পূত পদস্পর্শে তেলিনীপাড়া, কৃষ্ণপটী, মানিকনগর এবং ভদ্রেশ্বরের ভূমিকে পবিত্র করে গেছেন। চৈতন্যদেব ঠিক কোন পথে আমাদের অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গমন করেছিলেন, তা নির্ণয় করা আমাদের কর্তব্য।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, দ্বারিক জাঙ্গাল পথটি দক্ষিণ দিক হতে ভদ্রেশ্বরের সীমানায় প্রবেশ করে মানিকনগরের ঠিক অব্যবহিত পরে কৃষ্ণপটীতে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। একটি পথ সোজা উত্তরে চন্দননগরের মধ্য দিয়ে চুঁচুড়া স্টেশনের তলা দিয়ে সরস্বতী নদীর পূর্ব তীর ধরে অগ্রসর হয়েছে। আজও সরস্বতী নদীর পূর্ব তীরে উত্তর সিমলা, বেনাভারুই, নলডাঙ্গা, কাজীডাঙ্গা, দেবানন্দপুর ও কৃষ্ণপুর হয়ে ত্রিবেণীতে এসে গঙ্গাতীরবর্তী একটি পথের সঙ্গে মিশেছে। সরস্বতী নদীর তীরে এই পথের উপর জটিলেশ্বর শিবের মন্দির। এই শিব বহু পুরাতন ও জাগ্রত দেবতা। অপর পথটি মানিকনগর-কৃষ্ণপটীর সংযোগস্থল হতে ডানদিকে গঙ্গার কূলে কূলে উত্তরাভিমুখে গিয়ে ত্রিবেণীতে ঐ পূর্বোক্ত পথের সঙ্গে মিশেছে। আজও গঙ্গার তীরে তীরে ঐ পথটি বর্তমান আছে। কেবল কোন কোন জায়গায় গঙ্গার জল সরে যাওয়ার ফলে পথটি হতে গঙ্গার দূরত্ব বেড়েছে, আবার কোন কোন জায়গায় বিদেশী কলকারখানায় মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতায় গঙ্গার তীর থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমানে আমাদের পুরসভার অন্তর্গত দ্বারিক জাঙ্গাল রাস্তাটির নাম লয়েছে—ডাঃ চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় রোড (ডাঃ সি, সি, সি, রোড)। আর চৈতন্য পথটি চন্দ্রমোহন ষ্ট্রীট, ফেরিঘাট ষ্ট্রীট, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ষ্ট্রীট, রাজা প্যারীমোহন ষ্ট্রীট ইত্যাদি নানা নামে চিহ্নিত হয়ে পুরাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত গঙ্গাতীরবর্তী চৈতন্য চরণ ধন্য পথটি মাহাত্ম্য ও অস্তিত্ব হারিয়েছে।

বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহের বর্ণনা অনুযারী চৈতন্যদেব কালীঘাট, বোড়াল,

গোবিন্দপুর, বারুইপুর ইত্যাদি পথে ছত্রভোগ পৌঁছেছিলেন। এই পথটি গঙ্গাসাগর তীর্থ হতে উত্তর ভারতে যাবার পথ। পূর্বে এই পথটির নাম ছিল দ্বারিক জাঙ্গাল বা দ্বারি জাঙ্গাল। পরে কেউ কেউ 'ছত্রভোগ পথ' বলতেন। চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা অনুযায়ী—"নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ পথে।" অর্থাৎ চৈতন্যদেবের সময়ে দ্বারিক জাঙ্গালের ঐ শাখাটির নাম 'ছত্রভোগ পথ' ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের কাগজপত্রে দেখা যায় যে তীর্থযাত্রীরা ঐ পথে যাতায়াত করতেন বলে সাহেবরা নাম দিয়েছিলেন—"Pilgrim's track" পরবর্তীকালে ঐ পথ অব্যবহার্য হয়ে পড়লে ইংরেজ সরকার কুলপি রোড বলে একটি নতুন পথ নির্মাণ করেন। কিন্তু ঐ কুলপি রোড সম্পূর্ণ নতুন পথ নয়। এর কোন কোন অংশ ঐ পুরাতন দ্বারিক জাঙ্গাল পথকেই অনুসরণ করেছে। 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে—"গড়িয়া থেকে ৮০নং বাস (এখন নেতাজী সুভাষ বসু রোড, এর প্রাচীন নাম চৈতন্য পথ) ধরে জয়নগর মথুরাপুরের দিকে চলে গেছে।" উপরোক্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় গঙ্গার তীরবর্তী এই পথকে কোন এক সময় "চৈতন্য পথ" বলে অভিহিত করা হত।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব গঙ্গার কূলে কূলের পথ ধরে ছত্রভোগের দিকে গিয়েছিলেন। এটি প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু তিনি যে আমাদের অঞ্চলের মধ্য দিয়ে দ্বারিক জাঙ্গাল পথ ধরেই গিয়েছিলেন, এর নিশ্চয়তা কোথায়? তিনি তো অন্য পথ ধরেও যেতে পারেন। তিনি যে দ্বারিক জাঙ্গাল ব্যতীত অন্য পথ দিয়ে যান নি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ১৫০৯ থেকে ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চৈতন্যদেবের প্রথম ও দ্বিতীয়বার নীলাচল গমন ঘটেছিল। ঐ সময় গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বা শের শাহ নির্মিত বাদশাহী সড়কের সৃষ্টি হয়নি। চৈতন্যদেবের নীলাচল গমনের অনেক পরে শের শাহের সময়কাল। অতএব গৌরীভার থেকে গঙ্গা পেরিয়ে হুগলীর ঘাট থেকে বৈদ্যবাটীর নিমাইতীর্থের ঘাট পর্যন্ত আসতে গেলে একমাত্র গঙ্গার কুলে কুলে

দ্বারিক জাঙগাল পথই ছিল।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে গঙ্গার পশ্চিম কুলের পথ ধরে ছত্রভোগ যান সে সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য নিম্নে দেওয়া হল।

"উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার—১২৫তম স্মরনিকা"য় কোতরঙ্গ গ্রাম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"কথিত আছে, চৈতন্যদেব উড়িষ্যা যাওয়ার পথে কোতরং এ রামচন্দ্র খাঁনের বাড়ীতে পদধূলি দেন। ....কোতরং এ দেবাই পুকুর অঞ্চলে চৈতন্যদেবের অন্যতম পরিকর শ্রীরামচন্দ্র খাঁনের বাড়ী ছিল। ......ভদ্রকালীর দ্বারিক জাঙগাল রোডে একটি সুউচ্চ মনসা মন্দির আছে।"—

উপরোক্ত তথ্য হতে বোঝা যায় দ্বিতীয়বার পুরী প্রত্যাবর্তনের পথে ভক্তবৎসল চৈতন্যদেব বৈদ্যবাটীর নিমাই তীর্থের ঘাটের ধ্রুবানন্দের আশ্রম হতে ভক্ত কমলাকর পিপলাই এর মাহেশ হয়ে কোতরং রামচন্দ্র খাঁনের বাড়ীতে আসেন। পরে ভদ্রকালী শালিখা হয়ে আদিগঙ্গার তীর ধরে ছত্রভোগে আসেন।

ভবিষ্যৎ আলোচনার উপকরণ হিসাবে আমরা দ্বারিক জাঙ্গাল সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য পেশ করছি।

দ্বারি জাঙ্গাল পথটির বহুমুখীন রূপ ধরা আছে—অশোক মিত্র সম্পাদিত—"পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা" গ্রন্থে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে ২৪ পরগণার সন্দেশখালি অঞ্চলে একটি মৌজার নাম দ্বারিজাঙ্গাল।

"শালিখার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—বর্গির হাত থেকে শালিখাকে (হাওড়া) রক্ষা করার জন্য যে বাঁধ তৈয়ারী হয় তা দ্বারি নামক জনৈক কারিগরের একক প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়।

"ঘাটালের কথা" গ্রন্থে পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ ও প্রণব রায় বলেছেন—ঘাটাল শহর হতে ৬ মাইল দক্ষিণে পান্নাগ্রামে একটি সমৃদ্ধশালী নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। পান্নাগ্রামের পাশে দ্বারিক জাঙ্গাল রাস্তার কিছু কিছু অংশ এখনও দেখা যায়। রাস্তাটি শিলাই নদী অতিক্রম করে উত্তরমুখে বর্দ্ধমান অভিমুখে চলে গেছে। রাস্তাটির

বর্তমান নাম—নন্দ কাপাসিয়া রোড। জনশ্রুতি আছে যে নন্দ কাপাসিয়া নামে জনৈক বস্ত্র ব্যবসায়ী প্রাচীন দ্বারিক জাঙ্গাল পথটির সংস্কার করেন। পরবর্তীকালে তাঁর নামে রাস্তাটি নামাঙ্কিত হয়েছে।

আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন পথের কি শোচনীয় পরিনতি। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীদেহের মত খণ্ডবিখণ্ড হয়ে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হয়েছে। হারিয়েছে তার সামগ্রিক সত্তা। জাতীয় রাজপথের সম্মান ধূলায় লুণ্ঠিত। মৃতপ্রায় পথ আজও আশা করে আছে—একদিন তার জাতীয় রাজপথের সম্মান সে ফিরে পাবে। স্বমহিমায় পুনপ্রতিষ্ঠিত হবে।

ভদ্রেশ্বর পুরসভার অন্তর্গত প্রাচীন পথ

মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবারের প্রাচীন দলিলপত্র হতে একটি পথের সন্ধান পাওয়া যায়। পথটি বর্তমান আছে তবে ঐ পথটির প্রাচীন নাম ও পথটি কে বা কারা প্রথম তৈরি করেছিলেন, তা আমাদের অজানা ছিল। **১৮৮৫** খ্রীষ্টাব্দে রামেশ্বর খাঁ, কানাইলাল খাঁ এবং বলদেব খাঁর একটি একরারনামায় (দলিল) উল্লেখ আছে—"ফরাসী অধিকারস্থ তেমাথা নামক স্থান হইতে নিজ গ্রাম মানকুণ্ডার মধ্য হইয়া বলরামপুরের দাঁড় নামক গ্রাম পর্য্যন্ত পূর্বপুরুষের ব্যয়ে যে প্রশস্থ রাস্তা প্রস্তুত খাঁ রোড নামে বিখ্যাত থাকিয়া আমাদের চারি সরিকের ব্যয়ে তাহা সময়ে সময়ে মেরামত হইয়া আসিতেছে ......"

উপরোক্ত দলিল হতে আমরা জানতে পারছি বর্তমানে তেমাথা (চন্দননগর) হতে যে মানকুণ্ডু ষ্টেশন রোড আছে, যার ভদ্রেশ্বর পুরসভার অংশের নাম যোগীন্দ্রলাল খাঁন রোড, তা আসলে সরস্বতী নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি পথের অংশ। ঐ রাস্তাটি মানকুণ্ডু স্টেশনের তলা দিয়ে আলতাড়া প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়ে বলরামপুরের দাঁড় নামক গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাচীনকালে পথটি ভাগীরথী ও সরস্বতী নদীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করত। এই পথটির পূর্বদিকের অংশের বর্তমান নাম মোরান রোড। গোন্দলপাড়ার গঙ্গাতীরবর্তী ঘাট

হতে সরস্বতী নদীর তীর পর্যন্ত রাস্তা বিস্তৃত ছিল।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে খাঁন পরিবার ঐ রাস্তাটি কি উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছিলেন। এটি নিছক জনহিতকর কাজমাত্র নয়। জমিদার ও ব্যবসায়ী খাঁন পরিবারের সরস্বতী তীরবর্তী অঞ্চলে বিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল। তাছাড়া সপ্তগ্রাম বন্দরের সুসময়ে ঐ পথ ধরে পণ্য চলাচল করত। প্রাচীনকালে গঙ্গাবাহিত পণ্য সামগ্রী এই স্থলপথ ধরে সরস্বতী নদীবর্তী সপ্তগ্রাম বন্দরে যাতায়াত করত। বর্তমানে এই পথের কিছুটা চন্দননগর পৌর নিগম, কিছুটা ভদ্রেশ্বর পুরসভার বাকি অধিকাংশ পঞ্চায়েৎ সমিতিভুক্ত অঞ্চলে বিভক্ত। ত্রিধাবিভক্ত এই পথের অখণ্ড সত্তা পুনরুদ্ধার করে সমগ্র রাস্তাটির "খান রোড" নামকরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

চতুর্দশ অধ্যায়

শিল্প-ব্যবসাবাণিজ্য ও বণিক সম্প্রদায়

ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে ভদ্রেশ্বর গঞ্জের খ্যাতি দীর্ঘদিনের। সপ্তগ্রাম বন্দরের সমৃদ্ধির যুগে ভদ্রেশ্বর ছিল সহায়ক বাণিজ্যকেন্দ্র। সপ্তগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যুক্ত দুটি প্রধান নদীপথ ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের একটি একেবারে পাশে ও অপরটি অল্প দূরবর্তী হওয়ার জন্য ভদ্রেশ্বর স্বাভাবিকভাবেই দুটি বাণিজ্যপথের (Trade Route) অন্তর্গত ছিল। সপ্তগ্রাম বন্দরের সুসময়ে পশ্চাৎভূমি থেকে আনীত পণ্য বা বিদেশ হতে আনীত পণ্য পশ্চাৎভূমিতে সরবরাহ করার অন্যতম কেন্দ্র ছিল ভদ্রেশ্বর। সরস্বতী নদীর তীরবর্তী প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি স্থলপথে ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ভদ্রেশ্বর সপ্তগ্রামের সহায়ক বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে দশম-একাদশ শতাব্দী হতেই খ্যাতিলাভ করেছিল।

সপ্তগ্রাম বন্দরের পতন শুরু হয় ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে। সপ্তগ্রাম বন্দরের পতন ও কলকাতা বন্দরের উত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে ভাগীরথী নদী তীরবর্তী ব্যাণ্ডেল, হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানগুলি ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যবর্তী দুইশত বৎসর স্বতন্ত্র বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ভদ্রেশ্বরগঞ্জের সমৃদ্ধির সময়। কলকাতা বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার পর ভদ্রেশ্বর কলকাতার সহায়ক ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্ররূপে তার পূর্ব সমৃদ্ধি অনেকটা বজায় রাখে। কিন্তু পরবর্তীকালে শেওড়াফুলি হাট ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রেশ্বরগঞ্জের

পতন শুরু হয়। শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর রেলপথের ব্রাঞ্চ লাইন চালু হয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। ফলে হুগলী জেলার অভ্যন্তরের সঙ্গে শেওড়াফুলি বাণিজ্যকেন্দ্রের সরাসরি যোগাযোগ ঘটে। হুগলী জেলার আভ্যন্তরীন ব্যবসাবাণিজ্য শেওড়াফুলিতেই কেন্দ্রীভূত হয়। যদিও কিছুদিন নদীবন্দর হিসেবে ভদ্রেশ্বরের গুরুত্ব আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে কিছুটা বজায় থাকে। পরবর্তীকালে স্থলপথে মালবাহী ট্রাকের যাতায়াত শুরু হবার ফলে ভদ্রেশ্বর নদী বন্দরেরও অবনতি ঘটে।

ভদ্রেশ্বর নদীবন্দর ও ব্যবসাবাণিজ্যকেন্দ্রের ইতিহাসের তিনটি স্তর—(ক) সপ্তগ্রাম বন্দরের সমৃদ্ধির যুগে সহায়ক বাণিজ্যকেন্দ্র (খ) সপ্তগ্রাম বন্দরের পতনের পর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বাণিজ্যকেন্দ্র এবং (গ) কলকাতা বন্দরের উত্থানের পর পুনরায় সহায়ক বাণিজ্যকেন্দ্র।

তিনটি স্তরের সময়কাল আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দী হতে ঊনবিংশ শতাব্দী। আনুমানিক ছয় শত বৎসর। প্রথম স্তরে ভদ্রেশ্বরের ব্যবসাবাণিজ্যের রূপ কেমন ছিল তা পুঁথিপত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ ব্যবসাবাণিজ্যের পণ্যসামগ্রী ও বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি প্রমাণ করার মত যথেষ্ট উপাদান আমাদের হাতে নেই। তবু আমাদের অনুমান যে তথ্যভিত্তিক, তার প্রমাণস্বরূপ—মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত সওদাগরদের যাত্রাপথে ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে চাঁদ সওদাগরের যাত্রাপথে ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ প্রমাণ করে যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে গঙ্গাতীরে ভদ্রেশ্বর একটি অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

কলকাতা থেকে কালনার মধ্যে ভদ্রেশ্বরের মতন বড় গঞ্জ আর কোথাও ছিল না। ভদ্রেশ্বরের চারপাশে ত্রিশ চল্লিশ মাইল ব্যাসার্দ্ধের সকল স্থানের ধান চাল এই গঞ্জ থেকেই সরবরাহ করা হত। পূর্বে ভদ্রেশ্বর গঞ্জ পাটজাত দ্রব্য এবং অন্যান্য রাখিমালের প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র ছিল। হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার-এ লেখা আছে—"In old days Bhadreswar was a great mart, serving Calcutta and

the surrounding country within a radius of 20 miles."
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হতেই ভদ্রেশ্বরে পণ্য গুদামজাত করার জন্য পাকা গুদামঘর নির্মিত হয়। এইসব গুদাম ভদ্রেশ্বরের গঙ্গানদী তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। কারণ সেযুগে পণ্য আমদানী-রপ্তানী নদীপথেই হত। ঐসব বড় বড় গুদামঘর আজও ভদ্রেশ্বরে দেখা যায়। বর্তমানে ভদ্রেশ্বর বাজার বা গঞ্জের পূর্বদিকে গঙ্গা, কিন্তু অতীতে ভদ্রেশ্বরগঞ্জের উত্তর দিকেও গঙ্গা বইত। ভদ্রেশ্বর বাজারের উত্তরদিকে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নিম্নমুখী হয়ে অন্তত সাত আটশো গজ দূরে তেলিনীপাড়ার চন্দ্রবাবুর বাজারের কাছে আবার সমভূমিতে উঠেছে। আজ থেকে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে মানিকনগরের পূর্বদিকের অংশ গঙ্গাগর্ভে ছিল। নদীবন্দর হিসেবে ভদ্রেশ্বরের ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ সুবিধাজনক ছিল। উত্তর এবং পূর্বদিকে গঙ্গার তীরে একের পর এক পণ্য লেনদেনের ঘাট ও গুদামঘর ছিল। গঙ্গাতীরের বড় বড় গুদামঘরের মধ্যে সরাসরি নৌকা প্রবেশের ব্যবস্থা ছিল।

ভদ্রেশ্বরগঞ্জ ও বন্দরের প্রধান পণ্য ছিল লবণ, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, রেশম, খাদ্যশস্য, রাখিমাল ও সোরা। আমরা এক এক করে ভদ্রেশ্বরগঞ্জ ও বন্দরে যেসব পণ্যের ব্যবসা হত, তার পরিচয় দেব। আমরা প্রথমে লবণশিল্প ও বাণিজ্যের পরিচয় দেব।

লবণশিল্প ও বাণিজ্য ঃ সমুদ্রতীরবর্তী প্রদেশ হিসেবে বাংলাদেশে লবণ তৈরি ও তার ব্যবসা বহু পুরাতন। হিন্দু যুগে ও তার পরবর্তীকালে লবণশিল্পের সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির যোগাযোগ ছিল। রাষ্ট্রশক্তি সরাসরি লবণ উৎপাদন না করলেও লবণের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর কোন না কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় থাকত। "The Salt Industry of Bengal—1757—1800" গ্রন্থে শ্রীবলাই বারুই মহাশয় লবণশিল্পের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, সেই গ্রন্থ অনুসরণে লবণশিল্পের বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হল। বারুই মহাশয়ের মতে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লবণ উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা দেশীয় ব্যবসায়ীগণ করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানী "সোসাইটি অব ট্রেড" গঠন করে লবণশিল্পের উপর ব্রিটিশ বণিকদের আধিপত্য কায়েম করেন। পরবর্তীকালে সোসাইটি অব ট্রেড মারফতে লবণশিল্প নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হয়। প্রত্যাহারের পর পুনরায় দেশীয় ব্যবসায়ীরা লবণশিল্পের উপর তাদের অধিকার কায়েম করেন।

বাংলাদেশে লবণ উৎপাদনের অনেকগুলি কেন্দ্র ছিল। তার মধ্যে অন্যতম মেদিনীপুরের হিজলি ও তমলুক। হিজলি ও তমলুক অঞ্চলকে মুসলমান আমলে এমনকি ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে "নিমকমহল" বলা হত। নিমকমহলের তত্বাবধান করার জন্য একটি সরকারী পদের সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাকে বলা হত 'নিমকি দারোগা'।

"হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার" এ লবণশিল্পে হুগলীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"During the Mughal rule, Hooghly was a very important mart for salt and saltpetre............In 1836 a Government salt gola or warehouse, to hold about 50,000 maunds of salt, was established at Bhadreswar."

পঞ্চাশ হাজার মণ লবণ সঞ্চয় করে রাখার মত গুদাম স্থাপনের অর্থ স্থানীয় প্রয়োজন মিটিয়ে লবণ রপ্তানী করা হত। ভদ্রেশ্বর সরকারী গুদামের লবণ প্রধানত বিহার অঞ্চলে রপ্তানী করা হত। আরও একটি বেসরকারী লবণ গোলা ভদ্রেশ্বরে ছিল। তার মালিক ছিলেন রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশীয় কৃষ্ণচন্দ্র পান্তী মহাশয়।

লবণ ব্যবসায় সূত্রে এণ্টনি কবিয়ালের পূর্বপুরুষ কলিকাতার এণ্টনি বাগান অঞ্চল হতে চন্দননগরে চলে আসেন। এণ্টনি ফিরিঙ্গির (হ্যানস্‌ম্যান অ্যাণ্টনি) পিতার লবণ গোলা ছিল চন্দননগর, মুলাজোড় ও গৌরহাটীতে। লবণ ব্যবসায়ে মন না থাকলেও এণ্টনি কবিয়াল গৌরহাটী অঞ্চলে বাস করতেন।

এণ্টনির পূর্বপুরুষ কি সূত্রে বা কোন বড় লবণ ব্যবসায়ীর এজেণ্ট রূপে চন্দননগরে এসেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। তবে অনুমান

করতে পারি, হয় দর্পনারায়ণ ঠাকুরের লবণ ব্যবসায় সূত্রে এণ্টনির পূর্বপুরুষ চন্দননগরে আসেন, অথবা স্বাধীনভাবে নিজ ব্যবসার সূত্রে তিনি আসেন। যে সূত্রেই আসুন আমরা এণ্টনি কবিয়ালকে পূর্বপুরুষের লবণ ব্যবসায় সূত্রে চন্দননগর ও গৌরহাটীতে পেয়েছি। এণ্টনির পূর্বপুরুষ বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীদের কর্মচারী ছিলেন এবং কলকাতার এণ্টনিবাগান অঞ্চলে বাস করতেন।

সমগ্র বাংলাদেশের লবণ বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেন কলকাতার কয়েকজন ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ী। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, কাশীনাথ বাবু, লোকনাথ নন্দী, শ্রীধর সাহা এবং পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবংশের দর্পনারায়ণ ঠাকুর। দর্পনারায়ণ ঠাকুর কেবলমাত্র জমিদার ও ব্যবসায়ী ছিলেন না। তিনি চন্দননগরের ফরাসী কোম্পানীর দেওয়ানও ছিলেন। অধিকাংশ লবণ ব্যবসায়ী তাঁদের ব্যবসা চালাতেন গোমস্তা ও মোক্তারদের মাধ্যমে। বড় বড় ব্যবসায়ীদের অধীনে মাঝারি ধরণের ব্যবসায়ীরা লবণের গোলা স্থাপন করে লবণ ব্যবসা করতেন। কলকাতার বড় বড় লবণ ব্যবসায়ীদের গদি ছিল হাটখোলা, জোড়াবাগান, পাথুরিয়াঘাটা, বড়বাজার, চিৎপুর এবং টালীগঞ্জ।

লবণশিল্পের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল হাটখোলা। রাণাঘাটের পালচৌধুরীদের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র পান্তী হাটখোলার সবচেয়ে বড় লবণ ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁকে সম্মান করে 'কর্তাবাবা' সম্বোধন করা হত। বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে তাঁর লবণ বিক্রয়কেন্দ্র বা গোলা ছিল। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, হাঁসখালি, নলহাটী, কাঞ্চননগর, কালনা ও ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি স্থানে তাঁর লবণ গোলা ছিল। কেবলমাত্র তাঁরই লবণ বিক্রয়কেন্দ্র ভদ্রেশ্বরে ছিল এমন নয়, অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও ভদ্রেশ্বরে লবণ বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেছিল। এইসব ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আমাদের অঞ্চলের মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবার। বাংলাদেশে উৎপন্ন লবণের প্রধান বাজার ছিল বিহার। বিহারের বারোটি বড় বড় লবণকেন্দ্রে লবণ সরবরাহ করা হত ভদ্রেশ্বর থেকে।

মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবারের অন্যতম মথুরামোহন খাঁন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রধানত লবণের ব্যবসায়ী ছিলেন। অবশ্য আরো অন্যান্য ধরণের ব্যবসার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। বিহারের পাটনা, দুমকা, ভাগলপুর, মজঃফরপুরে তাঁর ব্যবসার গদি ছিল। ফরাসডাঙা বা চন্দননগরের হাটখোলা অঞ্চলের নুনেটোলায় তাঁর নুনের গোলা ছিল। তাঁর ব্যবসার প্রধান অংশই ছিল নুন। তাই তাঁকে 'নুনে খাঁ' বলে সকলে ডাকত।

Sri Mrinal Kumar Basu, "A note on a trading Family of Mofussil Bengal : The Khans of Mankundu" নামক গবেষণাপত্র, যা ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীনগর অধিবেশনে পঠিত হয়, তাতে মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবারের ব্যবসাবাণিজ্যের পরিচয় দিয়েছেন। মৃণাল কুমার বসু মহাশয় ঐ একই তথ্য 'ইতিহাস অনুসন্ধান—৩' এ "গঙ্গাতীরের শহর ঃ একটি প্রাথমিক আলোচনা" প্রবন্ধে এইভাবে উল্লেখ করেছেন—"ভদ্রেশ্বরের মানকুণ্ডু এলাকার বিখ্যাত ব্যবসায়ী খাঁ পরিবার রেলপথ চালু হবার আগেই বহু পণ্যের কারবারী হিসাবে বিত্তশালী হয়েছেন। শুধু নিজের শহরেই নয় কলকাতায় তারা হাটখোলা-শোভাবাজার এলাকার নুন ও পাট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এবং বিহারে কারবার গড়ে তুলেছেন।"—

হুগলী, তমলুক, হিজলি ও চট্টগ্রামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণের এজেন্সী ছিল। প্রতি স্থানেই লবণ-এজেণ্ট উপাধিধারী ইংরেজ কর্মচারী লবণের ব্যবসা দেখাশুনা করতেন। লবণ এজেণ্টদের অধীনে বহু শিক্ষিত বাঙালী কাজ করতেন। তাঁরা সাধারণত সেরেস্তাদারী, দেওয়ানি, কেরানীগিরির কাজ করতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর চুঁচুড়া নিবাসী নীলরত্ন হালদার সল্ট বোর্ডের দেওয়ান হয়েছিলেন। যার ফলে হুগলী অঞ্চলের অনেক ব্যবসাদার লবণ ব্যবসায়ের সুযোগসুবিধা পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের প্রতিকূলতার ফলে দেশীয় লবণ ব্যবসা বিলিতি লবণব্যবসার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজের অস্তিত্ব

বজায় রাখতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বিদেশী সরকার আইন করে এদেশে লবণ তৈরি ব্যবস্থা বন্ধ করে দেন এবং লিভারপুল থেকে বিদেশী লবণ জাহাজযোগে এদেশে আমদানী করেন। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই আমাদের অঞ্চলে যাঁরা লবণ শিল্প ও ব্যবসার সংগে যুক্ত ছিলেন তাঁরা একটি লাভজনক ব্যবসা থেকে বঞ্চিত হন।

লবণ ব্যবসায়ের সংগে শুধু মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবারই যুক্ত ছিলেন না। হুগলী জেলার মহানাদের কর পরিবার, ইটাচুনার কুণ্ডু পরিবার ও জামগ্রামের নন্দী পরিবার লবণ ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। লবণের ব্যবসা বন্ধ হবার ফলে হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরকেন্দ্রীক অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

রেশম শিল্প ঃ রেশম গুটি উৎপাদন একসময় হুগলী জেলার প্রথম ও প্রধান ব্যবসা ছিল। এই জেলার হরিপাল, ক্ষীরপাই ও রাধানগরে কমার্শিয়াল রেসিডেন্টরা একচেটিয়াভাবে রেশম উৎপাদন ও বন্টন করতেন। জেলার অভ্যন্তরের উৎপাদিত রেশম নদীপথে কলকাতা বন্দর হয়ে ইউরোপে রপ্তানী হত। হুগলী জেলার উৎপাদিত রেশম এত ভালো ছিল যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ব্রুক হ্যাভেনকে মাদ্রাজ থেকে হুগলীতে রেশমকুঠি স্থাপনের জন্য প্রেরণ করেন। উইলিয়াম হেজেস তাঁর ডাইরিতে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। মোগল আমলে হুগলী, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মালদহের রেশম পাটনা হয়ে উত্তর ভারতের পথে কিছুটা সুরাট বন্দরে চলে যেত; আবার কিছুটা স্থলপথে লাহোর, পেশোয়ার হয়ে খোরাস্থান ও তুর্কীস্থানে চলে যেত। রেশম ব্যবসায়ের বড় কেন্দ্র ছিল পাটনা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেশ কিছু আড়ং (কারখানা) ছিল হুগলী জেলার হরিপাল, ধনিয়াখালি, মগরা (গোলাঘর), ক্ষীরপাই ও দ্বারহাট্টাতে।

"ইতিহাস অনুসন্ধান" ৩য় খণ্ডে—"ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয় বাণিজ্য ও বাংলার পণ্য"—প্রবন্ধে শ্রীঅনিল দাস লিখেছেন—"বাংলার রেশমের গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল পাটনা। পাটনা থেকে এই

রেশম নিয়ে যাওয়া হত আগ্রা ও গুজরাটে। বাংলার উৎপাদনের দুই তৃতীয়াংশই যেত গুজরাটে। মুঘল, আরমানীয় ও ইরানীয় বণিকরা এই রেশম নিয়ে যেত খোরাসান, পারস্য ও তুরস্কে।"—

মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবার রেশম বাণিজ্যের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। খাঁন পরিবারের বিষয়সম্পত্তি সংক্রান্ত ১৯১৪ সালের একটি মামলার নথিতে তাঁদের জমিদারী, কলকাতার বাড়ি ও বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসার গদি, গুদামঘর ইত্যাদির বিবরণ আছে। খাঁন পরিবারের বিভিন্ন জেলার জমিদারীর মধ্যে অন্যতম ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কাশীপুর পরগণার জমিদারী। ঐ অঞ্চল বর্তমানে ভগবানগোলা থানার অন্তর্গত হরিহরপাড়া মহল্লা। এছাড়া মেদিনীপুর জেলার বাগড়ী পরগণার চন্দ্রকোনা অঞ্চল যা বর্তমানে গড়বেতা থানার অন্তর্গত এবং মেদিনীপুর জেলার খড়ার পরগণার বেশ কিছু অঞ্চল। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত গোঘাট ও আশপাশের অঞ্চল তাঁদের জমিদারীভুক্ত ছিল। বিহারের তৎকালীন ভাগলপুর জেলার থানাবিহিপুর, মাধুপুরা ও পাটনা শহরে বহু জমি, গুদামঘর ও ব্যবসার গদি ছিল। পাটনা শহরে গঙ্গার ধারে মুরাটগঞ্জ অঞ্চলে তাদের বেশ কয়েকটি গুদামঘর ছিল। মজঃফরপুর জেলার সীতামারি শহরেও আড়ত ও গুদামঘর ছিল। উত্তরপ্রদেশের বেনারস শহরে মিশ্রিপুকুরা অঞ্চলে গদিবাড়ি ছিল। মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও হুগলীর গোঘাট অঞ্চলে যেখানে খাঁন পরিবারদের জমিদারী ছিল, সেসব অঞ্চলে রেশম উৎপাদন ও রেশম বস্ত্র বয়নের জন্য বিখ্যাত ছিল। আবার বিহারের ভাগলপুর অঞ্চল ভাগলপুরী সিল্ক উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। খাঁন পরিবার মূলত ব্যবসায়ী। তাই এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে তাঁরা নিজেদের জমিদারী অঞ্চলে উৎপন্ন রেশম ও ভাগলপুর অঞ্চলের উৎপন্ন রেশম, পাটনা শহরে তাদের গদি, আড়ত মাধ্যমে রেশম ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, উত্তর ভারতে রেশম ও রেশম বস্ত্র ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র ছিল পাটনা শহর। অপরদিকে রেশম বস্ত্র উৎপাদনে বেনারস জগৎ প্রসিদ্ধ। পাটনা ও বারানসী গদির মাধ্যমে

মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবার রেশম ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন।

তেজারতী ও ব্যাঙ্কিং ব্যবসা ঃ পূর্বে আমাদের দেশে পোদ্দার শ্রেণীর মানুষ ব্যবসাবাণিজ্য ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ঋণ দিতেন। মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গলে" পোদ্দারদের ঋণদান পদ্ধতির পরিচয় আছে। জগৎ শেঠরা নবাবী আমলে ব্যাঙ্কিং এর কাজ করতেন। বিদেশী বণিকরাও অর্থের প্রয়োজনে দেশীয় মহাজন বা ব্যাঙ্কারদের শরণাপন্ন হতেন। স্থানীয় ব্যবসাবাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে দেশীয় মহাজনদের তেজারতী ব্যবসার উপর নির্ভরশীল ছিল।

মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবার অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে তেজারতী ব্যবসাও করতেন। কলকাতার হাটখোলায় ও ভদ্রেশ্বরগঞ্জে তাদের তেজারতী ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। কৃষক ও ক্ষুদ্র কারুশিল্পীদের তাঁরা দাদন দিতেন। শহরাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের ঋণ দিয়ে তাঁরা ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনায় সাহায্য করতেন। তাঁরা অবশ্যই মোটা হারে সুদের বিনিময়ে একাজ করতেন।

খাঁন পরিবারের বিভিন্ন পারিবারিক দলিলপত্রে তাঁদের তেজারতী ব্যবসার উল্লেখ আছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত একরারনামায় রামেশ্বর খাঁ, কানাইলাল খাঁ ও বলদেব খাঁ, তাঁদের বিষয়সম্পত্তি ও ব্যবসার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—"কলকাতার হাটখোলার গদীর ও ভদ্রেশ্বর গদীর মোকাম অন্তর্গত...... হরেকরকম কারবার এবং কর্জ দাদন অর্থাৎ তেজারত"—

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিষয়সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার নথিতে খাঁন পরিবারের তেজারতী ব্যবসা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—"কলকাতার বেনিয়াটোলা স্ট্রীটে রামধন খাঁ ও রামেশ্বর খাঁর নামে তেজারতী ব্যবসা। ঐ একই নামে তেজারতী ব্যবসা ভদ্রেশ্বরগঞ্জে।"—খাঁন পরিবারের তেজারতী ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ টাকা লগ্নী করা ছিল। তাঁরা যেমন সুদ পেতেন তেমনই এ অঞ্চলের ব্যবসাবাণিজ্যের মূলধন যোগাতেন।

আফগানিস্থানের অধিবাসী কাবুলীওয়ালারা প্রথমে ফল, হিং,

শিলাজতু প্রভৃতি সামগ্রী ফিরি করতেন। পরে তাঁরা তেজারতী কারবার সুরু করেন। এ অঞ্চলের কাবুলীদের বড় ঘাঁটি তেলিনীপাড়া বাজার। তাঁরা শহরে ও গ্রামাঞ্চলে দাদন ও ঋণ দেন। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব হতেই তাঁদের তেজারতী ব্যবসা চলে আসছে। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বিদেশী কাবুলীরা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন।

পাট ও পাটজাত দ্রব্য ঃ বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে পাটের চাষ হত। সেই পাট থেকে দঁাড়দড়া, রশি, জাহাজের কাছি ইত্যাদি প্রস্তুত হত। অনেক সময় নৌকা ও জাহাজের পালও পাটের সুতোয় বোনা কাপড়ে তৈরি হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হতেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা হাতে তৈরী থলে কেনার জন্য বাংলাদেশে আসতেন। তখন পাটশিল্প সম্পূর্ণ হস্তচালিত ছিল। পাটজাত যাবতীয় পণ্য তখন বাংলাদেশের জোলা, যুগী, কাপালী ও তাঁতী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ প্রস্তুত করত। ফরাসডাঙা তথা চন্দন-নগরের তাঁতশিল্প বহু পুরাতন। তন্তুবায় সম্প্রদায়ভুক্ত বহু মানুষ চন্দননগরে বাস করতেন। সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপাদনে এদের সুখ্যাতি ছিল। 'ফরাসডাঙার কাপড়' সেযুগে অভিজাতদের মন-পসন্দ ছিল।

চন্দননগরের লাগোয়া তেলিনীপাড়ার তাঁতীপাড়া ও কৃষ্ণপটীর যুগীপাড়া নামক অংশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই তন্তুবায় সম্প্রদায়ের বাস ছিল। চন্দননগরের তাঁত বস্ত্রের সুখ্যাতির মূলে তেলিনীপাড়ার তন্তুবায়দের যথেষ্ট অবদান ছিল। যাঁরা সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপাদনে সক্ষম ছিলেন না, তাঁরা প্রধানত হস্তচালিত তাঁতে চটের বস্ত্র প্রস্তুত করতেন। সেই বস্ত্র থেকে পরবর্তীকালে থলে তৈরি করে বিক্রি করা হত। তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর অঞ্চল হতে হস্তজাত পাট ও পাটজাত দ্রব্য কলকাতায় নৌকাযোগে চালান দেওয়া হত। এই অঞ্চলে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন বণ্টন প্রভৃতি কাজে ভদ্রেশ্বরগঞ্জের বণিকরা যুক্ত ছিলেন। মানকুণ্ডুর খাঁয়েদের কলকাতাস্থ ব্যবসাবাণিজ্যকেন্দ্র ছিল হাটখোলা। এ

অঞ্চলে প্রস্তুত পাট ও পাটজাত সামগ্রী নৌকাযোগে হাটখোলার গদিতে নিয়ে যাওয়া হত। পরবর্তীকালে তা জাহাজযোগে ইউরোপ-আমেরিকায় চলে যেত।

যন্ত্রচালিত তাঁত আবিষ্কারের ফলে যেমন এদেশের হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র বিপন্ন হয়েছিল, ঠিক তেমনি স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি শহরে যন্ত্রচালিত পাটবস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় এদেশের হস্তচালিত পাটশিল্পের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, পিতৃপুরুষের ব্যবসা থেকে তাঁরা বিতাড়িত হলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি শহরে প্রথম জুটমিল স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে আমাদের দেশে হুগলী নদীর উভয়তীরে একের পর এক পাটকল স্থাপিত হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত রিষড়ার ওয়েলিংডন জুটমিলই এদেশে প্রথম পাটকল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে চাঁপদানী জুটমিল এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তেলিনীপাড়ার ভিক্টোরিয়া জুটমিল স্থাপিত হয়। আরো পরবর্তীকালে তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বরের সংযোগস্থলে নর্থ শ্যামনগর জুটমিল স্থাপিত হয়।

আমাদের অঞ্চলে ভিক্টোরিয়া জুটমিল ও নর্থ শ্যামনগর জুটমিল অবস্থিত। কিন্তু আমাদের সন্নিহিত চাঁপদানী অঞ্চলে ডালহৌসী, নর্থব্রুক ও চাঁপদানী জুটমিল অবস্থিত। তেলিনীপাড়ার লাগোয়া গোন্দলপাড়াতে গোন্দলপাড়া জুটমিল অবস্থিত। ভাগীরথী নদীর এপার ওপার মিলিয়ে বেশ কয়েকটি পাটকল আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক নাগাদ এইসব কলকারখানা বিশেষ করে পাটকলকে কেন্দ্র করে নতুন ধরণের ব্যবসাবাণিজ্যের সম্ভাবনা দেখা দিল। কারখানার শ্রমিক হিসেবে যেমন স্থানীয় মানুষ নিযুক্ত হলেন, তার চেয়েও অনেক বেশি মানুষ বাইরে থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করলেন। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ হতে কাঁচাপাট ক্রয় এবং তা চটকলে সরবরাহ করার ব্যবসা গড়ে উঠল। তাছাড়া প্রথমদিকে যখন কলগুলি নির্মিত হয়, তখন জমি তৈরি ও কারখানা বাড়ির জন্য ইঁটশিল্পে বহু শ্রমিক ও ব্যবসায়ী যুক্ত হয়। কারখানা তৈরীর পর কারখানার বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহের সঙ্গে বহু ঠিকাদার যুক্ত হয়ে পড়েন। ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু, তেলিনীপাড়া অঞ্চলে

বহু ব্যবসায়ী পাটকলের উপকরণ সরবরাহের ব্যবসায়ে যুক্ত হন। মানকুণ্ডুর খাঁয়েরা ও ভদ্রেশ্বরের ঘোষ পরিবারের ব্যক্তিরা কাঁচাপাট ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহের ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দা বৈদ্যনাথ ঘোষের নিকট হতে জানা যায়—তাঁর পিতা শীতলচন্দ্র ঘোষ ও তাঁদের পূর্বপুরুষ কৃত্তিবাস ঘোষ ছিলেন পাট ব্যবসায়ী। তাঁরা ভদ্রেশ্বরের দশপুরুষের বাসিন্দা। ইংরেজ আমলে চটকলে পাট সরবরাহ করাই ছিল তাঁদের মূল ব্যবসা। স্থানীয় বাসিন্দা দুলালচন্দ্র রক্ষিতের নিকট হতে জানা যায় যে, তাঁদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল ঘি এর। তাঁদের পূর্বপুরুষ ফকিরচন্দ্র রক্ষিত ঘি এর ব্যবসা শুরু করেন। অন্য প্রদেশ থেকে মাটির পাত্রে নৌকাযোগে ঘি আমদানী করে অন্যত্র চালান দিতেন। ভদ্রেশ্বরগঞ্জকে কেন্দ্র করে যাঁরা ব্যবসা করতেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বৈদ্যবাটীর এস, এন, রায়, বারাসতের দে ও কুণ্ডু বাবুরা এবং কানাইলাল শেঠ, ভদ্রেশ্বরের যোগীন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী, নগেন্দ্রনাথ নিয়োগী, পঞ্চানন কর, গৌরমোহন কর। বারাসতের শ্রীমানি ও মানকুণ্ডুর খাঁ বাবুদের ভদ্রেশ্বরে গুদাম ও ব্যবসাকেন্দ্র ছিল।

সোরার ব্যবসা ঃ সোরা বারুদ ও বাজি তৈরির অন্যতম উপকরণ। আগেকার দিনে রাসায়নিক পদ্ধতিতে সোরার উৎপাদন হত না। দেশীয় কারিগররা সোরাযুক্ত মাটি থেকে সোরা উৎপাদন করত। সোরা উৎপাদন প্রধানত বিহারের পাটনা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। সেযুগে পূর্ব ভারতের সমস্ত সোরা সরবরাহ করা হত পাটনার বাণিজ্যকেন্দ্র হতে। বাংলাদেশে সোরা আমদানী ও বণ্টনের বড় কেন্দ্র ছিল হুগলী শহর। হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার-এ লেখা আছে—"মোগল যুগে হুগলীতে লবণ ও সোরার বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথমদিকে সমস্ত সোরা আসত পাটনা থেকে। সোরা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় ও তা কলকাতায় প্রেরণের জন্য পাটনাতে কোম্পানীর কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট পদের অফিসার নিযুক্ত থাকতেন।"

সোরা ব্যতীত বারুদ উৎপাদন সম্ভব নয়। সে কারণে সোরা

উৎপাদন ও বণ্টন কেন্দ্র নিজেদের হাতে রাখার জন্য রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। মীরকাশিম মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গেরে সরিয়ে নিয়েছিলেন যেসব কারণে তার অন্যতম কারণ পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা। সোরা আমদানীর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য মীরকাশেমের সঙ্গে তৎকালীন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রায়ই মতবিরোধ হত।

ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরে ইছাপুর ও নবাবগঞ্জের মাঝামাঝি অঞ্চলে বাঁকিবাজার বলে একটি স্থান ছিল। বর্তমানে পুরাতন গ্রন্থে বাঁকিবাজারের উল্লেখ থাকলেও সাধারণ মানুষ ভুলে গেছে বাঁকিবাজারের কথা। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসামঙ্গলে' চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য-পথের বর্ণনাকালে বাঁকিবাজারের উল্লেখ আছে।

—"বামে বাঁকিবাজার বহিয়া যায় রঙ্গে।
চাঁপদানী বাহি রাজ প্রবেশে দীর্ঘাঙ্গে ॥"

বর্তমানে যেখানে ই, এস, আই, হাসপাতাল আছে, তার ঠিক বিপরীত তীরে বাঁকিবাজারের অবস্থান ছিল। পূর্বে গৌরহাটীর যেখানে বিখ্যাত ফ্রেণ্ড গার্ডেন ছিল, তারও বিপরীত তীরে বাঁকিবাজার। ঐ অঞ্চলের গঙ্গার উভয় তীরের সামরিক গুরুত্ব ছিল। চাঁপদানী অঞ্চলে ইংরেজ সৈন্যদের ব্যারাক ছিল। গৌরহাটীতে ফরাসী সৈন্যদের ব্যারাক ছিল। "উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত" হতে আমরা জানতে পারি বর্তমান ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ স্থানে একটি কারখানাবাড়ি ছিল, যার মালিক এক ওলন্দাজ কোম্পানী। রাইফেল ফ্যাক্টরির পার্ক যেখানে অবস্থিত, পূর্বে ঐ স্থানকে 'বাঁকি-বাজার' বলা হত। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার অস্টেণ্ড কোম্পানী বাঁকিবাজার দখল করে ঐ স্থানে একটি বারুদের কারখানা বানায়। সে সময় এ অঞ্চলে বাণিজ্যিক অধিকার নিয়ে ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানীর দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। ইংরেজদের প্ররোচনায় হুগলীর ফৌজদার ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ানদের (জার্মান) কাছ থেকে বাঁকিবাজারের ঐ কারখানা ও কুঠিবাড়ি দখল করে নেয়।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকিবাজার ওলন্দাজদের দখলে গেল। ডাচেরা সেখানে একটি বারুদের কারখানা ও দুর্গ বানায়। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর ওলন্দাজদের পরাস্ত করে বাঁকিবাজারের দখল নেয়। মীরজাফর কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণকে ঐ স্থানটি উপহার দেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জন ফার কুহার নামে এক ইংরেজ ব্যবসায়ী রাজা নবকৃষ্ণের কাছ থেকে কলকাতার জমির বিনিময়ে এ স্থানটির অধিকার পান। ফার কুহারও ঐ স্থানে বারুদের কারখানা গড়ে তোলেন। তিনি কোম্পানীর এজেণ্ট হিসাবে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ পর্যন্ত কোম্পানীর হয়ে বারুদ তৈরি করতেন। বারবার কারখানায় বিস্ফোরণ হবার জন্য ইংরেজ সরকার ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে দি বেঙ্গল গান পাউডার ম্যানুফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেন। পরবর্তীকালে ঐ স্থানেই ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠে।

মোগল আমলের শেষদিকে বাংলার নবাবী আমল থেকেই বাঁকিবাজার বারুদের কারখানা হিসাবে খ্যাতিলাভ করে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বারুদ তৈরির প্রধান উপকরণ সোরা। সে কারণে বাঁকিবাজারের প্রায় বিপরীত তীরে ভদ্রেশ্বরগঞ্জের ব্যবসায়ীরা সোরা আমদানীর ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। মূলত মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবার তাঁদের পাটনার গদিঘর ও গুদাম সমন্বিত ব্যবসাকেন্দ্র থেকে সোরা আমদানী করে বাঁকিবাজারের বারুদের কারখানায় সরবরাহ করতেন। শুধু খাঁন পরিবারই নয়, ভদ্রেশ্বরগঞ্জের আরো অনেক ব্যবসায়ী সোরা সরবরাহের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। খাঁন পরিবারের আত্মীয় কুটুম্বেরা নবাবগঞ্জে বাস করতেন। তাঁরাও বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। আমাদের অনুমান, এ অঞ্চলে অনেক ব্যবসায়ী সোরার ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। আমাদের অনুমানের পশ্চাতে নির্দিষ্ট কোন তথ্য প্রমাণ এখনো আমাদের হস্তগত হয়নি। তবু আমাদের ধারণা অতীতের ভদ্রেশ্বরগঞ্জকে কেন্দ্র করে সোরার ব্যবসা ভালোই জমে উঠেছিল। "সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয়" গ্রন্থে শ্রীহরিহর শেঠ উল্লেখ করেছেন—"অতি পূর্বকালে (চন্দননগর ও সন্নিহিত অঞ্চল) এই স্থান হতে বস্ত্র, সোরা, বেত, চন্দনকাষ্ঠ, গালা, মোম, রেশম, মরিচ

প্রভৃতি সচরাচর রপ্তানী হইত। প্যার্ল দোরিয়াঁ, ফেলিপো প্রভৃতি এক একখানি জাহাজে প্রচুর পরিমাণ ঐসব মালপত্র চালান হইত বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।"—এই তথ্যের উৎস হিসাবে "La Compagnie des Indes Orientales" সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

নীলকুঠি ও নীলের ব্যবসা ঃ নীলচাষ ও নীলকুঠির সঙ্গে আমাদের অঞ্চলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। তবে আমাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল চন্দননগরে ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম নীলের চাষ ও কারখানা স্থাপিত হয়। ঐ নীলকুঠির অবস্থিতি ছিল চন্দননগরের উত্তরে তাউৎখানার বাগানে। ঐ নীলকুঠির মালিক ছিলেন লুই বেনো নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক। তিনি ১৭৩৭ খ্রীঃ ফ্রান্সের অন্তর্গত মার্সেল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। অলপ বয়সে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে নীলচাষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। তিনি ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের তালডাঙ্গা ও গোন্দলপাড়াতে দুইটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮৭০--৭১ খ্রীষ্টাব্দের সার্ভে ম্যাপ থেকে জানা যায় যে, তেলিনীপাড়ার লাগোয়া গোন্দলপাড়াতে একটি নীলকুঠি ছিল। চন্দননগরের দুমাঁ নামে এক ফরাসী সাহেব তাঁর উৎপন্ন নীল ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বিলাতে চালান দিয়েছিলেন। তথ্যটি 'ক্যালকাটা গেজেট' নামক পত্রিকা হতে জানা গেছে।

গোন্দলপাড়ার যে অংশে নীলকুঠিটি অবস্থিত ছিল, কিছুদিন পূর্বেও সেই মাঠটিকে কুঠির মাঠ বলা হত। চন্দননগর ও তেলিনীপাড়ার সীমা নির্ধারক পরিখা বা গড়ের অব্যবহিত উত্তরে ঐ নীলকুঠি অবস্থিত ছিল। ঐ নীলকুঠির স্থানটি পূর্বে তেলিনীপাড়া মৌজার অন্তর্গত ছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ও ফরাসী সরকারের মধ্যে সীমানা নির্ধারক চুক্তির ফলে ঐ স্থানটি গোন্দলপাড়া তথা চন্দননগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় জমিদারদের সেরেস্তার পুরাতন কাগজপত্র হতে জানা যায় বারাসত গেটের পূর্বদিকের জমি তেলিনীপাড়ার পাইকপাড়া মৌজার অন্তর্গত

ছিল। ঐ অঞ্চল ফরাসী সীমানাভুক্ত হলেও তেলিনীপাড়ার জমিদাররা ঐ অঞ্চলে খাজনা আদায় করতেন। তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের অন্যতম হাটখোলার সত্যশান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে বর্তমান দিনেমারডাঙার বেশ কিছুটা অঞ্চল জমিদারদের শান্তিনগর মহল নামে পরিচিত ছিল। শান্তিবাবুরা ঐ অঞ্চলের জমিদার হিসেবে খাজনা আদায় করতেন।

উপরোক্ত তথ্যের দ্বারা আমরা একথাই বলতে চাই, ভারতবর্ষের অন্যতম পুরাতন নীলকুঠি তেলিনীপাড়ার সীমানার মধ্যেই স্থাপিত হয়েছিল। ঐ নীলকুঠি যখন স্থাপিত হয়েছিল এবং যখন ঐ কুঠির কাজ কারবার বন্ধ হয়েছিল, সেই সময়ে ঐ জায়গা ফরাসী চন্দননগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ব্রিটিশ শাসনাধীন তেলিনীপাড়া ও পাইকপাড়া মৌজার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইঁট ও টালি তৈয়ারি শিল্প : তেলিনীপাড়ার গঙ্গাতীরবর্তী অংশে বেশ কয়েকটি ইঁটখোলা ও টালিখোলা ছিল। এইসব শিল্প ও ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তেলিনীপাড়ার ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়) পরিবার, ঘোষ পরিবার ও তেলিনীপাড়া মাল্লাপাড়ার পাল পরিবার। পূর্বে যাঁরা ইঁটের বাড়ি তৈরি করতেন, সেই ইঁট প্রস্তুতের মাটি সংগ্রহ করা হত বাড়িরই আশপাশের পুকুর কেটে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর হতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গঙ্গার উভয় তীরে একের পর এক পাটকল ও অন্যান্য কলকারখানা গড়ে ওঠে। সেইসব কলকারখানার পাকা ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য প্রচুর ইঁটের প্রয়োজন দেখা দেয়। তেলিনীপাড়ার ভট্টাচার্য, ঘোষ ও পাল পরিবার তাঁদের দূরদৃষ্টি ও ব্যবসাবুদ্ধির সাহায্যে গঙ্গার তীরে বর্তমান শিবতলা ঘাটের আশেপাশে ও ভিক্টোরিয়া জুটমিলের সন্নিহিত অঞ্চলে ইঁটখোলা ও টালিখোলা গড়ে তুললেন। এইসব খোলার ইঁট ও টালি শুধু স্থানীয় কলকারখানা নির্মাণের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হল না, নদীর উভয় তীরের বিভিন্ন কারখানা নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত হল।

বিপুল চাহিদা থাকার জন্য ইঁটশিল্প অত্যন্ত লাভজনক হয়ে ওঠে।

তেলিনীপাড়া জমিদারদের গুরু পুরোহিত বংশের পরমেশ্বর ভট্টাচার্য ও তার পরিবার ইঁটের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। সেই উপার্জিত অর্থ দোল দুর্গোৎসব, বারো মাসে তেরো পার্বণ করে ও নানা সৎকাজে ব্যয় করেন। তেলিনীপাড়ার মনসাতলার পাল পরিবার সূত্রে সংগৃহীত তথ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হল—

"প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে তারকেশ্বর নিবাসী পাল পরিবারের দুই ভাই—মধুসূদন পাল ও নফরচন্দ্র পাল টালি ও ইঁটভাঁটার পরিকল্পনা নিয়ে তেলিনীপাড়ার মনসাতলা অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। সে সময়ে এ অঞ্চলে তিনটি কারখানা—তেলিনীপাড়ার ভিক্টোরিয়া জুটমিলের দুটি ইউনিট, ভদ্রেশ্বরের নর্থ শ্যামনগর জুটমিল এবং গোন্দলপাড়া জুটমিল এর ইমারত উঠছিল। তার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল একের পর এক কুলিকামিনদের বস্তিবাড়ি। পাল ভায়েরা মনসাতলার উত্তর পূর্বে গড় ও গঙ্গার কিনারা ঘেঁসে এবং কাঙালীবাবার খেয়াঘাটের উত্তর পূর্বে গঙ্গার কিনারে ভাটিগুলি নির্মাণ করেন। জানা যায়, এ অঞ্চলে টালি ও ইঁটের প্রায় একচেটিয়া ব্যবসায়ে এত অর্থ উপার্জন করেন যে, প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে ওঁরা ভিক্টোরিয়া জুটমিল কর্তৃপক্ষকে টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করতেন।

তেলিনীপাড়ার গোয়ালাপাড়া (বর্তমানে গোবিন্দময়ী দেবী লেন) অঞ্চলের বাসিন্দা ঘোষ পরিবারের আদি বাসভূমি হুগলী জেলার পোলবা গ্রাম। ভূপতি ঘোষের পূর্বপুরুষ কিশোরীমোহন ঘোষ ও তাঁর পুত্রেরা তেলিনীপাড়ার গঙ্গার তীরে একটি ইঁটখোলা স্থাপন করেন। উন্নতমানের ইঁট প্রস্তুত করে তাঁরা প্রভূত সম্মান ও সুনামের অধিকারী হন। তেলিনীপাড়ার ইঁট ও টালিশিল্প তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে স্থাপিত হওয়ার জন্য স্থায়ী শিল্প রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। কলকারখানা তৈয়ারি শেষ হলেই ইঁটের চাহিদা কমে যায়। মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের স্বল্প স্থায়ী জীবন শেষে একে একে সব ইঁট ও টালিখোলা বন্ধ হয়ে যায়। অপমৃত্যুর অপর কারণ গঙ্গার তীরে যে জমিতে ঐসব খোলা স্থাপিত হয়েছিল, জুটমিল সম্প্রসারণের প্রয়োজনে ঐসব

গঙ্গাতীরবর্তী জমি মিল কর্তৃপক্ষ নানা উপায়ে হস্তগত করেন।

রাখিমাল ও ঘি এর ব্যবসা ঃ রাখিমাল বলতে প্রধানত বোঝায় তিল, তিসি, রেড়ি ইত্যাদি খরিফ শস্য। যে মাল বেশ কিছুদিন ব্যবসায়ীর ঘরে রেখে বিক্রি করা যায়, তাকে রাখিমাল বলে। তৈলবীজ ব্যতীত আরো অনেক খাদ্যশস্য ভদ্রেশ্বর গঞ্জের ব্যবসায়ীরা গুদামজাত করে বাজারের পরিস্থিতি অনুযায়ী বিক্রি করতেন। চন্দননগরকে একদিন পূর্বভারতের শস্যাগার বলা হত। চন্দননগর লক্ষীগঞ্জের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগ্রহকেন্দ্র থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতেন। এমনকি জাহাজযোগে এইসব পণ্য বিদেশেও রপ্তানি হত। লক্ষ্মীগঞ্জের ব্যবসায়ীদের মত ভদ্রেশ্বরের ব্যবসায়ীরা খাদ্যশস্য ও তৈলবীজের আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা করতেন।

প্রধানত বিহার হতে তিল, তিসি ও রেড়ির বীজ সংগ্রহ করা হত। বিহারের উত্তর ভাগলপুর জেলার মাধুপুরা, ভাগলপুর, পাটনা, দ্বারভাঙা অঞ্চল থেকে তিল, তিসি ও রেড়ির বীজ সংগ্রহ করা হত। প্রতিটি স্থানে মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবারদের গদি ছিল। প্রধানত মহাজনী প্রথা বা দাদন প্রথার মাধ্যমে কৃষকদের অগ্রিম দাদন বা ঋণ দিয়ে ফসল সংগ্রহ করা হত। পরবর্তীকালে নৌকাযোগে বিহার হতে ভদ্রেশ্বরগঞ্জের আড়তে ও কলকাতার হাটখোলার আড়তে রাখিমাল গুদামজাত করা হত। ঐসব তৈলবীজ মূলত জাহাজযোগে বিদেশে রপ্তানী হত। ভদ্রেশ্বর-গঞ্জের ব্যবসায়ীরা পাইকারী দরে রপ্তানীকারকদের বিক্রয় করে দিত।

বিহার হতে প্রচুর ভয়ষা ঘৃত বা মহিষদুগ্ধজাত ঘৃত সরাসরি উৎপাদনস্থল হতে ভদ্রেশ্বরগঞ্জে আমদানী করা হত। প্রধানত মুঙ্গের জেলা হতেই এইসব দেশী ঘি বড় বড় মাটির মটকা (জালা) বন্দী করে আনা হত। মটকার পাত্রে থাকত বলে এই ঘি-কে "মটকি ঘি" বলা হত। মানকুণ্ডুর খাঁয়েরা এই মটকি ঘি-এর একচেটিয়া ব্যবসায়ী ছিলেন। এই ঘি তাঁরা পাইকারী দরে এখানকার ও কলকাতার ব্যবসায়ীদের বিক্রি করে দিতেন। এছাড়া বারাসতের দে পরিবারও বিহার হতে আনীত

ঘি এর পাইকারি ব্যবসা করতেন।

মিষ্টান্ন শিল্প ঃ হুগলী জেলার মিষ্টান্ন দেশবিদেশে প্রশংসা পেয়েছে। জনাই অঞ্চলের মিষ্টান্ন শিল্পীরা কলকাতা বা অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। চন্দননগরের কয়েকটি মোদক পরিবারের কারিগরি জ্ঞান ও কৌশলে প্রস্তুত নানা ধরণের মিষ্টান্ন চন্দননগরের মিষ্টান্ন শিল্পকে রসিক সমাজে আদৃত ও প্রতিষ্ঠিত করেছে। দক্ষিণ চন্দননগরের বারাসত অঞ্চলে সূর্য্যকুমার মোদকের মিষ্টান্নের আদি দোকান ছিল। পরবর্তী-কালে তাঁর বংশধর শৈলেন্দ্রনাথ মোদক তেলিনীপাড়ার বাবুরবাজারে মিষ্টান্নের দোকান ও বসতবাড়ি নির্মাণ করেন। এ অঞ্চলের মানুষের "সূয্যি ময়রার" দোকানের খাবার না হলে কোন শুভকাজ, উৎসব সুসম্পন্ন হয় না।

সূর্য্য মোদক জলভরা সন্দেশের আবিষ্কারক। পূর্বে যে তালশাঁস সন্দেশ প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে মিষ্টরস প্রবেশ করিয়ে জলভরা সন্দেশের সৃষ্টি। জলভরা সন্দেশ এখন সর্বত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু সূর্য্য মোদকের জলভরা সন্দেশ আমাদের অঞ্চল ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না। এই সন্দেশ আবিষ্কারের পিছনে একটি কাহিনী আছে। তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় জমিদারদের এক জামাতাকে নতুন ধরণের সন্দেশ খাওয়াবার আগ্রহে জলভরা সন্দেশের সৃষ্টি। তেলিনী-পাড়ার সংগে জলভরা সন্দেশের সৃষ্টির এই যোগটুকুর জন্যে আমরা গৌরব অনুভব করে থাকি। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সূর্য্য মোদকের তৈরি জলভরা ও অন্যান্য সন্দেশের পরম অনুরাগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখনই চন্দননগরে ও তেলিনীপাড়ার জমিদারবৃন্দের বাড়িতে আসতেন, তখনই জলভরার পশরা নিয়ে সূর্য্য মোদক মশাই রবীন্দ্রনাথের সামনে উপস্থিত হতেন। রবীন্দ্রনাথ সূয্যি মোদকের মিষ্টান্নের আস্বাদে তৃপ্ত হয়ে তাঁকে 'রসরাজ' উপাধি দিয়েছিলেন। কবির ইচ্ছানুযায়ী তাঁর সাধের জলভরা সন্দেশ শান্তিনিকেতনেও পোঁছে দেওয়া হত। সেযুগে চন্দননগরের ফরাসী শাসকদেরও রসনা তৃপ্তির জন্য এই মোদক পরিবারকে

মিষ্টান্ন সরবরাহ করতে হত।

ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায়ের পরিচয়

আমাদের দেশে ব্যবসাবাণিজ্য সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধানত বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত বণিকরাই ব্যবসাবাণিজ্য করতেন। অবশ্য বাংলাদেশে বৈশ্য হিসাবে কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা হয়নি। আমাদের দেশে প্রধানত নবশাখ শ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়গুলি, সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় ও বৈশ্য সাহা সম্প্রদায়, শুঁড়ি, বারুই ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষেরা ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে বংশানুক্রমিকভাবে জড়িত। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সদ্‌গোপ শ্রেণীভুক্ত মানুষরাও কখনো সখনো ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

ভদ্রেশ্বরগঞ্জকে কেন্দ্র করে যেসব ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আমাদের অঞ্চলের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, তাঁরা প্রধানত তিলি, সদ্‌গোপ ও শুঁড়ি সম্প্রদায়-ভুক্ত। এ অঞ্চলের যে ব্যক্তি নিজে ব্যবসায়ী না হয়েও ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে ইতিহাসের পাতায় নিজেদের নামকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখে গেছেন, তাঁরা হলেন পিতাপুত্র—আত্মারাম সরকার ও বনমালী সরকার।

"প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়—কথায় ও চিত্রে" গ্রন্থে শ্রীহরিহর শেঠ লিখেছেন—"আত্মারাম সরকার হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর হইতে কুমারটুলি আসিয়া বাস করেন। বনমালী, রাধাকৃষ্ণ ও হরেকৃষ্ণ নামে তাঁহার তিন পুত্র ছিল। বনমালী সরকার প্রথমে পাটনার রেসিডেণ্ট দেওয়ান ছিলেন। পরে কলকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডেপুটি ট্রেডার হন। ১৭০০—১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি উত্তর কলিকাতায় একটি বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করেন। সেযুগে তাঁর কুমারটুলির বাড়ি কলকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্য ছিল। তাঁর বাড়ি সম্বন্ধে একটি ছড়া প্রচলিত ছিল—

"বনমালী সরকারের বাড়ী,
গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি।
আমিরচাঁদের দাড়ি,
হুজরীমল্লের কড়ি ॥

'শাশ্বত কলকাতা'—প্রথম পর্ব গ্রন্থে 'গঙ্গার ঘাট' প্রসঙ্গে রথীন মিত্র, বনমালী সরকারের ঘাট সম্পর্কে লিখেছেন—উত্তর কলিকাতার বটতলা ঘাট আসলে বনমালী সরকারের ঘাট। ইনি জাতিতে সদ্‌গোপ। পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টগিরি করে অনেক অর্থ উপার্জন করেন। হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণায় তাঁর প্রচুর সম্পত্তি ছিল। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালী তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া তিনি একটি বিষ্ণু মন্দির ও একটি শিব মন্দির স্থাপন করেন। 'সদ্‌গোপ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য' গ্রন্থে ডঃ অতুল সুর লিখেছন—"বনমালী সরকার ও তাঁর পুত্র রাধাকৃষ্ণ সরকার সম্বন্ধে রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্ লিখে গেছেন—Bonamali Sarkar the party noted for his fine house was a SadGop by caste and used to serve as a banian to European merchants. The ruins of his house still exist near Bagbazar. His son Radha Krishna Sarkar held a high position in Hindu society and Raja Nabakrishna, even in his better days, is said to have paid him court."

প্রসঙ্গক্রমে একটি তথ্যগত পার্থক্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। হরিহর শেঠ মহাশয় রাধাকৃষ্ণকে আত্মারামের পুত্ররূপে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু অতুল সুর ও রেভারেণ্ড জেমস্ লঙের মতে রাধাকৃষ্ণ বনমালীর পুত্র।

বনমালী সরকার কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট হিসাবে কত গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন তা বোঝার জন্য কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট পদের দায়িত্ব কি, তা আমাদের জানা দরকার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে প্রথমে ব্যবসা করতে এসেছিল। তাই কোম্পানীর শাসনের প্রথমদিকে শাসনকার্যের পদ

অপেক্ষা কমার্শিয়াল পদের গুরুত্ব ও সম্মান বেশী ছিল। সারা বাংলা মুলুকে কোম্পানীর যে স্থানে আড়ং-এর কারখানা ও পণ্য সংগ্রহ কেন্দ্র ছিল তা পরিচালনা করতেন কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টরা।

কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টরা কাঁচামাল সংগ্রহ করে নিজস্ব আড়ং বা কারখানায় চালানী মাল তৈরি করে কলকাতা পাঠাতেন। কলকাতা বন্দর দিয়ে সে মাল বিদেশে চালান যেত। রেসিডেণ্টের অধীনে একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেসিডেণ্ট ও বহু সংখ্যক কারিগর, কর্মী ও দালাল থাকত। বাংলাদেশের অনেক স্থানে কমার্শিয়াল রেসিডেন্সি ছিল। কিন্তু সমগ্র বিহার প্রদেশের জন্য একমাত্র পাটনা শহরে কমার্শিয়াল রেসিডেন্সি ছিল। সে কারণে পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টের পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল। একমাত্র সাহেব কর্মচারীরা যে পদে নিযুক্ত হতেন, সে পদে একজন বাঙালীর নিযুক্তি অত্যন্ত সম্মানজনক ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। নিছক কর্মদক্ষতার গুণে বনমালী সরকার ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন।

বনমালী সরকার কেবলমাত্র উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন না। তিনি হিন্দু সমাজের সমাজকর্তারূপে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। বহু দানধ্যান ও সৎ কাজের দ্বারা নিজেকে হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর পুত্র রাধাকৃষ্ণ সরকারও পিতার ন্যায় সমাজকর্তা ছিলেন। আত্মারাম সরকার, বনমালী সরকার ও রাধাকৃষ্ণ সরকার—আমাদের ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের সুসন্তান হিসাবে আমরা গর্বিত।

তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে জমিদার ও পরে ব্যবসায়ী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেযুগে ব্যবসায়ী বংশে জন্মগ্রহণ না করেও অনেক অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তি ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, জয়নারায়ণ ঘোষাল, গোকুল মিত্র তার উদাহরণ।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তদানীন্তন বিখ্যাত ইংরাজ ব্যবসায়ী মেসার্স কলভিল এ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং নানা দ্রব্যাদি সরবরাহ করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। কোম্পানীর বিপদের সময়ে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের সুবর্ণমুদ্রা ধার দিয়ে কোম্পানীকে উদ্ধার করেন।

প্রতিদানে কলভিল কোম্পানী তার পুত্র অভয়াচরণকে কোম্পানীর মুৎসুদ্দির পদ দেন। এই পদে তাঁর বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা আয় হত। অভয়াচরণের পর তাঁর ভাই কাশীনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র অন্নদাপ্রসাদ কলভিল কোম্পানীর মুৎসুদ্দির কাজ করতেন।

মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবার মূলত ব্যবসায়ী। তাঁরা প্রথমে ব্যবসায়ী পরে জমিদার ও শিল্পপতি। মোগল আমলে এরা সৈন্যাবাসে (ছাউনি) মালপত্র সরবরাহ করতেন। যুদ্ধের সময় চলমান সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে থেকে বাহিনীর রসদ যোগাতেন। এদের পারিবারিক শ্রুতি অনুযায়ী এরা মানসিংহের সৈন্যবাহিনীর অনুগামী হয়ে মানকুণ্ডু গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। মোগল সেনাপতি মানসিংহের নামে মানকুণ্ডু গ্রামের নামকরণ। খাঁন পরিবার পুরুষানুক্রমে ব্যবসায়ী। প্রধানত ভদ্রেশ্বর গঞ্জ ও কলকাতার হাটখোলাকে কেন্দ্র করে এদের ব্যবসাবাণিজ্য। খাঁন পরিবার প্রধানত লবণ, রাখিমাল, সোরা ও ঘি-এর ব্যবসা করতেন। এই বংশে সর্বাপেক্ষা সফল ব্যবসায়ী হিসাবে মথুরামোহন খাঁ ও কানাইলাল খাঁ-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ভদ্রেশ্বর গঞ্জকে কেন্দ্র করে প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরে যে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল, তা আজও অব্যাহত আছে, কিন্তু সে পূর্বগৌরব আর নেই। রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে কলিকাতার উত্থান ও স্থানীয় বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে শেওড়াফুলি হাটের প্রতিষ্ঠা ভদ্রেশ্বরের গৌরব হ্রাসের প্রধান কারণ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও স্বদেশী আন্দোলন

আমাদের পার্শ্ববর্তী শহর ফরাসী শাসনাধীন চন্দননগর বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল। ব্রিটিশ ভারতের বিপ্লবী ও রাজনৈতিক কর্মীরা আত্মগোপনের প্রয়োজন হলেই চন্দননগরে আশ্রয় নিতেন। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে চন্দননগরবাসীরা এইসব বিপ্লবীকে আশ্রয় দিতেন। বিপ্লব-তীর্থ চন্দননগর বিপ্লবীদের ধাত্রীস্বরূপ ছিল। চন্দননগরের রাজনৈতিক সচেতনতা এত বেশি ছিল যে তার পার্শ্ববর্তী ভদ্রেশ্বর অঞ্চল স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে চন্দননগরের অচ্ছেদ্য বন্ধন ছিল। চন্দননগরকেন্দ্রীক বিপ্লববাদ ও জাতীয়তাবাদের ঢেউ আমাদের বুকে তরঙ্গের সৃষ্টি করত। দিনের বেলা সূর্যের দীপ্ত প্রভায় যেমন আকাশের তারা নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে, ঠিক তেমনি চন্দননগরের পাশে আমাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা দীপ্তিহারা তারার মত। কিন্তু দিনের বেলা তারার দেখা না পেলেও তার অস্তিত্ব তো বিলুপ্ত হয় না, তেমনি আমাদের অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিচয় বাইরের মানুষের অজানা থাকলেও আমাদের নিজস্ব রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল।

আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠার আগে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর হতেই জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হতে থাকে। এই

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ অনেকটাই লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটেছে। তাই সাধারণ মানুষ এর সংবাদ রাখে না। ভদ্রেশ্বর অঞ্চলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন জমিদার ও ব্যবসায়ীগোষ্ঠী। সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে সাধারণ মানুষের স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ঘটত না। জমিদার ও ব্যবসায়ীগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই রাজভক্ত ছিলেন। যে কোন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সযত্নে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতেন। তাঁরা বিদেশী প্রভুর 'খয়ের খাঁ' গিরি করে রাজাবাহাদুর, রায়বাহাদুর বা খাঁ বাহাদুর, খাঁসাহেব উপাধি পাবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে বাবু সম্প্রদায়ের মতই পদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের বাঈজী নাচে, বিলিতি মদের ফোয়ারা ছুটিয়ে, বড়দিনে ভেট পাঠিয়ে ইংরেজ তোষণ করতেন। আমাদের অঞ্চলে জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাঁদের পূর্বপুরুষের রাজভক্তির ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন।

বর্তমানে জমিদার ও ব্যবসায়ীদের ভূমিকা সার্বজনীন ধিক্কারের মুখে পড়েছে। ফলে আমরা নানা জনহিতকর কাজ, শিক্ষাপ্রসারে অকুণ্ঠিত ব্যয় ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাদের গোপন ও প্রকাশ্য ভূমিকার কথা ভুলতে বসেছি। ইতিহাসের ধর্ম সত্যকে প্রকাশ করা। আমাদের অঞ্চলের জমিদার ও ব্যবসায়ীদের রাজভক্তির নিদর্শনের কথা মনে রেখেও জাতীয়তাবোধের উন্মেষেও তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার কথা আমরা প্রকাশ করতে চাই। এই অঞ্চলে মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবার ও তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার জমিদার ছিলেন। মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবার অপরদিকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীও ছিলেন। তাঁরা ও ভদ্রেশ্বর গঞ্জের অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা ব্যবসাকর্মের সঙ্গে দেশের কথা ভুলে যাননি।

কলকাতার হাটখোলায় ব্যবসায়ীবৃন্দ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে হাটখোলা ব্যবসায়ী সমাজ স্থাপন করেন। সমাজ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য—নিজস্ব ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন ব্যবসা নীতি নিদ্ধারণ করা ছিল দ্বিতীয়

উদ্দেশ্য। হাটখোলার ব্যবসায়ী সমাজই যুগ প্রয়োজনে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সে' রূপান্তরিত হয়। ন্যাশনাল চেম্বার্স স্থাপনের পিছনে নিছক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছিল না। ঠিক দু-বছর পূর্বে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এর একটা আন্তরিক যোগাযোগ ছিল। নবসৃষ্ট জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয় প্রচেষ্টায় দেশীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ একতাবদ্ধ হন। আমাদের বক্তব্য যে ভিত্তিহীন নয়, তা প্রমাণের জন্য বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল—"When the chamber was established in 1887, its constitution which, by the way, was drafted by A. O. Hume and revised by Mr. W. C. Bonnerjee .... The chamber maintained from the very beginning a close touch with political leaders of the country and, in the very first year of its existence, the following persons, who were then prominent Congress members, were elected Honourary Members of the chamber by the first Executive Committee.

Sir Surendra Nath Banerjee
A. M. Bose, Bar-at-law
Narendra Nath Sen
Rai Isswr Ch. Mitter Bahadur

Chamber received an invitation from Sir Surendra N. Banerjee..... to depute some delegates to represent it at the Third Session of the Indian National Congress held in Madras, December 1887."

"হাটখোলা মহাজন সমাজ" গড়ে তুলেছিলেন খাঁন, মণ্ডল ও সিংহ

পদবীধারী বাঙালীরা। মানকুণ্ডুর খাঁয়েরা হাটখোলা মহাজন সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। কানাইলাল খাঁন বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। চেম্বার্স সৃষ্টির শুরু থেকেই দীর্ঘ বারো বৎসরের অধিককাল তিনি চেম্বার্সের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

কানাইলাল খাঁন-এর সূত্রে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভদ্রেশ্বর গঞ্জের ব্যবসায়ীবৃন্দের যোগাযোগ ঘটে। পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫ খ্রীঃ) পর বাংলাদেশে যে উত্তাল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার কাজে সুরেন্দ্রনাথ ভদ্রেশ্বর গঞ্জের ব্যবসায়ীদের সহায়তা পেয়েছিলেন। তিনি ব্যবসায়ীদের গুদাম-ঘরে গোপন সভা করতেন। গঞ্জের ব্যবসায়ীরা সুরেন্দ্রনাথকে অর্থ দিয়ে সামর্থ্য দিয়ে ও আশ্রয় দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের যথাসাধ্য দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ যখন চন্দননগরে আসছেন, তখন পথে ভদ্রেশ্বর স্টেশনে তাঁকে ঘোড়ার গাড়িতে তোলা হল। গাড়ি টানলো ঘোড়া নয়, ভদ্রেশ্বরের ছাত্র সমাজ। নিজেরা কাঁধে করে সে গাড়ি টেনে নিয়ে চললেন। সেদিন যাঁরা গাড়ি টেনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—নারায়ণচন্দ্র পাল ও নিত্যপ্রসন্ন বিশ্বাস। বঙ্গভঙ্গের দিন সারা বাংলাদেশে ছিল অরন্ধন। চন্দননগর, তেলিনী-পাড়া, ভদ্রেশ্বর, বৈদ্যবাটী সর্বত্র মিছিল ও রাখিবন্ধন উৎসব করা হল। মানিকনগর নিবাসী হরিচরণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ছাত্রনেতা পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ছাত্রদল 'অরন্ধন দিবসে' বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রজ্জ্বলিত উনুনে জল সিঞ্চন করেছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রধরে স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম হোতা বিপিনচন্দ্র পাল তেলিনীপাড়ায় এসেছিলেন। তিনি জগবন্ধু চট্টোপাধ্যা-য়ের বাড়ীতে এবং কিশোরীমোহন ঘোষের ঠাকুর দালানে (সিদ্ধেশ্বরী ভবন) অনুষ্ঠিত জনসভায় স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের নিকট বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।

পূর্বভারতে গণচেতনার উন্মেষ হয় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারকে

কেন্দ্র করে। যদিও হুগলী জেলার খন্যানবাসী বাঙালী দীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রথম দেশীয় মালিকানায় নীলকুঠি স্থাপন করেন তবুও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে আমাদেয় অঞ্চলে ব্যাপক গণজাগরণ ঘটেনি। হুগলী জেলায় নীলকুঠির সংখ্যা কম থাকায় এটা ঘটেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে দুটি চাঞ্চল্যকর মামলা তৎকালীন বাঙালী সমাজের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও গণচেতনার সঞ্চার ঘটায়। দুটি মামলাই হয়েছিল হুগলী জেলার সেশন জজ কোর্টে। আমাদের অঞ্চলের শত শত লোক ঐ মামলার শুনানি শুনতে প্রতিদিন চুঁচুড়া কোর্ট যেতেন। সেইসব প্রত্যক্ষদর্শীরা বাড়ি ফিরে ঐ ঘটনার অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিতেন। ফলে আমাদের অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের মানুষের অপেক্ষা মামলা দুটির দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাদের উত্তেজনা ও সহমর্মীতার আরো কারণ ছিল। প্রথম মামলার নায়ক একে রাজকুমার তায় তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশীয়দের বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুত্বের সূত্রে তিনি তেলিনীপাড়া ও ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের মানিকনগরে বহুদিন বাস করে গেছেন। দ্বিতীয় মামলার আসামী পরনারীলোলুপ লম্পট। যিনি গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য ফরাসডাঙায় এসে লুকিয়েছিলেন।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার সেশন জজের কোর্টে বর্ধমানের রাজকুমার প্রতাপচাঁদের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ মামলা দায়ের করেন। রাজকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি জাল ব্যক্তি। আসল রাজকুমার নন। যদিও মামলা বর্ধমানের রাজ পরিবারের ব্যাপার নিয়ে কিন্তু এই মামলার সঙ্গে আমাদের অঞ্চলের ছোটবড় মানুষ নানাভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। মানী নবাব, ধনী জমিদার থেকে সাধারণ ঘাটমাঝি পর্যন্ত। ঐ মামলা নিয়ে তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, সিঙ্গুর এবং খলিসানী-বিলকুলি অঞ্চলের ঘরে ঘরে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। ঘটনার ফলশ্রুতি স্বরূপ আমাদের অঞ্চলের মানুষের মনে জাতীয়তাবোধ ও গণচেতনার সঞ্চার হয়।

প্রতাপচাঁদের কাহিনী নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় একটি তথ্যভিত্তিক প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের নাম "জাল প্রতাপচাঁদ"। আমরা সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থ অনুসরণ করে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনে ঐ মামলার প্রতিক্রিয়ার বিচার বিশ্লেষণ করব। সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছেন—"বর্ধমান রাজকুমার প্রতাপচাঁদ কুস্তি করিতে, সাঁতার দিতে, ঘোড়ায় চড়িতে বড় পরিপক্ক ছিলেন। লোকে বলে, তিনি ইংরেজ ঠ্যাঙাইতে আরো মজবুত ছিলেন।...... অধিকাংশ সিভিল সার্ভেণ্ট তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। ...... তিনি আবার এদিকে বড় সামাজিক ছিলেন। এ অঞ্চলে আসিলে তেলিনীপাড়ার রামধনবাবুর ভদ্রেশ্বর বৈঠকখানায় আমোদ করিয়া আসিতেন।"—সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণনা অনুযায়ী বর্ধমান রাজকুমার প্রতাপচাঁদের সঙ্গে তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধুত্ব ছিল। তাঁদের বন্ধুত্বের কারণ তাঁরা উভয়েই ছিলেন সমানমনা ও সমানধর্মা।

জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়দের বংশ বিবরণীতে পাই—"বৈদ্যনাথের তৃতীয় পুত্র রামধন বাংলা ১১৮০ সালে (ইং ১৭৭৩ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তেলিনীপাড়ার নিকটবর্তী মানিকনগর গ্রামে এক সুবৃহৎ ত্রিতল বাটী নির্মাণ করাইয়া বাস করিতেন। ঐ বাটীতে তাঁহার যথারীতি শক্তিসাধনা চলিত এবং প্রতি বৎসর তিনদিনব্যাপী জগদ্ধাত্রী পূজা করাইতেন। ...... তদানীন্তন গভর্ণমেণ্ট জাল প্রতাপচাঁদের বিপক্ষে থাকায় রামধন পরোক্ষে জাল প্রতাপচাঁদকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন। বর্ধমান মহারাজ প্রতাপচাঁদ তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ছিল।"

ঐ পুস্তকে অন্যত্র রামধনের পরিচয় প্রসঙ্গে লেখা আছে—"তিনি দীর্ঘকায় বলশালী পুরুষ ছিলেন। কুস্তি, লাঠিখেলা, অশ্বচালনা, নৌকাচালনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রামধন ঘোরতর শাক্ত ছিলেন। পঞ্চ ম-কার সহযোগে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে শক্তি সাধনা করতেন। মানিকনগরের শ্মশান ছিল তাঁর সাধনার স্থল। তিনি ইংরেজ সংস্রব এড়িয়ে চলতেন।"—

রামধন ও প্রতাপচাঁদ উভয়েই খেলাধূলা, শরীরচর্চা ও ধর্মসাধনায়

একই পথের পথিক ছিলেন। প্রতাপচাঁদ শেষ বয়সে সহজিয়া ধর্মমতের পথিক হয়ে নারী সঙ্গিনী নিয়ে সাধনা করতেন। রামধনের শক্তিসাধনায় সাধন সঙ্গিনীর প্রয়োজন ছিল। উভয়ের শরীর ও মনের সহমর্মীতার জন্যই বন্ধুত্ব গভীর ও গাঢ় হয়েছিল। গভীর বন্ধুত্ব সত্ত্বেও নিজ বৈষয়িক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সাক্ষীতালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও রামধনবাবু প্রতাপচাঁদের পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেননি। নানা কৌশলে এড়িয়ে দিয়েছিলেন।

অথচ ভদ্রেশ্বরের একজন সাধারণ মানুষ পলতা ঘাটের মাঝি প্রতাপচাঁদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ঘাটমাঝি রামধন বাগদী সাক্ষ্যে বলে—"আমি পলতাঘাটের ঘাটমাঝি। আসামী মহারাজকে চিনি। ষোলো-সতেরো বৎসর ধরিয়া আমি তেলিনীপাড়ার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাউলের (নৌকার) মাঝি ছিলাম। ভদ্রেশ্বরে রামধনবাবুর একখানা বাগান ও বৈঠকখানা ছিল। সেখানে মহারাজ মধ্যে মধ্যে যাইতেন। একরাত একদিন সেখানে থাকিতেন, ইহা আমি দেখিয়াছি।" হায়! দুই রামধনে কতো তফাৎ! বাগদী রামধন যা পারল, জমিদার রামধন তা পারলেন না।

কলকাতার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সরকারের ভয়ে ভীত হয়ে সত্য গোপন করে প্রতাপচাঁদকে চেনেন না বলে আত্মরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের অঞ্চলের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রতাপচাঁদকে সমর্থন করার জন্য নিগৃহীত হয়েছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। তাঁরা হাজতবাস করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন বিলকুলির (চন্দননগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি গ্রাম) নবাববাহাদুর আনোয়ার আলি খাঁ সাহেব এবং সিঙ্গুরের জমিদার প্রতাপচাঁদের পরম বন্ধু নবাব-বাবু (আসল নাম শ্রীনাথবাবু)। প্রতাপচাঁদের পক্ষ সমর্থন করে সাক্ষ্য দেন কয়েকজন বিদেশী। চন্দননগরে বসবাসকারী কয়েকজন ফরাসী ব্যক্তি। তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে প্রতাপচাঁদকে জোরালোভাবে সমর্থন করেন। এঁরা হলেন—ফ্রানসুয়া, সুলিমান, ডাক্তার জুলিয়ান নইটড্ ও ফেডারিক থিয়ার্শ—ফরাসডাঙার মেজেস্টর।

মামলায় পরাজিত প্রভাপচাঁদ পরবর্তীকালে আশ্রয়ের জন্য কোম্পানীর রাজ্য হতে পালিয়ে চন্দননগরে বোড়াইচণ্ডীতলায় পূর্ব পরিচিতি ফরাসীদের আশ্রয়ে কয়েক বৎসর বাস করেন। উপরোক্ত তথ্য হতে বোঝা যায় রাজকুমার প্রতাপচাঁদের সঙ্গে তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর-মানিকনগর ও চন্দননগরের মানুষদের সঙ্গে কত ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। আমাদের অঞ্চলের তৎকালীন মানুষ বিশেষত স্ত্রীলোক ও সাধারণ মানুষ প্রতাপচাঁদের পক্ষে ছিলেন। মামলা চলাকালীন দিনের পর দিন হুগলী কোর্টের প্রাঙ্গণে তাঁরা উপস্থিত থাকতেন। তাঁর জয় কামনা করতেন। জয়ধ্বনি দিতেন। সাধারণ মানুষের কাছে প্রতাপচাঁদ বীরের সম্মান পেয়েছিলেন। এক ধরণের বীরপূজার (hero worship) মনোভাব তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল।

মানুষের ধারণা হয়েছিল ইংরেজ সরকার তৎকালীন বর্ধমান রাজপরিবারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চায়। এই প্রথম বাঙালীর অটুট রাজভক্তিতে সন্দেহের ফাটল দেখা দিল। মুসলমান শাসনমুক্ত সে যুগের বাঙালী হিন্দু, কোম্পানীর রাজত্বের আইনের শাসনের জয়গান গাইত। কিন্তু যখন ইংরেজ সরকার যেন তেন প্রকারেন প্রতাপচাঁদকে শাস্তি দিতে উদ্যত হল তখন মানুষের মনে ইংরেজ শাসনের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটল। এ প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছেন—"গভর্ণমেণ্ট যে চাতুরী করিয়াছেন, অকার্য করিয়াছেন, অবিচার করিয়াছেন, অধর্ম করিয়াছেন—ইহা সকলেই বলিতে লাগিলেন। সুতরাং কোম্পানীর প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধা জন্মিল। ······ পাদ্রীরা সত্যবাদী বলে যে ধারণা ছিল—সে শ্রদ্ধা বড় রহিল না। খ্রীষ্টধর্ম হতে মানুষের মন ঘুরে গেল ব্রাহ্মধর্মের দিকে।" সঞ্জীবচন্দ্রের উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। উক্তির অন্তর্নিহিত অর্থ জাল প্রতাপচাঁদের মামলা আমাদের মনকে রাজভক্তি ও খ্রীষ্টযাজক ভক্তি থেকে মুক্তি দিল।

অন্যায় ও অবিচারের প্রতি এ অঞ্চলের মানুষের মনকে আরো সচেতন করল তারকেশ্বরের মোহান্ত ও এলোকেশীর মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক সম্বন্ধীয় মামলায়। এলোকেশীর স্বামী নবীনচন্দ্র স্ত্রীকে মাছকোটা

বঁটি দিয়ে হত্যা করে। এলোকেশী হত্যার মামলা ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলা সেশন জজের কোর্টে শুরু হয়। জাল প্রতাপচাঁদের মামলায় আমাদের অঞ্চলের মানুষ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু এলোকেশী মামলার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। সারা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে এখানকার মানুষরাও মোহান্ত-এলোকেশী-নবীনচন্দ্র মামলায় আবেগচঞ্চল হয়ে ওঠে। মামলা হুগলী সেশন কোর্টে হয়েছিল এবং আত্মগোপনকারী মোহান্ত ফরাসী চন্দননগরে ধরা পড়েছিল। —এই দুটি কারণে এখানকার মানুষদের আবেগ--উত্তেজনা--চাঞ্চল্য কিছু বেশি ছিল।

হত্যাকাণ্ড এবং মামলার বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নেই। আমরা কেবল মামলার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তারই বিবরণ দেব। মোহান্ত-এলোকেশী-নবীনচন্দ্র ঘটনার সূত্রপাত ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এর জের চলেছিল ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অর্ধশতাব্দীর অধিককাল আমাদের সমাজজীবনকে ঐ ঘটনা আন্দোলিত করেছিল।

এলোকেশী মামলা চলাকালীন আমাদের অঞ্চলের শত শত লোক চুঁচুড়ায় সেশন জজ কোর্টের সামনে উপস্থিত থাকতেন। সাধারণ মানুষ নবীনচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তার বেকসুর খালাস দাবি করত। নবীনচন্দ্র তাদের চোখে বীর হয়ে উঠেছিলেন। জুরিরা নবীনচন্দ্রকে নির্দোষ বললেও সেশন জজ এইচ, টি, প্রিন্সেপ জুরিদের সঙ্গে একমত না হয়ে মামলা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেন। হাইকোর্টের বিচারে নবীনচন্দ্রের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। সাধারণ মানুষ তার দুঃখে অভিভূত হয়ে গান গেয়ে বেড়াল—"তুমি যাচ্ছ দ্বীপান্তরে, সহে না রে এ অন্তরে চেয়ে দেখ দুঃখান্তরে যত বঙ্গবাসীগণ"—

এলোকেশীর মৃত্যু ও নবীনচন্দ্রের দ্বীপান্তর হলেও ঘটনার শেষ হল না। মামলা চলাকালীন নবীনচন্দ্র মোহান্তের বিরুদ্ধে পরস্ত্রী গমনের অভিযোগ দায়ের করেন। প্রবল জনমতের চাপে হুগলীর আদালত থেকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন মোহান্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়। কিন্তু মোহান্ত পলাতক। মোহান্ত

লুকিয়েছিলেন ফরাসী চন্দননগরে। স্থানীয় মানুষ তাঁর সন্ধান জানতে পেরে তাঁকে ধরিয়ে দেবার উদ্যোগ করে। সেই উদ্যোগের ফলে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমাদের অঞ্চলের জমিদারবৃন্দের মুখপাত্র হয়ে মোহান্তকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করেন। "A Bengal Zaminder" গ্রন্থে নীলমণি মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—The Mohanta escaped to the French territory of Chandernagore. Jaykrishna Mukherjee, as the most influential Zaminder of the district, helped the Government in proceeding against the fugitive Mohanta and getting him arrested." জেলার জমিদারগণ ও সাধারণ মানুষ এক হয়ে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে দাঁড়ান। সাধারণ মানুষ মোহান্তের কারাদণ্ডে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

প্রিন্স অব ওয়েলসে (পরবর্তীকালে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারতভ্রমণে এসে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাত্র তিন বৎসর দ্বীপান্তর বাসের পর নবীনচন্দ্রকে মার্জনা করেন। আন্দামান ফেরত নবীনচন্দ্রকে দেখতে শত শত মানুষ কলকাতার জাহাজঘাটে উপস্থিত হয়েছিল। ওদিকে মোহান্ত মাধবগিরি কারাদণ্ড ভোগের পর পুনরায় তারকেশ্বরের মোহান্তের গদিতে বসেন। এ ঘটনায় সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মোহান্তের গদিচ্যুতির জন্য শুরু হয় সত্যাগ্রহ। সেই সত্যাগ্রহ চলে দীর্ঘদিন—১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সাধারণ, মানুষের সত্যাগ্রহ ক্রমে রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। রাজ্য কংগ্রেস এক তদন্ত কমিটি বসান। এর সভাপতি হন চিত্তরঞ্জন দাস, সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠপোষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। অন্যায় প্রতিকারে এগিয়ে আসেন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ও হিন্দু মহাসভার কর্তৃপক্ষ। চলে মামলা মোকদ্দমা। তারকেশ্বরের স্টেটে রিসিভার নিয়োগ করা হয়। শেষ পর্যন্ত তারকেশ্বরের মোহান্তদের নিরঙ্কুশ অধিকার কেড়ে নিয়ে মন্দির পরিচালনার যাবতীয় দায় দায়িত্ব দেওয়া হয় পরিচালন সমিতিকে।

"মোহান্ত-এলোকেশী সংবাদ" গ্রন্থে "শ্রীপান্থ" ঘটনার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন এইভাবে—"মোহান্তদের সত্যকারের বিচারক সেদিন জনতা। বাংলার নানা অঞ্চল থেকে ঢেউ এর পর ঢেউ এর মত সত্যাগ্রহীর দল আছড়ে পড়েছেন তারকেশ্বরের উপর। ..... তারকেশ্বরের মোহান্ত ঘিরে সেদিন ঘৃণার দাউদাউ আগুন। ..... সেই আগুনে ইন্ধন জোগাচ্ছিল একান্ন বৎসর আগে হারিয়ে যাওয়া কুমরুলের সেই মেয়েটি—এলোকেশী।"

নারী সমাজের নিকট এলোকেশীর অপরাধ পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে লঘু হয়ে উঠেছিল। পিতা, বিমাতা, তেলি বৌ ও মোহান্তের সমবেত ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল এলোকেশী। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অসহায় রূপই তখন বড় হয়ে উঠেছিল। সারা বাংলার মানুষের গণ সত্যাগ্রহের সঙ্গে আমাদের অঞ্চলের মানুষ তারকেশ্বরে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ঐ ঘটনায় মানুষের মনে বিশেষ করে নারীসমাজের অন্ধ ধর্মাচার ও গুরুবাদের হাত থেকে মুক্তি ঘটল। প্রায় শতাব্দীব্যাপী মামলা দুটির ফলে অন্ধ রাজভক্তি ও অন্ধ ধর্মসংস্কারের অবসান ঘটিয়ে জাতীয় জীবনে নূতন প্রাণের সঞ্চার হল। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারল গণশক্তির জোর কত। সংঘবদ্ধ সচেতন মানুষ যে কোন অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারে। এই ধারণা মানুষের মনে দৃঢ়মূল হল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আরেকটি ঘটনার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যে ঘটনায় আমরা দেখব জমিদারবৃন্দের অন্ধ রাজভক্তি ক্রমশ হ্রাস পেয়ে সরকারী অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করছে না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালের প্রথমদিকে একটি বিচিত্র ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সেযুগে রেলপথ ছিল না। তাই সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজ করে স্থলপথে স্থানান্তরে যাতায়াত করত। সৈন্যবাহিনীর রাত্রিবাসের জন্য প্রধান প্রধান রাজপথের কিছু দূর অন্তর অন্তর ফাঁকা মাঠ বা 'ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড' এর ব্যবস্থা ছিল। সৈন্যবাহিনীর সেই সাময়িক ছাউনিতে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য রসদ জোগানো ও মালপত্র পরিবহনের জন্য গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, চৌকিদার ও কুলি মজুর

জোগানোর দায়িত্ব ছিল স্থানীয় জমিদারদের। সেই রসদের অন্যতম ছিল গোমাংস। আমাদের জেলায় প্রায় সব জমিদার হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। গোমাংস সরবরাহে তাদের প্রবল আপত্তি ছিল। কিন্তু মুখ বুজে তাদের সব সহ্য করতে হত। স্বল্প সময়ের নোটিশে সবকিছু জোগাড় করা অসুবিধাজনক জানিয়ে জেলা কালেক্টরদের কাছে জমিদাররা আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদন নিবেদনে কিছু ফল না হওয়ায় প্রায় এক শত বৎসর ধরে এই অন্যায় অবিচার জমিদাররা মুখ বুজে সহ্য করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার জমিদারবৃন্দ উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপুরের গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী, তেলিনীপাড়ার সত্যদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাস্তাড়ার ললিতমোহন সিংহের নেতৃত্বে ঐ অন্যায় প্রথা অবসানের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানান। প্রতিবাদের ফলে ঐ প্রথা প্রত্যাহৃত হয়।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম নায়ক তেলিনীপাড়ার সত্যদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রামমোহন-বন্ধু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র (দত্তক)। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সেযুগের বিখ্যাত ব্যক্তিরা সত্যদয়ালের বন্ধু ছিলেন। জেলার জমিদারবর্গের অন্যতম মুখপাত্র হিসেবে সত্যদয়াল যে কাজ সেদিন করেছিলেন, তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অসীম। লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রায় একশত বৎসর পরে এই প্রথম জমিদারবৃন্দ 'একজোট হয়ে প্রতিবাদ জানান।

জাল প্রতাপচাঁদের বিচার, মোহান্ত-এলোকেশী-নবীনচন্দ্রের বিচার, দেশীয় ব্যবসায়ীবৃন্দের একজোট হওয়ার প্রচেষ্টা ও জমিদারবৃন্দের সমবেত প্রতিবাদের মধ্যে যোগসূত্র আছে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এইসব ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ ও গণচেতনার উন্মেষ হয়। ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেই বীজ বপন হয়। জনমানসে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের রাজনৈতিক ফলস্বরূপ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টির কিছু পরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত ইংলণ্ড থেকে সিংহল হয়ে ভারতে আসেন। ভারতে থিয়সফিক্যাল সোসাইটি স্থাপনই তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল। বিলাতে থাকাকালীন রাজনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। এদেশে এসে তিনি বেশ কিছুদিন তেলিনীপাড়ার জমিদার মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে তেলিনীপাড়ায় ছিলেন। মনোমোহনবাবু ও তিনি উভয়েই থিয়সফিক্যাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

পরবর্তীকালে শ্রীমতী বেশান্ত এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের তিনি সভানেত্রী মনোনীত হন। শ্রীমতী বেশান্তকে ঘিরে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে মাদ্রাজে অন্তরীন করে রাখেন।

শ্রীমতী বেশান্ত তেলিনীপাড়ায় বাসকালীন (১৮৯৩ খ্রীঃ—১৮৯৪ খ্রীঃ) কেবলমাত্র থিয়সফির চর্চাই করেন নি, তিনি তৎকালীন তেলিনীপাড়া ও সন্নিহিত অঞ্চলের যুবকবৃন্দকে উগ্র জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। মন্ত্রদীক্ষিত সেই যুবকবৃন্দ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আঞ্চলিক নেতৃত্ব দেন।

জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত যুবকবৃন্দের অন্যতম চন্দননগরের উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কিছুদিনের জন্য তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন পণ্ডিত হৃষিকেশ কাঞ্জীলাল। উপেন্দ্রনাথ তাঁর—"নির্বাসিতের আত্মকথা" গ্রন্থে শিক্ষকতার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন এইভাবে—

"আমি তখন সবেমাত্র সাধুগিরির খোলস ছাড়িয়া জোর করিয়া মাষ্টারীতে মনটা বসাইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় এক সংখ্যা

"বন্দেমাতরম" হঠাৎ একদিন হাতে আসিয়া পড়িল। ·· ·· ····· (জেলে) আর আসিয়া পৌঁছিলেন আমার পুরাতন বন্ধু পণ্ডিত হৃষিকেশ। হৃষিকেশ আমার কলেজের সহপাঠী।····· ··একসঙ্গে উভয়ে সাধুগিরি করিয়া ফিরিয়াছি, মাষ্টারীও করিয়াছি। আজ রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে গিয়া একসঙ্গে উভয়ে পুলিশের হাতে ধরাও পড়িলাম। ভবিষ্যতে যে উভয়কে একসঙ্গে শ্রীধাম আন্দামানে বাস করিতে হইবে, তাহা তখন জানিতাম না।"—

ভবিষ্যৎ আন্দামানবাসী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হৃষিকেশ কাঞ্জীলাল—এই দুই শিক্ষকের সাহচর্যে তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর স্কুলের ছাত্ররা জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হবেন—তার আর আশ্চর্য কি!

"গোধূলিমন" পত্রিকায় বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় "বিপ্লবী বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়" প্রবন্ধে লিখেছেন যে বিপ্লবী বসন্তকুমার তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে ১৯০৫ খৃঃ এণ্ট্রান্স পাশ করেন। বসন্তকুমার ১৯২০ খৃঃ কলকাতার ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের গৃহে অ্যানি বেশান্তের সভাপতিত্বে যে ডোর্টিনিউ কনফারেন্স হয়, তাতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।—

অ্যানি বেশান্তের স্থানীয় যুবকবৃন্দের সঙ্গে যে যোগাযোগ ছিল সেই পূর্ব সম্পর্কের সূত্রেই বসন্তকুমার শ্রীমতী বেশান্তের ঘনিষ্ঠ হন। শ্রীমতী বেশান্তের সঙ্গে স্থানীয় যুবকবন্দের যোগাযোগ উক্ত তথ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হল।

ষোড়শ অধ্যায়

রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও শ্রমিক সংগঠন

জাতীয়তাবোধ ও গণচেতনার উন্মেষের পর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক জীবনের শুরু। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ১৮৮৫ খ্রীঃ থেকে ১৯৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত এ অঞ্চলের রাজনৈতিক চেতনা ও শ্রমিক সংগঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করব।

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দুই পথে চালিত হয়ে একই মূল লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। একদলের লক্ষ্য ছিল সভাসমিতি ও আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার অর্জন। মহাত্মা গান্ধী এই পথের পথিকদের অসহযোগ আন্দোলন, বিদেশী পণ্য বর্জন ও গ্রামের তৃণমূলে কংগ্রেসকে পৌঁছে দিয়ে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। দ্বিতীয় পথের পথিকরা গোপন সংগঠনের মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রসর হন। আমাদের অঞ্চলে এই উভয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব পড়ে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্রীঃ) ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে যে রাজনৈতিক উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিচয় দিয়েছি।

গান্ধীজীর বিদেশী পণ্য বর্জন ও অসহযোগিতার আহ্বানে আমরা ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিলাম। ম্যাঞ্চেস্টারের বিলিতি কাপড় আগুনে পুড়িয়ে দেশী মোটা কাপড় অঙ্গে তুলেছিলাম। চরকা দিয়ে নিজে হাতে

সুতো কেটে সেই সুতোয় তাঁতীদের দিয়ে কাপড় বুনিয়ে পরেছিলাম। দেশী মদ ও আফিং এর দোকানে পিকেটিং এর সামিল হয়েছিলাম।

ঢাকার মানুষ গিরীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ভদ্রেশ্বরে এসে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা শুরু করেন। খদ্দর পরিহিত অমায়িক সৌম্যদর্শন গান্ধীবাদী মানুষটি স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। স্থানীয় ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। তাদের তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ ও বয়কটের আহ্বান শুনিয়েছিলেন।

আহ্বান শুনে এগিয়ে এসেছিলেন হরিপদ মুখোপাধ্যায় (মানিকনগর), অমর মিত্র, হরি প্রামাণিক, বীরেন মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছাত্রবৃন্দ। আফিমের দোকান ও ভদ্রেশ্বর বাজারের বলাই লাহার বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং হল। হরিপদ মুখোপাধ্যায় ও অমর মিত্র ইতিপূর্বে মেদিনীপুরের কাঁথিতে লবণ আইন ভঙ্গ করে সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে এসেছেন। গান্ধীবাদী গিরীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জীবনের পরিণতি বড়ই করুণ। তাঁর স্ত্রীর এমনকি বাড়ির পরিচারিকার জেল হয়। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর স্ত্রী মারা যান। চরম দারিদ্র্য ও অবহেলার মধ্যে শ্রী চক্রবর্তী মারা যান। সর্বস্ব ত্যাগী, আদর্শবাদী দেশপ্রেমিকের কী শোচনীয় পরিণতি!

প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবের গোপন প্রস্তুতি সমান্তরাল ভাবেই চলছিল। চন্দননগরের বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপের ঢেউ আমাদের অঞ্চলের মানুষকে আন্দোলিত করেছিল। তার কিছু পরিচয় পাই নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রক্তবিপ্লবের এক অধ্যায়' গ্রন্থে। ঐ গ্রন্থে উল্লেখ আছে—"বিখ্যাত বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন।........ উপেন্দ্রনাথের সহপাঠী মানিকতলা বোমা মামলার সম্পর্কীয় বিপ্লবী হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল (পরবর্তীকালে বিশুদ্ধানন্দ স্বামী) ভদ্রেশ্বর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন।........জগদ্ধাত্রী দেবী বিসর্জন দিবসে ষ্ট্র্যাণ্ডে (চন্দননগর) স্বদেশী সংগীত পরিবেশনে বাধা দিলে কয়েকজন যুবক মান্দ্রাজী সিপাহীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে। তেলিনীপাড়া নিবাসী

প্রবোধচন্দ্র পাল স্বদেশী সংগীত গাওয়ার জন্য গ্রেপ্তার হন।........ শ্যামনগর স্টেশন দিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্তন নিরাপদ নয় জেনে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বারীন্দ্রকুমার (ঘোষ) তেলিনীপাড়ার পারঘাটে চলে গিয়ে পার হন।”

সম্ভবত তেলিনীপাড়ার অপর পারঘাট কাঙালীবাবার ঘাট দিয়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ কলিকাতা চলে যান। চন্দননগরের বিপ্লবীদের সঙ্গে বিশেষ করে চারুচন্দ্র রায়, সংঘগুরু মতিলাল রায়, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অগ্নিযুগের অগ্নিপুরুষদের সঙ্গে তেলিনীপাড়ার ছাত্র ও যুবকবৃন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর স্কুলের ছাত্রগণ তাদের শিক্ষক উপেন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশী মন্ত্র গ্রহণ করেন।

তেলিনীপাড়ার শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—দুই ভ্রাতা ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ইংরেজকে ভারতছাড়া করতে হবে এই সংকল্পে ব্রতী হয়ে ট্রেনে এক ইংরেজ অফিসারকে গুলি করে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ার পর ধরা পড়েন। তাঁকে মেদিনীপুর কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পে রাখা হয়। ক্যাম্পে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। ক্যাম্পে অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মাদকাসক্ত করে ছয় বৎসর পরে মুক্তি দেওয়া হয়।

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুভাষপন্থী কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। তিনিও ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে ধৃত হয়ে কারাবরণ করেন। দুই বৎসর কারাজীবন যাপনের পর তিনি মুক্তি পান। তাঁদের সমগ্র পরিবার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তেলিনীপাড়ায় কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্রের পুত্র কন্যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

গান্ধীবাদী আন্দোলনে ছাত্র ও যুবক সমাজের মন ভরেনি। তারা দেশের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য বিকল্প পথের যাত্রী হন। বীরভূম বোমা মামলার আসামী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী (বর্তমানে মন্ত্রী) আত্মগোপনকালে এ অঞ্চলের ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ভদ্রেশ্বরের একদল যুবক বৈদ্যবাটীতে ডাকাতি করেন। অংশগ্রহণকারী যুবকের দলের প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হন। পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে হরিপদ মুখোপাধ্যায় (মানিকনগর) রাজসাক্ষী হন।

১৯৩৫/৩৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে শিল্প সমবায়ের দোতালায় স্থানীয় ছাত্রের দল বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ ও সন্তোষকুমার ভড়ের উপস্থিতিতে ছাত্র সংগঠন গড়ে তুললেন। ভদ্রেশ্বর অঞ্চলে বামপন্থী রাজনীতির এটাই প্রথম পদক্ষেপ। সংগঠনের কাজকর্মে উপস্থিত থাকতেন ভবানী মুখোপাধ্যায় ও কমল চট্টোপাধ্যায়।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আন্দামানে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর স্কুলে ছাত্র ধর্মঘট হল। ১৯৪২ খ্রীঃ জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে স্কুলের ছাত্রেরা বেশ কিছুদিন ধর্মঘট করে। কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে ও রাজনৈতিক কূটকৌশলে ধর্মঘট বেশী দিন চালানো সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাপানীদের বোমা বর্ষণ, পঞ্চাশের (১৯৪৩ খ্রীঃ) মন্বন্তর, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আত্মগোপন, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তাঁর "দিল্লী চলো" আহ্বান প্রভৃতি ঘটনায় সারা বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। আমাদের এ অঞ্চলের মানুষের জীবনে তার প্রভাব এসে পড়ে। পূর্ব হতেই এ অঞ্চলে জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভা ও কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন ছিল। ১৯৪৬ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে মুসলিম লীগের "ডিরেক্ট অ্যাকশন" এর ফলে কলকাতা, নোয়াখালি অঞ্চলে ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। ঐ দাঙ্গার জের হিসাবে পরবর্তীকালে (১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে) তেলিনীপাড়ায় ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। দেশ ভাগের সামনে দাঁড়িয়ে বাঙালী হিন্দু পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক করার দাবী তুলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে প্রথমে হিন্দু মহাসভা পরে জনসংঘের আশ্রয় নেয়। তেলিনীপাড়া অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মোদকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ ঘরের সন্তান হয়ে

এবং নানা আর্থিক প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে সারা জীবন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক জগতে একনিষ্ঠতা ও আনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

তেলিনীপাড়ার অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা রামনন্দন গুপ্তা। তিনি এক সময়ে স্থানীয় টাউন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯১৯ খ্রীঃ "আজাদী কী তান" নামে হিন্দীভাষায় স্বাধীনতা সংগ্রামী-দের কাহিনী নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে ভগৎ সিং-এর আত্মত্যাগের কাহিনী ছিল। গ্রন্থটি কলকাতা হতে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার গ্রন্থটি রাজনৈতিক কারণে বাজেয়াপ্ত করেন। স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাকে নানাভাবে উত্যক্ত করে। বিহার সরকার শ্রীগুপ্তকে ৩ বৎসরের জন্য বিহার প্রবেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। রামনন্দন গুপ্তা সমাজসেবী হিসাবে এ অঞ্চলের বহু উন্নতি করেছেন।

"অধিকার" নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা ১৯৫৫ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়ে এ অঞ্চলের মানুষের মনে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনাকে জাগ্রত করতে সাহায্য করে। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এটি ভদ্রেশ্বর হতে প্রকাশিত হত। পত্রিকার পরিচালন সমিতির মধ্যে ছিলেন—পাঁচু সাধুখাঁ, শান্তি মুখোপাধ্যায় ও সুকুমার ঘোষ। পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন—বেচু প্রামানিক, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাথ চট্টোপাধ্যায়, সত্যদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত নিয়োগী ও দেবগোপাল চক্রবর্তী।

পত্রিকায় পৌরসংক্রান্ত সমস্যা, জাতীয় সমস্যা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা ও বিষয়বস্তুর উপর অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রবন্ধ, কবি ও সাহিত্যিকদের গল্প ও কবিতা এবং সাংস্কৃতিক সংবাদ প্রকাশিত হত। পত্রিকার ভিত্তি রাজনৈতিক হলেও তা প্রগতিশীল চিন্তার ধারক ও বাহক ছিল। পত্রিকা স্থানীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশক হিসাবে জনপ্রিয় ছিল। ১৯৭৭ খ্রীঃ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

ঘটে চলে ঘটনার পর ঘটনা। অঙ্গচ্ছেদের পর রক্তস্নাত দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। পূর্ববঙ্গ হতে নিরীহ, অসহায় বাঙালী হিন্দু

সাতপুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে, যথাসর্বস্ব হারিয়ে বাস্তুহারা রূপে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। নোয়াখালির দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত বেশকিছু পরিবার তেলিনীপাড়ার জমিদার সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔদার্যে তাঁর 'লালকুঠি' প্রাসাদে আশ্রয় পায়। সেই প্রথম এ অঞ্চলের মানুষ বাস্তুহারাদের দুঃখদুর্দশা স্বচক্ষে দেখল। সহানুভূতিতে বিগলিত তেলিনীপাড়ার প্রতি পরিবার তাদের দুঃখদুর্দশা দূর করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় দিয়ে তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন তেলিনীপাড়ার তরুণ সমাজ। এদের নেতৃত্বে ছিলেন সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপদ ঘোষ, বেনারসী রায়, নিরাপদ ঘোষ, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ মোদক, অনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনৈতিক সংকট ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সকল ভারতবাসীর সঙ্গে আমাদের অঞ্চলের মানুষ স্বাধীন ভারতের স্বাধীন জীবনে প্রবেশ করে।

শ্রমিক সংগঠন ঃ ভদ্রেশ্বর অঞ্চল শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কল-কারখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর ও অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষ দলে দলে তেলিনীপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মের মানুষ এ অঞ্চলকে ভারতের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ করে তোলেন। তেলিনী-পাড়ার ভিক্টোরিয়া জুটমিল ও ভদ্রেশ্বর মানিকনগরের নর্থ শ্যামনগর জুটমিলের শ্রমিকরা প্রথমদিকে মিল কর্তৃপক্ষ নির্মিত শ্রমিক আবাসস্থলে বাস করতেন। পরে আশপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে বস্তিবাড়ির বাসিন্দা হন।

শ্রমিকরা প্রথমদিকে অসংগঠিত ছিলেন। তাঁদের রুজি রোজগার এবং পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন সর্দাররা। সর্দার প্রথার ভালোমন্দ—দুদিকই ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিকদের জীবনে সর্দার-দের প্রভাব প্রতিপত্তি কেমন ছিল, তা বোঝানোর জন্য দুটি ঘটনার

উল্লেখ করছি। ভিক্টোরিয়া জুটমিলের জুট ডিপার্টমেণ্টের সর্দার ছিলেন মহেশ পাণ্ডা। পূর্বে প্রধানত ওড়িয়া শ্রমিকরাই জুট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন। এদের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন মহেশ পাণ্ডা। তখন জুট ডিপার্টমেণ্টের হপ্তা (সাপ্তাহিক মাহিনা) মিলের মধ্যে বিলি করা হত না। মহেশ সর্দার হপ্তার সমস্ত টাকা নিজের বাড়িতে এনে বিলি করতেন। এতে বোঝা যায় মিল কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকরা তাঁকে কতটা বিশ্বাস করতেন ও নির্ভর করতেন।

ভিক্টোরিয়া জুটমিল চালু হবার প্রথমদিকে বিশৃঙ্খল কুলি কামিনদের শৃঙ্খলাপরায়ণ কর্মীতে যিনি পরিনত করেছিলেন, তাঁর নাম সর্দার মুকসুদ আলি খাঁন। বিহারের ছাপরা জেলার মুকসুদ আলি ভাগ্যান্বেষণে তেলিনীপাড়া এসে পেঁছান ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। শ্রী খাঁন ছিলেন আফগান দেশীয় ইউসুফ জাই গোষ্ঠীভুক্ত পাঠান। কারখানার দরোয়ান ও শ্রমিকদের মারামারি সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করে তিনি মিলের সাহেবদের সুনজরে পড়ে যান। মিল কর্তৃপক্ষ তাঁকে শান্তিশৃঙ্খলা ও শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের কাজে নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল তিনি সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। শ্রমিক নিয়োগের কাজেও তাঁর কিছুটা হাত ছিল। তিনি নিজের জেলা ছাপরা হতে কর্মক্ষম লোক আনিয়ে, নিজের বাড়িতে রেখে, খাইয়ে ও কাজ শিখিয়ে তাঁতের কাজে নিযুক্ত করতেন। শ্রমিকদের বিপদে আপদে তিনি ছিলেন পরিত্রাতা। বিবাদ--বিসংবাদ, গৃহনির্মাণ ও ক্রয়বিক্রয় সবই তাঁর তত্ত্বাবধানে হত। খাঁসাহেব পঞ্চায়েত ডেকে বিচার করে বিবাদ মিটিয়ে দিতেন। পারতপক্ষে কাউকে পুলিশ থানায় যেতে দিতেন না। ১৯৪৬--এর দাঙ্গার সময় তিনি হিন্দু মুসলমান ঐক্য বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেন; কিন্তু পরবর্তীকালে আজীবন সংগ্রামী, অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের মানুষটি ভগ্নহৃদয়ে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

মিল কর্তৃপক্ষ সেযুগে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণে সর্দারদের ওপর একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন। যেসব সর্দারগণ তাঁদের দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামপ্রসাদ সিং, ছট্টুলাল চৌধুরী,

রামধনি সাউ, রমজান সর্দার ও লোটন সর্দার। জুটমিলের কর্মরত সর্দারগণ ব্যতীত স্থানীয় অনেক শ্রমিক দরদী নেতা শ্রমিকদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন।

সর্দারদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এসে এ অঞ্চলের চটকল শ্রমিকরা প্রথম সংগঠিত হলেন জামান সাহেবের নেতৃত্বে। শ্রমিকদের উপর জামান সাহেবের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। শ্রমিকদের নিকট জামান সাহেব ছিলেন হর্তাকর্তাবিধাতা। তাঁর আহ্বানে হাজার হাজার চটকল শ্রমিক সমবেত হতেন। জামান সাহেবের ব্যক্তিকেন্দ্রীক শ্রমিক সংগঠন আস্তে আস্তে ভেঙে গেল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন যখন এ অঞ্চলে তাদের কাজকর্ম শুরু করলেন তখন ধীরে ধীরে জামান সাহেবের জনপ্রিয়তা শ্রমিকদের মধ্য থেকে লুপ্ত হল।

শ্রমিকনেতা এম, এ, জামানের সহকারীরূপে শিবনারায়ণ লালের শ্রমিক সংগঠনের কাজের সূচনা হয়। অবাঙালী হয়েও বাংলা ভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা করে তিনি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। পুরসভা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে তিনি কেবল নিজে খেয়ে পরে বাঁচতে চাননি। অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি শ্রমিক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

এই অঞ্চলের তেলিনীপাড়াতেই সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে ওঠে। পাঁচু সাধুখাঁ, গিরিজা মুখোপাধ্যায়, শিবনারায়ণ লাল, অজিত নিয়োগী ও ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রচেষ্টায় কমিউনিস্ট পার্টির শাখা গড়ে ওঠে। অবশ্য তখন পার্টির কাজকর্ম শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

আত্মীয় কুটুম্বিতার সূত্রে সেযুগের বিখ্যাত শ্রমিক নেত্রী শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা দেবী মাঝে মাঝে তেলিনীপাড়ায় আসতেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের কুটুম্ব। এ অঞ্চলের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। পরবর্তীকালে কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিদি ইন্দিরা দেবীর বৈবাহিকা সূত্রে তেলিনীপাড়ার সঙ্গে তাঁর বন্ধন দৃঢ় হয়।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ স্বাধীন হবার পর এদেশের শ্রমিক সমস্যা ও শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শ্রমিক শাখা সংগঠন গড়ে তুলে শ্রমিক সংগঠনকে মূলত রাজনীতিকেন্দ্রীক করে তোলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

ইতিহাসের ইঙ্গিত

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের আলোচ্য বিষয়ের অনুসরণক্রমে এ অঞ্চলের ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির স্বরূপ নির্ধারণ করতে চাই। আমরা আমাদের আলোচনাকে পুরোদস্তুর ইতিহাস বলে দাবি করিনা। যে নিয়মনীতি ও বিধিনিষেধের মধ্যে ইতিহাস রচিত হয়, আমাদের আলোচনায় তা সবসময় রক্ষিত হয়নি। না হওয়ার প্রধান কারণ পুরোদস্তুর ইতিহাস রচনা করতে গেলে যে পরিমাণ ঐতিহাসিক তথ্য ও উপকরণের প্রয়োজন, তা আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। অন্যভাবে বলা যায়, ঐতিহাসিক তথ্য ও উপকরণ এ অঞ্চলে তেমন নেই। আমাদের অঞ্চল কোন প্রাচীন রাজ্যের রাজধানী নয় বা কোন বড় ধরণের রাজনৈতিক উত্থানপতনের সঙ্গে জড়িত নয়। দ্বিতীয়ত কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, শিলালিপি ও তাম্রলিপি এ অঞ্চল থেকে উদ্ধার হয়নি। কোন প্রাচীন মন্দির, মঠ বা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষও এখানে নেই। ইতিহাস রচনার এসব সুপরিচিত তথ্য না থাকার জন্য এ অঞ্চলের ঘটনা নিয়ে নিয়মনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। আমাদের এই অপূর্ণতার কথা স্মরণ রেখেই আমরা আমাদের আলোচনাকে ইতিহাস না বলে বলছি 'ইতিবৃত্ত'।

আমাদের এই ইতিবৃত্ত রাজসিংহাসন বা পাথুরে উপকরণকে ঘিরে নয়। মানুষই আমাদের আলোচনার মূল বিষয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের আসা যাওয়া, মানুষের বসতির, মানুষের জীবনযাত্রার

গতিপ্রকৃতি আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি। তাই সামাজিক পটভূমিকায় এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার বিবর্তনকে আমরা মুখ্য বিষয় করেছি।

আমাদের অঞ্চলের ইতিহাসের যে বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, সেগুলির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমত, জনবিন্যাস ও সামাজিক পরিবর্তনের যে সর্বভারতীয় ধারাক্রম আছে—আমাদের ক্ষুদ্র জনপদে সেই সর্বভারতীয় প্রক্রিয়া সমভাবে ক্রিয়াশীল। সভ্যতা ও ধর্মবিস্তারের নামে চলেছে আদিবাসী উৎখাত। উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্তরা ছলে বলে কৌশলে সমস্ত ভূমির উপর নিজস্ব অধিকার কায়েম করেছে। বঞ্চনা, প্রতারণা ও সর্বপ্রকার শোষণের শিকার হয়েছে এখানকার আদি বাসিন্দারা। প্রতিকারহীন অক্ষম হতাশায় বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে।

দ্বিতীয়ত, সামন্ততন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের অভ্যুত্থান জনজীবনের স্বাধীন বিকাশকে ব্যাহত করেছে। বিদেশী শাসন ও শোষণ এবং সবশেষে শিল্পবিপ্লব আমাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে নষ্ট করে দিয়েছে। বহিরাগত শিল্প শ্রমিকরা এ অঞ্চলকে ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ করে তুলেছে।

তৃতীয়ত, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সমন্বয় কলকাতাকেন্দ্রীক নগরজীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়, প্রায় সমসময়ে আমাদের আঞ্চলিক জীবনেও তাই ঘটে। কলকাতাকেন্দ্রীক এই জাগরণ গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে, কিন্তু আমাদের অঞ্চলে তা সমসময়ে সমচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। শিক্ষাবিস্তার, ব্রাহ্মধর্ম প্রসার ও সমাজ সংস্কার কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে এখানে শুরু হয়।

একাধারে রামমোহন-দ্বারকানাথ-ডিরোজিওর ভূমিকা পালন করেন অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল প্রমুখ সনাতনপন্থীদের ভূমিকা পালন করেন ভৈরবচন্দ্র তর্কবাচস্পতি মহাশয়। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে সর্বসাধারণের নিকট ইংরাজী শিক্ষার দ্বার খুলে দেয়। আর এখানে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হয় ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রেভারেন্ড মুন্ডী ও ১৮৩৯

সালে প্রতিষ্ঠিত অন্নদাপ্রসাদের ইংরাজী পাঠশালায়।

চতুর্থত, গণচেতনা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছে অনাচার, অত্যাচার ও ব্যাভিচারের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। বর্ধমান রাজকুমার প্রতাপচাঁদের প্রতি অবিচার ও তারকেশ্বরের মোহান্তের ব্যাভিচার প্রতিকারে অক্ষম ইংরেজ শাসনের ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা ও আইনের মর্যাদা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস বিচলিত হয়েছে। ইংরেজ শাসনমুগ্ধ বাঙালীর মোহমুক্তি ঘটেছে। ধর্ম, সামাজিক সংস্কার ও গুরুবাদের বন্ধন হতে নারীজাতির মুক্তি ঘটেছে। খ্রীষ্টধর্মের উদার বাণীর অন্তরালে যে অনুদার স্বার্থপরতা আছে তা প্রকাশিত হয়েছে। তৃণমূল হতে গণচেতনার সঞ্চার ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছে।

পঞ্চমত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থা ক্রমশ গড়ে উঠছে। পূর্ব-পশ্চিম বঙ্গের অঞ্চলগত বিরোধ, হিন্দু মুসলমানের ধর্মগত বিরোধ, বাঙালী ও অবাঙালীর ভাষাগত বিরোধ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে মেনে নিয়েছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি আমাদের অঞ্চলকে ক্ষুদ্র ভারতে পরিণত করেছে। মহামানবের সাগরতীরে আমরা সকলে মিলিত হয়েছি—বিবিধের মাঝে মিলন মহান। আজ আমাদের সবচেয়ে বড় গর্ব, সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা মহান ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ। আমাদের অঞ্চলের নানা ভাষা, ধর্ম ও সমাজ একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন, একই কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।'

ইতিহাসের ইঙ্গিত থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ যদি আমরা অস্বীকার করি তবে স্রোতের বিপরীতে সন্তরণের মত আমাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। প্রগতির পথ রুদ্ধ হবে। অশুভ বুদ্ধির প্ররোচনায় আমরা যদি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিই তবে ইতিহাস ক্ষমা করবে না। বৃহত্তর ভদ্রেশ্বরবাসী যদি আমাদের রচিত ইতিবৃত্তের মাধ্যমে ইতিহাস নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়ে মহাভারত সৃষ্টি করে, তবেই ইতিবৃত্তকারদের ইতিবৃত্ত রচনা সার্থক।

কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাও নি তুমি,
সব তুমি তুলে লও—
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে রও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও।

পরিশিষ্ট

অঞ্চলের সুসন্তান

তেলিনীপাড়া
ভদ্রেশ্বর
মানকুণ্ডু

আমাদের অঞ্চলে সুসন্তানের অভাব ছিল না। গ্রন্থমধ্যে নানা অধ্যায়ে তাঁদের কর্মময় জীবনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যাঁদের কথা গ্রন্থমধ্যে বিস্তৃতভাবে বলার সুযোগ ছিল না, কেবলমাত্র তাঁদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হল। এই অংশে সেইসব সুসন্তানের কথা বলব, যাঁরা শুধু কর্ম নয়, ধর্ম ও সমাজসেবা করেছেন। যাঁরা দেশের দশের কথা চিন্তা করেছেন। সেইসব নমস্য, বরেণ্য ব্যক্তিদের মানবিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের পরিচয় এই অংশে দেওয়া হল।

তেলিনীপাড়া

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকেই তেলিনীপাড়া গ্রামের নবরূপকার বলা যায়। অল্প বয়সেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। বাংলা, ইংরাজী ও ফার্সীতে কাজ চালানো গোছের সামান্য শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি পাইকপাড়া গ্রামে এক ধনী ব্যবসায়ীর কর্মচারী ছিলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ ও সুপুরুষ। প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে যেসব সৈন্যদল গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড পথে মহীশূরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সেই সৈন্যদলের জনৈক ইংরেজ সেনানায়কের দৃষ্টিপথে তিনি পড়েন। বলিষ্ঠ সুপুরুষ বৈদ্যনাথকে অসামরিক কর্মচারী হিসাবে সেনানায়ক সঙ্গী হতে বলেন। দুঃসাহসী ও ভাগ্যান্বেষী বৈদ্যনাথ সৈন্যবাহিনীর অনুগামী হয়ে যুদ্ধশেষে বহু মূল্যবান অলংকার, স্বর্ণমুদ্রা ও হীরে জহরত সংগ্রহ করেন। সেইসময় স্বর্ণনির্মিত লক্ষ্মী-নারায়ণ জীউ-এর মূর্তি তাঁর হস্তগত হয়।

স্বগ্রাম মানকুণ্ডুতে ফিরে তিনি যুদ্ধসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তেলিনীপাড়া গ্রামে জমি খরিদ করে উদ্যান, পুষ্করিণী ও প্রাসাদতুল্য বাসভবন নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে সূর্যাস্ত আইনের সুযোগ গ্রহণ করে বর্ধমান মহারাজের বহু মূল্যবান জমিদারী তিনি নিলামে ক্রয় করেন। তিনি সেযুগের বিখ্যাত ইংরেজ ব্যবসায়ী মেসার্স কলভিন অ্যান্ড কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলায় জমিদারী ও কলকাতা শহরে বহু জমি ও বাড়ি ক্রয় করেন।

বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর পুত্রগণ তেলিনীপাড়া গ্রামে অন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠা করে অষ্টধাতু নির্মিত শিব অন্নপূর্ণা মূর্তি স্থাপন করেন। মন্দির সংলগ্ন নহবতখানা, অতিথিশালা, বৃহৎ জলাশয়,

গঙ্গাতীরে দেবালয় ও একটি পাকা ঘাট এবং একটি পিতলের রথ নির্মাণ করেন। বর্গী ও দস্যু তস্করের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গ্রামের সীমানায় পরিখা খনন করেন। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর সেবাপূজার জন্য দশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী দেবীর নামে দেবোত্তর করেন। গ্রামে গুরু পুরোহিত ও অন্যান্য বিশিষ্ট মানুষদের বসতি করান। চতুষ্পাঠী, পাঠশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র অন্নদাপ্রসাদ বাংলাদেশের নবজাগরণের অন্যতম ধারক ও বাহক ছিলেন। অন্নদাপ্রসাদের মাতা স্বামীর মৃত্যুর পর সহমৃতা হন। মায়ের সহমরণের ঘটনা তিনি ভুলতে পারেন নি। পরবর্তীকালে রামমোহনের সহযোদ্ধা হয়ে সতীদাহের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আনুমানিক ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তাঁর মৃত্যু।

অন্নদাপ্রসাদ অত্যন্ত সুপুরুষ ও রূপবান ছিলেন। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মত কলভিন কোম্পানীর বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দি হিসাবে কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। অন্যান্য ধনী জমিদার নন্দনের ন্যায় নিছক ভোগবিলাসে অর্থ ব্যয় না করে তিনি শিক্ষাবিস্তার, সমাজ-সংস্কার ও ধর্মসংস্কারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য তিনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কাছে ধিক্কৃত হয়েছিলেন। গ্রামের জমিদার হিসাবে অন্নদাপ্রসাদ সমাজপতি ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি তেলিনীপাড়ায় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন তখন গ্রামের সমাজপতিগণ ভৈরবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির নেতৃত্বে তাঁকে সমাজপতির পদ হতে অপসারিত করেন। অন্নদাপ্রসাদ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তেলিনীপাড়া গ্রামে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের অন্যতম পথিকৃৎ হন।

শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার ও ধর্ম আন্দোলনের ব্যাপারে অন্নদা-প্রসাদের সহযোগী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকীর কালীনাথ মুন্সী প্রভৃতি দেশবরেণ্য ব্যক্তিগণ। মূল গ্রন্থে আমরা অন্নদাপ্রসাদের বিভিন্নমুখী ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি। হুগলী জেলার অগ্রগণ্য চিন্তানায়ক হিসাবে তিনি যেসব জনহিতকর আন্দোলন করেছিলেন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন তারই ফলে এ অঞ্চলে আধুনিক চিন্তাধারার প্রবেশ লাভ ঘটেছিল।

ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য, তর্কবাচস্পতি (বন্দ্যোপাধ্যায়)— তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় জমিদারদের গুরু ও পুরোহিত বংশে ভৈরবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির জন্ম। পিতার নাম ভবানীচরণ বিদ্যা-ভূষণ। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর আনুমানিক সময়কাল ১৭৯০ খ্রীঃ থেকে ১৮৭০ খ্রীঃ। ভৈরবচন্দ্র তাঁর কৌলিক বৃত্তি চতুষ্পাঠী পরিচালনার সঙ্গে গুরু পুরোহিতের কাজ করতেন। তাঁর চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র স্থানীয় ছাত্ররাই পড়াশুনা করত না। দূর দূর স্থান থেকে আগত ছাত্রেরাও তাঁর বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতেন। তাঁর চতুষ্পাঠী পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা ও নানাবিধ সাহায্য করতেন তেলিনী-পাড়ার জমিদারবৃন্দ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ইংরাজী শিক্ষার চল হওয়ার ফলে তাঁর চতুষ্পাঠী প্রায় উঠে যাবার উপক্রম হয়। জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তেলিনীপাড়া গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলেন ও প্রতিমা পূজা বন্ধের চেষ্টা করলেন, তখন স্বধর্মনিষ্ঠ ভৈরবচন্দ্র সনাতনপন্থীদের একত্র করে অন্নদাপ্রসাদের প্রচেষ্টায় বাধা দেন।

ভৈরবচন্দ্র ঠিক রক্ষণশীল ছিলেন না। কিন্তু যখন পুরাতন চতুষ্পাঠী কেন্দ্রীক শিক্ষাবাবস্থা ও সনাতন ধর্ম বিপন্ন হল তখন সমাজ-পতি হিসাবে তাঁর প্রতিবাদ করা তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। সনাতনপন্থীদের প্রবল বাধাদানের ফলে এ অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রসার স্তিমিত হয়। কিন্তু যুগস্রোতের প্রবল প্লাবনে চতুষ্পাঠীকেন্দ্রীক শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করতে পারলেন না। ভৈরবচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষার

ক্ষেত্রে আপোস করতে বাধ্য হলেন। তাঁর নিজের পুত্ররাই কৌলিক বৃত্তি ত্যাগ করে ইংরাজী শিক্ষাগ্রহণ করে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করেন।

ভৈরবচন্দ্রের বৈষয়িক বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল। তিনি ভট্টাচার্য পরিবারকে দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে তেলিনীপাড়া বুড়ো দেওয়ানতলার একটি রাস্তা আছে। পঠনপাঠন ও শাস্ত্রচর্চার মধ্য দিয়েই তাঁর দীর্ঘজীবনের অবসান হয়।

ব্রহ্মর্ষি ভাই ব্রহ্মানন্দ—উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ না করেও যে মানুষ ব্যক্তিগত উদ্যম ও কর্মপ্রচেষ্টায় সমাজের নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি তেলিনীপাড়ার অন্যতম সুসন্তান গিরিশচন্দ্র পাল (ব্রহ্মর্ষি ভাই ব্রহ্মানন্দ)। আনুমানিক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তেলিনীপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি এন্ট্রাস পরীক্ষা পাশ করে ডাকবিভাগের চাকুরিতে নিযুক্ত হয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে কর্মরত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি তেলিনীপাড়া গ্রামে ফিরে এসে ধর্ম আন্দোলন ও নানা জনহিতকর কার্যে যুক্ত হন। জমিদার সত্যদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় ব্রহ্মর্ষি ভাই ব্রহ্মানন্দ। তিনি নিজেকে 'সক্রেটিস অব ইণ্ডিয়া' বলে প্রচার করতেন।

তাঁর বাড়িতে হাতে সেট করা প্রিণ্টিং প্রেস ছিল। তিনি ঐ প্রেসের সাহায্যে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক বহু পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—১) গীতার গলদ ২) কোরানের কেচ্ছা ৩) বুদ্ধের দুর্বুদ্ধি ৪) জাতের নামে বজ্জাতি ৫) রামায়ণের রামের পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যাওয়া অন্যায় ইত্যাদি।

ব্রহ্মর্ষি ভাই ব্রহ্মানন্দ নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। বাড়িতে সাবান প্রস্তুত করে অল্প মূল্যে সেই সাবান বিক্রি করতেন। আগ্রহী ব্যক্তিদের সাবান প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিতেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে তিনি সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন। শিশু চিকিৎসক হিসেবে

তাঁর খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। তিনি প্রতিদিন সকালে বিনা পারিশ্রমিকে রোগী দেখতেন এবং বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি ঔষুধ বিতরণ করতেন। বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার কাজে তিনি অনেকটা সাফল্য লাভ করেন। অপ্রয়োজনীয় বর্ণগুলি তিনি বর্জন করেন। এমনকি যুক্তাক্ষর বর্জন করে তিনি তাঁর পুস্তক ছাপান। বাংলা বর্ণমালার সঠিক উচ্চারণ নিয়ে তিনি অনেক ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। সুরেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের বহু পূর্বে তিনি এ বিষয়ে অনেক মৌলিক কাজ করে গেছেন। ছাপাখানা ও মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকে বাংলা অক্ষর কম্পোজ করা নিয়ে তিনি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন।

তেলিনীপাড়ার তৎকালীন জমিদার ও পুরোহিত সমাজ তাঁর বিরোধিতা করেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রসারে বাধা পেয়ে তিনি অন্য অঞ্চলের ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের বড় কেন্দ্র ছিল বংশবেড়িয়া। পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভদ্রেশ্বরেও ব্রাহ্ম সমাজের পত্তন ঘটেছিল। ব্রহ্মর্ষি ভাই ব্রহ্মানন্দ ভদ্রেশ্বর, বাঁশবেড়িয়া, জগদ্দল ইত্যাদি অঞ্চলের ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের একত্রিত করে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিদের হাত থেকে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি।

তিনি জাতিভেদ মানতেন না। সারাজীবন বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তিনি বলতেন—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র বলে কোন জাতি বা শ্রেণী নেই। জাতি বা শ্রেণী আছে দুরকম—স্ত্রী জাতি ও পুরুষ জাতি।

তাঁর পোশাক আশাক ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। ধুতি চাদর পরে খালি পায়ে চলাফেরা করতেন। বহু দূরবর্তী স্থানেও তিনি খালি পায়েই যেতেন। প্রায় ৮৫ বৎসর বয়সে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়।

তেলিনীপাড়া—ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের শত বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সাধারণ মানুষের আগ্রহের অভাবেই ঐ আন্দোলন ব্যর্থ হয়। ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের সূচনা অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে এবং সমাপ্তি ঘটে ব্রহ্মর্ষি ভাই ব্রহ্মানন্দের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। শতবর্ষব্যাপী ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে তিনজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির অবদান চিরস্মরণীয়। অন্নদাপ্রসাদ—মন্মথনাথ—ব্রহ্মর্ষি ভাই ব্রহ্মানন্দ। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত বর্ণশ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ অন্নদাপ্রসাদ ধর্মসংস্কারের যে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা বহন করার দায়িত্ব পড়েছিল নিম্নবর্ণের মানুষ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী গিরিশচন্দ্র পাল ওরফে ব্রহ্মর্ষি ভাই ব্রহ্মানন্দের ওপর।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটিকে আজ আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি। হয়ত ইচ্ছা করেই ভুলে গেছি। অগ্রগামী সমাজ নায়কের প্রতি ঔদাসীন্য ও অন্যায় আচরণের প্রতিকার করার সময় এসেছে। আমরা ব্রহ্মর্ষি ভাই ব্রহ্মানন্দকে তেলিনীপাড়ার অন্যতম সুসন্তান হিসেবে মনে করি।

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়—তেলিনীপাড়ার অন্যতম সুসন্তান সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে দমদমের নিকট কেদিহাটী গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তেলিনীপাড়া—ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা ও ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজ হতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হন। তিনি Preliminary MB+First MB পাশ করেন। Final MB পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু MB পাশ হননি। L.M.S. পাশ হন।

তিনি Opthalmic Surgery বিষয়ে অনার্স পরীক্ষায় পাশ করে সুবর্ণ পদক পান। মেডিকেল কলেজের Eye-informary তে Junior House Surgeon হিসেবে কাজ করেন এবং পরবর্তীকালে কলিকাতা

মেয়ো হাসপাতালে চাকরি পান। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কলেজ কর্তৃপক্ষ সুশীলকুমারকে Outdoor-Opthalmic-Surgeon হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হতে এক বছরের ছুটি নিয়ে তিনি বিলেত যান। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি নাগাদ বিলেতে (England) পেঁছান। ঐ মাসেই লণ্ডন থেকে এডিনবরা যান এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে F. R. C. S. পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর লণ্ডনে এসে লণ্ডনের Moor Eeild Eye Hospital-এ শিক্ষার্থী হিসাবে ভর্তি হন এবং লণ্ডন থেকে ট্রেনে অক্সফোর্ড গিয়ে D. O. পরীক্ষা দেবার জন্য Lecture attend করতে থাকেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে অক্সফোর্ড-এর D. O. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এর অল্পদিন পরেই লণ্ডনের D. O. M. S. পরীক্ষায় পাশ করেন।

অতঃপর দেশে ফিরে এসে আবার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে নিজ কার্যভার গ্রহণ করেন এবং পূর্ববৎ Private Practice ও করতে থাকেন। সুশীলকুমার ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতার উড্ স্ট্রীটে প্রাসাদোপম বাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি বসবাস করতে শুরু করেন। মিশরের কাইরো শহরে অনুষ্ঠিত All World Ophthalmic Congress এ তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় এই সম্মান অর্জন করেন নি। তিনি ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন।

পল্লীঅন্তপ্রাণ মানুষটি বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব করে সকলকে আহ্বান করতেন। বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জ্জন উপলক্ষে দুর্গাপ্রতিমাকে দুটি বড় বজরা নৌকায় প্রতিষ্ঠিত করে ষ্টীমারে টেনে নিয়ে যেত চন্দননগর ষ্ট্রাণ্ড পর্য্যন্ত। আত্মীয়, বন্ধু, স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে বাজি বাজনা সহযোগে দেবীপ্রতিমা বিসর্জন উৎসব এ অঞ্চলে অভিনব।

তেলিনীপাড়া ও সন্নিহিত অঞ্চলের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর

যোগ ছিল। বিশেষ করে তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর বিদ্যালয়, অন্নপূর্ণা পুস্তকাগার, অনাথ ভান্ডার, অন্নপূর্ণা বারোয়ারি ও নানা খেলাধূলার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল।

কর্মোপলক্ষে কলকাতাবাসী হলেও সুশীলকুমার স্বগ্রাম ও স্বদেশের মঙ্গলকেই অগ্রাধিকার দিতেন। তাঁর কলকাতার বাড়ি এ অঞ্চলের যে কোন মানুষের কাছে অবারিত দ্বার ছিল। এখানকার মানুষকে বিনা ব্যয়ে যাবতীয় চক্ষু চিকিৎসার ব্যবস্থা তিনি করে দিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সভ্য এবং কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের (বর্তমানে আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ) পরিচালনমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ডাঃ মুখোপাধ্যায় চক্ষু চিকিৎসক হিসেবে বিপুল পশার ও সুনামের অধিকারী হলেও কোনদিন নিজ গ্রামকে ভোলেন নি। শতকাজ থাকা সত্ত্বেও প্রতি শনিবার নিয়মিত তেলিনীপাড়ায় এসেছেন, গ্রামবাসীদের সঙ্গে প্রাণখোলা মেলামেশার পর সোমবার সকালে কলকাতায় ফিরে গেছেন। তাঁর জীবনে ও কর্মে ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনাদর্শ পূর্ণ প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৯৪১ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারি তাঁর জীবনাবসান হয়।

হরিসাধন পাল—তেলিনীপাড়া মনসাতলার মধুসূদন পালের কনিষ্ঠ পুত্র হরিসাধন পাল। অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি লেখাপড়া শেষ করে বৈদ্যবাটীর "বনমালী মুখোপাধ্যায় ইন্সটিট্যুশনের" প্রধান শিক্ষকরূপে দেশ ও দশের সেবা করেছেন। দীর্ঘ শিক্ষকতাজীবনে তিনি প্রচুর কৃতী ছাত্র তৈরি করেছেন। প্রকৃত ছাত্রদরদী, সদাহাস্যময়, নিরহংকারী মানুষটি সহজ সরল জীবনযাপন করেছেন। তেলিনীপাড়ার জনহিতকর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসেবা ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়।

সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন (১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ) কোন্নগরের পশ্চিমে ন' পাড়া গ্রামে

মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন সরলকুমার। পিতা কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা কল্যাণী দেবী। জন্মের দুবছরের মধ্যে মা-কে হারিয়ে ও সাত বছর বয়সে বাবাকে হারিয়ে ভাগ্যবিড়ম্বিত শিশুটি সারাজীবন ধরে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মহত্তম আদর্শকে বহন করে গড়ে তুলেছিলেন একের পর এক সেবা প্রতিষ্ঠান। সরলকুমারের পরিবার জীবিকার্জন সূত্রে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বসবাস করতেন। তাঁরা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ স্থান ত্যাগ করে নিজেদের স্থায়ী বাসভূমি তেলিনীপাড়ায় চলে আসেন।

সরলকুমার মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সসম্মানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাঁর কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে তেলিনীপাড়ার অন্যতম জমিদার চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পিতার নামাঙ্কিত কালিদাস স্মৃতি রৌপ্যপদক দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। এরপর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ ভর্ত্তি হন। ঐ কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর সাহচর্য, পঠনপাঠনের পরিবেশ ও বনেদী ঘরের সহপাঠী ছাত্রবন্ধুদের প্রভাব তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল ছিলেন তাঁর বিদ্যালয় জীবনের শিক্ষক। ছাত্রজীবনেই তিনি স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হন।

সরলকুমার স্বাধীন বৃত্তি হিসাবে ওকালতিকেই জীবিকার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন। যথাসময়ে তিনি বি, এল, পাশ করে শ্রীরামপুর মহকুমা কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ১৯৫০ সালে চন্দননগর মহকুমা কোর্ট স্থাপিত হলে সরলকুমার একই সঙ্গে চন্দননগর ও শ্রীরামপুর কোর্ট-এ ওকালতি করতেন। তিনি বর্ধমান ও কাশিমবাজার রাজ এষ্টেটে বাঁধা উকিল ছিলেন। তেলিনীপাড়ার জমিদারদের এবং এ অঞ্চলের জুটমিল সমূহের মালিক মেসার্স টমাস ডাফ কোম্পানীর নিজস্ব উকিল ছিলেন।

সরলকুমার ছিলেন পল্লীঅন্ত প্রাণ। অত্যন্ত বন্ধুবৎসল। স্বগ্রাম তেলিনীপাড়ার একদল আদর্শবাদী নিবেদিতপ্রান তরুণকে একত্র করে

গ্রামোন্নয়ণ ও সমাজসেবামূলক কাজ হিসাবে গড়ে তোলেন অন্নপূর্ণা পুস্তকাগার (১৯১২ খৃঃ)। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের অধিককাল তিনি ঐ পুস্তকাগারের সম্পাদক ছিলেন। ভদ্রেশ্বর পুরসভার করদাতা ও নাগরিকদের ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য তিনি The Telinipara Rate-payers and Peoples Association গড়ে তোলেন। যার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন তিনি। ১৯৪৫ খৃঃ স্থানীয় রাজকৃষ্ণ দাতব্য চিকিৎসালয়ের শাখা হিসাবে স্থাপিত ডাঃ সুশীল কুমার মুখার্জী চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্রটি সরলকুমারের প্রায় একক প্রচেষ্ঠায় গড়ে ওঠে।

তেলিনীপাড়া গ্রামের দুঃস্থ ব্যক্তি ও পরিবারকে সাহায্য করতে গড়ে তোলা হয় অনাথ ভান্ডার। এই অনাথ ভান্ডারের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন তিনি। সংঘগুরু মতিলাল রায় প্রতিষ্ঠিত প্রবর্তক সংঘের সঙ্গে তাঁর আজীবন যোগাযোগ ছিল। তিনি প্রবর্তক সংঘের কর্মসমিতির সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক গ্রন্থাগার সমিতির তিনি সদস্য ছিলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবর্তক ও প্রাণপুরুষ মুনীন্দ্র দেবরায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তেলিনীপাড়াস্থিত ভগ্নপ্রায় রামসীতা মন্দির জবরদখলকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করেন সরলকুমার। তিনি অবরুদ্ধ ও মৃতপ্রায় সরস্বতী নদী সংস্কারকার্যের অংশভাগী ছিলেন।

ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন তেলিনীপাড়া বাসকালে সরলকুমারের সহযোগিতায় ছন্দ সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-ভাজন হন। প্রবোধচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সম্পর্কের যোগসূত্র ছিলেন সরলকুমার। দেশশ্রী হরিহর শেঠ ও ঐতিহাসিক সুধীরকুমার মিত্রের ঘনিষ্ট সহযোগী ছিলেন।

রাজনৈতিক জগতে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের অনুগামী ছিলেন। পরবর্তী জীবনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত ও পথেই অনুগমন করেন। দেশ বিভাগের সংকটের সময় তিনি তেলিনীপাড়াতে হিন্দুমহাসভা গড়ে তার সম্পাদক হন।

ধর্ম সম্বন্ধে কোন সংস্কারবদ্ধতা তাঁর ছিল না। সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হিসাবে গীতাপাঠ দিয়েই তাঁর দৈনন্দিন জীবনেব শুরু করতেন।

গীতার বাণী ছিল তাঁর সংসার পথের পাথেয়।

১৯৫৩ খৃঃ ১১ই জুলাই তিনি সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন।

রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—তেলিনীপাড়ার সর্বজনপ্রিয় রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গত শতাব্দীর প্রায় শেষে সিমলায় জন্মগ্রহণ করেন। পাহাড়ে জন্মেছিলেন বলে তাঁর ডাক নাম হয় 'পাহাড়ী'। আর এই নামেই তিনি বেশী পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে জন্মালেও সেই শতাব্দীর আদর্শকে বুকে নিয়ে তিনি সারাজীবন সমাজসেবা করে গেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হলেও সেই পরিচয় ছাপিয়ে তাঁর মানবদরদী রূপই প্রধান হয়ে উঠেছিল। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলে কোন বিধিবদ্ধ শিক্ষাক্রমের মধ্যে তিনি আবদ্ধ থাকেন নি। প্রবল অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানপিপাসাবশত তিনি পড়েননি হেন বিষয় নেই। সাহিত্য, ইতিহাস, আঞ্চলিক ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, ভারততত্ত্ব ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাঁর অনায়াস বিচরণ ছিল। নাটক, সঙ্গীত, সাহিত্যচর্চা—সবেতেই তিনি ছিলেন সমান উৎসাহী।

অল্পবয়সে নানা পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা ও সাহিত্যসংক্রান্ত রচনা প্রকাশিত হত। ছাত্রপাঠ্য কিছু পুস্তিকাও তিনি রচনা করেন। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি ইত্যাদি যাবতীয় খেলাধুলায় তাঁর আগ্রহ ছিল। এ অঞ্চলের খেলাধুলা প্রসারে তাঁর প্রচেষ্টার শেষ ছিল না। ইণ্টারন্যাশনাল ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। অন্নপূর্ণা পুস্তকাগার, অনাথ ভাণ্ডার, খেয়ালী সংঘ ইতাদি স্থানীয় সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। চন্দননগর, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও কলিকাতার নানা সাংস্কৃতিক সংস্থা ও বহু কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় ছিল। তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

তিনি ছিলেন সকলের পাহাড়ীদা—পিতারও বটে, আবার পুত্রেরও বটে। রাজদ্বার হতে শ্মশান—সর্বত্রই তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। বিপন্ন

ও হতাশ মানুষকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়ে সঞ্জীবিত করার জাদুকরী ক্ষমতা ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন সকলের বন্ধু। অল্প-বয়সীদের সঙ্গে তিনি অল্পবয়সীর মত মিশতে পারতেন। এ অঞ্চলের সমস্ত মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গী ছিলেন তিনি। আহুত বা অনাহুত —তিনি সর্বত্রগামী। যথার্থই তিনি মানবপ্রেমিক সমাজসেবী—সমাজবন্ধু। তাঁর চরিত্র ছিল কোমলে কঠোরে। আদর্শনিষ্ঠ, দৃঢ়চিত্ত, কর্মময়, সদাহাস্যময়, রসিক মানুষটির জীবনাবসান হয় ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। এমন মানুষের অভাব আমরা পদে পদে অনুভব করি।

সেখ আকবর আলি—বিহার প্রদেশের ছাপরা নিবাসী রহমতুল্লার একমাত্র পুত্র সেখ আকবর আলি ১৯১৮ সালে তেলিনীপাড়া মারে লেনের বর্তমান বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একমাত্র পুত্র আকবর আলিকে উপযুক্তরূপে মানুষ করে তোলার আকঙ্ক্ষায় অবাঙালী হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনার জন্য তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন এবং সেখ আকবর আলি ১৯৩৭ সালে অবাঙালী মুসলিম সন্তানদের মধ্যে প্রথম 'ম্যাট্রিক' পাশের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

তিনি বাল্যবয়স থেকেই যেমন লেখাপড়ায় উৎসাহী ছিলেন, তেমনই উৎসাহী ছিলেন খেলাধুলায়। নিজ অঞ্চলের যুবকদের খেলাধুলায় অগ্রগতির জন্য ওয়াই, এম, সি, ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করলেও তাঁর উর্দু ভাষার আবৃত্তি শুনলে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, উর্দু ভাষাতেও তাঁর দখল কম ছিল না। তিনি ইংরাজী ভাষাতেও ছিলেন সমপারদর্শী।

অসাম্প্রদায়িক মনের জন্য তাঁর নিজ ধর্ম ও ভাষার বাইরেও বন্ধু-বান্ধব ছিল অনেক। তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করতেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ সালের ৩রা মার্চের দাঙ্গায় তিনি আত্মীয়-পরিবার-পরিজনসহ লাঞ্ছিত হয়েও একবারের জন্যেও কোন দাঙ্গাবাজকে প্রশ্রয় দেন নি।

তাঁর সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী উচ্চ আদর্শের জন্য তিনি একবারও না হেরে একটানা ছ'বার বিজয়ী হয়ে পুরসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি প্রথম জেতেন ১৯৩৭ সালে। সন্তোষকুমার পালচৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত পৌর পরিচালন সমিতির তিনি উপ-পৌর প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। পুর প্রধানের মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিন পুর প্রধানের পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁকে পুরসভা তথা জনসেবার কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন তাঁর শিক্ষক প্রয়াত শ্রীশ্রীধর চক্রবর্তী।

তিনি তাঁর সন্তানদের উচ্চশিক্ষা দেবার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাঁর পুত্র কন্যারা সকলেই সুশিক্ষিত। তাঁর অন্যতম কৃতী সন্তান বিখ্যাত সাংবাদিক এম. জে, আকবর। এম, জে, আকবর শুধু সাংবাদিকই নন, সুবক্তাও বটে। তিনি একসময়ে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন। রাজনৈতিক জগতে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর তিনি ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

৭৫ বছর বয়সেও সেখ আকবর আলি এই অঞ্চলের সমস্ত সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাঁর সুরুচিসম্মত ব্যবহারে এ অঞ্চলের সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ। আমরা তাঁর শতায়ু কামনা করি।

কৃষ্ণপটী

নারায়ণচন্দ্র পাল—তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর ' উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক নারায়ণচন্দ্র পাল ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তেলিনীপাড়ার কৃষ্ণপটী এলাকায় তিনি বাস করতেন। তিনি তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর বিদ্যালয়ের প্রাক্তন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ যখন ভদ্রেশ্বরে আসেন, তখন যেসব ছাত্রের দল তাঁর ঘোড়ার গাড়ি টেনেছিলেন, নারায়ণচন্দ্র পাল ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

তিনি অত্যন্ত সহজসরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন।

ছাত্রবৎসল শিক্ষকরূপে তিনি সারাজীবন ছাত্রদের পুত্রতুল্য স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়েছেন। সাবলীল পঠনপাঠন ভঙ্গির জন্য তিনি ছাত্রসমাজের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। নিরীহ ও ধর্মভীরু মানুষটি সারাজীবন পরের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করেছেন। 'বুনো রামনাথের' আদর্শকে বুকে নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করে গেছেন। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ৮২ বৎসর বয়সে এই ছাত্রদরদী শিক্ষকের জীবনাবসান হয়।

মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান কামারপুকুরের সন্নিকটে বেঙ্গাই গ্রামে রামকৃষ্ণদেবের দীক্ষাগুরুর বংশে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের (১৮৯২ খ্রীঃ) ২১শে পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল বি. এ, কাব্য--ব্যাকরণ--পাণিণি--জ্যোতিতীর্থ। ভদ্রেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ে সংকৃত ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে প্রায় ৩২ বছর তিনি শিক্ষকতা করেন। সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার জন্য তাঁর বাড়িতে একটি সরকার অনুমোদিত চতুষ্পাঠী বা 'টোল' ছিল। বহু দূরবর্তী স্থানের ছাত্ররাও সেই 'টোলে' পড়াশুনা করতে আসতেন। তিনি গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার গণক ছিলেন এবং নিজে জ্যোতিষ চর্চা করতেন। তিনি ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে (১৯৪৭ খ্রীঃ) কৃষ্ণপটীর নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন।

ছাত্রদরদী আদর্শ শিক্ষক হিসাবে এ অঞ্চলের জনসাধারণ তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। তাঁর চরিত্রমাধুর্যে সকলে ছিলেন মুগ্ধ। তাঁর পিতার নামাঙ্কিত "সূর্য চতুষ্পাঠী" এ অঞ্চলের সংস্কৃত শিক্ষার সর্বশেষ প্রতিষ্ঠান।

ভদ্রেশ্বর ও গৌরহাটী

আত্মারাম সরকার ও বনমালী সরকার—মূল গ্রন্থের ব্যবসাবাণিজ্য ও ব্যবসায়ী পরিবার প্রসঙ্গে এঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। বনমালী সরকার সরকারী উচ্চপদাধিকারী ছিলেন, এটাই তাঁর বড় পরিচয় নয়। তিনি কলকাতাস্থ হিন্দু সমাজের কর্তা

ছিলেন। সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য তিনি তাঁর অর্জিত বহু অর্থ দানধ্যান করে ব্যয় করেন। কলকাতার বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির, বিষ্ণুমন্দির ও শিবমন্দির নির্মাণ করেন। বাগবাজারে গঙ্গার তীরে স্নানার্থীদের জন্য ঘাট নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর জনহিতকর কাজের জন্য তিনি কিংবদন্তী পুরুষ হিসাবে আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হন।

অ্যান্টনি কবিয়াল—তাঁর পুরো নাম ছিল হেন্সম্যান অ্যান্টনি। জাতে পোর্তুগীজ। তাই সাধারণ লোক তাঁর পদবী দিয়েছিল 'ফিরিঙ্গি'। বাবার নাম অজ্ঞাত। তবে জানা যায় যে, ব্যবসা উপলক্ষে তিনি ফরাসডাঙা-চন্দননগরে বসবাস করতেন। হেন্সম্যানের দাদার নাম মিস্টার কেলি। যিনি কালসাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। হেন্সম্যান অ্যান্টনির পূর্বপুরুষের বাস ছিল কলকাতায়। আদি কলকাতার জমিদার বিদ্যাধর রায়চৌধুরীর নায়েব ছিলেন অ্যান্টনি নামে একজন পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি, যিনি হেন্সম্যান অ্যান্টনির ঠাকুর্দা, যাঁর নামে কলকাতায় অ্যান্টনি বাগান লেন নামে একটি রাস্তা আছে। ফরাসডাঙা-চন্দননগরের গরিটি বা গৌরহাটী অঞ্চলে ছিল হেন্সম্যানের বাড়ি। তিনি নুনের ব্যবসা করতেন।

আমরা সকলেই হেন্সম্যান অ্যান্টনিকে 'কবিয়াল' হিসাবেই জানি। মুখে মুখে গান বেঁধে তখনই তাতে সুর দিয়ে আসরে গাইতে পারতেন। তাঁর গানের গলা ছিল খুব মিষ্টি। উপস্থিতবুদ্ধি ছিল চমৎকার। তৎকালীন অনেক তাবড় তাবড় কবিয়ালকে যেমন হরু ঠাকুর, রাম বসু, ঠাকুরদাস সিং প্রমুখদের আসরে পরাজিত করে জয়ের মালা তিনি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কবিয়াল রাম বসু একটি কবিগানের আসরে অ্যান্টনিকে কোণঠাসা করার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—"সাহেব, মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি। / ও তোর পাদরী সাহেব শুনতে পেলে গালে দেবে চুনকালি।" জবাবে অ্যান্টনি বলেছিলেন—"খ্রীষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই। / শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এ ও কোথা শুনি নাই।" এখানেই অ্যান্টনির উদার ধর্মমত, অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয়

পাই। তিনি ইউরোপীয় পোষাক ত্যাগ করে ধুতি পাঞ্জাবী পরে আসরে নামতেন। বন্ধুদের নিয়ে তিনি নিজে একটি কবিদল গঠন করেন। তিনি হিন্দুদের শাস্ত্র-পুরাণ পাঠ করেছিলেন। জেনেছিলেন বিভিন্ন দেবদেবীর কাহিনী। কৃষ্টে ও খ্রীষ্টে কোন ভেদ নাই—এমন অসাধারণ ভাবনা আমাদের মনে পরবর্তী সময়ের রামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করায়।

হেন্সম্যানের ধর্মীয় জীবন ছিল অদ্ভুত। তিনি খ্রীষ্টানদের কাছে ছিলেন হিন্দু, আর হিন্দুদের কাছে খ্রীষ্টান। না হিন্দু, না খ্রীষ্টান, এমন উদারপন্থী যুবকদের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করতেন। এখানেই তিনি জাতপাত ও ব্যবসায়িক আর্থিক গণ্ডিকে অতিক্রম করে সাধারণের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন।

শোনা যায়, অ্যাণ্টনি এক হিন্দু বিধবার প্রেমে পড়ে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। আবার কেউ বলেন, সতীদাহের চিতা থেকে বধূটিকে উদ্ধার করে তিনি তাঁকে সহধর্মিনীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা রমণীকে সামাজিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিবাহ করা, অ্যাণ্টনি বাংলার নবজাগরণের নারীমুক্তি আন্দোলনের অনেক পূর্বেই করেছিলেন। এখানেই অ্যাণ্টনির মানবতাবাদী নারীদরদী মনের প্রকাশ। তখনই তিনি নারীসমাজের বন্ধনমুক্তির কথা চিন্তা করে-ছিলেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, সম্ভবত, অ্যাণ্টনি তাঁর গৌরহাটীর (গরিটির) বাড়িতে, পত্নীর অনুরোধেই হোক বা নিজমন থেকেই হোক প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন। স্থানীয় নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি দুর্গাপূজা বন্ধ করেন নি। তাঁর মত ছিল দেবতা কোন লোকের বা সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। সকলেই সমভাবে তাঁর আরাধনা করার অধিকারী। এই মনোভাব নিয়েই তিনি কলকাতার বৌবাজারে ফিরিঙ্গী কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠা করেন।

অ্যাণ্টনি কবিয়াল ছিলেন প্রেমিক পুরুষ। ব্যবসাবুদ্ধি তাঁর ছিল না। তাই লবণব্যবসা ত্যাগ করে তিনি পদ রচনার প্রেমে ও নারীপ্রেমে পড়েছিলেন। পড়েছিলেন সঙ্গীতের প্রেমে। পত্নীর ইচ্ছাকে সম্মান

দিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা, পূজা প্রবর্তন করে তাঁর পত্নী প্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন। সমাজের বিরুদ্ধেই তাঁর সংগ্রাম। প্রতিকূলতাই তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি। তাই তিনি আমাদের স্মরণীয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে তাঁর জন্ম এবং ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ (১২৪৩ বঙ্গাব্দ) নাগাদ তাঁর মৃত্যু।

শ্যামদাস মণ্ডল—ভদ্রেশ্বরের অন্যতম সুসন্তান শ্যামদাস মণ্ডল ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে (১২৩৫ বঙ্গাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই পরিচয় বড় নয়। তিনি ধার্মিক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে আমাদের কাছে চিরস্মরণীয়। ভদ্রেশ্বরগঞ্জ অঞ্চলে জগদ্ধাত্রীতলার চতুষ্পার্শ্বে ও গঙ্গার তীরে তাঁর বিভিন্ন ধরণের ব্যবসার গদি ও গুদাম ছিল। রেলপথ স্থাপনের পরে ভদ্রেশ্বর স্টেশন চালু করা ও ভদ্রেশ্বর স্টেশন হতে ভদ্রেশ্বর ঘাট পর্যন্ত মালগাড়ির লাইন চালু করার তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ভদ্রেশ্বর ঘাটে যে বিরাট গুডস্ সাইডিং আছে তা তৈরির মূলে তাঁর অবদান সর্বাধিক।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে যখন অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় তখন এ অঞ্চলের ছাত্রদের ইংরাজী শিক্ষার যে অসুবিধা দেখা দেয়, তা দূর করার জন্য তিনি তাঁর একটি গুদামঘরে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হয়। আর ১২৮১ বঙ্গাব্দের (১৮৭৪ খ্রীঃ) ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তিনি শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ-এর ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ ঠাকুরবাড়ির সন্নিকটে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় (ইং ১৮৯২ খ্রীঃ) জনগণের সুবিধার্থে একটি স্নানের পাকাঘাট স্থাপন করেন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ি পরিচালনা করেন তাঁর উত্তরপুরুষগণের দ্বারা নির্বাচিত ট্রাস্টি বোর্ড। ঐ পরিচালন সমিতি শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর

জীউ-এর নিত্যসেবা ও রাস, দোল, ঝুলন ইত্যাদি পালপার্বন যথারীতি পালন করে থাকেন। ৭০ দশকের মাঝামাঝি শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ-এর কষ্টিপাথর নির্মিত যে আসল বিগ্রহ ছিল, তা চুরি যায়। এখনো পর্যন্ত সেই সুন্দর বিগ্রহের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। স্বধর্মনিষ্ঠ শিক্ষাবিদ এই মানুষটি ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৭ই বৈশাখ (ইং ১৯০০ খ্রীঃ) পরলোক-গমন করেন

প্রেমচাঁদ শিরোমণি (বন্দ্যোপাধ্যায়)—ভদ্রেশ্বর একদিন চতুষ্পাঠী ও পণ্ডিত সমাজের জন্য বিখ্যাত ছিল। সেই পাণ্ডিত্যের শেষ উজ্জ্বল নিদর্শন প্রেমচাঁদ শিরোমণি মহাশয়। তাঁর পাণ্ডিত্য ও চরিত্র মাহাত্ম্যের জন্য তিনি ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের নিকট হতে "শিরোমণি" উপাধি পান। তাঁর ভাইও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের নিকট হতে "চূড়ামণি" উপাধি পান। ভদ্রেশ্বর মাঝেরপাড়ায় তাঁর বাসস্থানের পার্শ্ববর্তী রাস্তার নাম দেওয়া হয়েছে "প্রেমচাঁদ শিরোমণি লেন।" তাঁর বংশে অনেক শিক্ষিত গুণী সন্তান জন্মেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (উকিল), সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (উকিল), শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস—ভদ্রেশ্বরের অন্যতম সুসন্তান কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস তাঁর ধর্মবিশ্বাসে অবিচল থেকে বিশ্বাস পদবী সার্থক করেছেন। সনাতন হিন্দুধর্মের পরিমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে উদার প্রগতিশীল ব্রাহ্মধর্ম-মত গ্রহণ করে বীরোচিত অদম্য মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। মানবিক ও সামাজিক গুণমণ্ডিত মানুষটি অবিচল চিত্তে মানব সেবা করে গেছেন। "ব্রহ্মসংগীত" রচয়িতা হিসাবে তিনি ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করেছিলেন।

স্বামী অভয়ানন্দগিরি মহারাজ—বলাগড়ের হরিনারায়ণ চট্টো-পাধ্যায় কর্মসূত্রে ভদ্রেশ্বরগঞ্জের ব্যবসায়ী দে'বাবুদের হিসাবের খাতা লিখতেন। অন্নের জন্য দাসত্ব তাঁর মন মেনে নিতে পারেনি। তাই মাঝে মাঝে কর্ম ত্যাগ করে গঙ্গার তীরে উদাসীনের মত বসে থাকতেন। ফলে কপালে তিরস্কার জুটলো। রামপ্রসাদের মত তিনি

কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি চাইলেন। তাঁর সহৃদয় নিয়োগকর্তারা তাঁর স্বাধীনতায় আর হস্তক্ষেপ করলেন না।

প্রকৃতিপ্রেমিক মানুষটি গঙ্গার তীরের উদার সৌন্দর্যের মধ্যে কিছুটা শান্তি পেলেও শান্ত হলেন না। তাঁর সংসার বন্ধনমুক্তির প্রথম প্রচেষ্টা কাউকে কিছু না বলে দেশী মাঝি মাল্লাদের সঙ্গে সুন্দরবনে ভেসে গেলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত তিনিও প্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে দেখতে পেতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে অভাবের মধ্যেও সুখের সংসার ছিল। স্ত্রীর অকালমৃত্যু তাঁকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি দিল। মুক্তির সন্ধানে পরিব্রাজকের ব্রত গ্রহণ করে অন্বেষণ করলেন তাঁর মনের মানুষকে। পাগলের মত সারা উত্তর ভারত খুঁজেছেন। একটিই লক্ষ্য—কোথায় পাবো তারে—"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"। শেষ পর্যন্ত সাক্ষাৎ পাওয়া গেল শিবপুরী কাশীধামে চলমান শিব ত্রৈলঙ্গস্বামীর। রতনে রতন চেনে। ত্রৈলঙ্গস্বামী তাঁকে গড়েপিঠে নেবার ভার দিলেন প্রধান শিষ্য কালীচরণকে। শুরু হল পুনরায় পরিব্রাজকের জীবন। ত্রৈলঙ্গস্বামী তাঁর নাম দিয়েছিলেন—স্বামী অভয়ানন্দ। দীর্ঘ বারো বৎসরের পরিব্রাজকের জীবনে হিমালয়, কৈলাস, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে কত সাধু-সন্তের সাহচর্য পেলেন, যা অন্বেষণ করছিলেন, তাকে পেলেন। কিন্তু সেই পরমপ্রাপ্তিকে নিজের জন্য না রেখে বিলিয়ে দেবার জন্য আবার ফিরে এলেন ভদ্রেশ্বরে।

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ফিরে এলেন সংসারে। কিন্তু নিজ সংসারে নয়। বিশ্বসংসারে। সন্ন্যাসীরা গৃহত্যাগ করে পূর্বাশ্রমের সমস্ত পরিচয় ভুলে যান। কিন্তু অভয়ানন্দ মহারাজ ভদ্রেশ্বরের উদার উন্মুক্ত গঙ্গার তীর ও ভদ্রেশ্বরবাসীর স্নেহের টানে হিমালয়বাসী না হয়ে ভদ্রেশ্বরবাসী হলেন। সংসারত্যাগী শুষ্ক আচার সর্বস্ব সন্ন্যাসী নয়, তিনি মানবপ্রেমিক বিশ্বপ্রেমিক সন্ন্যাসী। ভদ্রেশ্বরে গড়ে উঠল শিষ্য, ভক্ত অনুরাগীদের নিয়ে বৃহৎ সংসার। রোগে, শোকে বিপন্ন আর্তকে

তিনি রক্ষা করলেন। গৃহী আর সন্ন্যাসীর মধ্যে একটা পার্থক্য থাকে, তিনি সেই পার্থক্য ভেঙে দিয়ে কাউকে সন্তান, কাউকে মাতা, কাউকে কন্যা—নানা পারিবারিক সম্পর্কে বেঁধে এক বৃহৎ ধর্ম সংসারের কর্তা হলেন।

স্বামীজী মহারাজ কল্পনাপ্রবণ কবিমনের অধিকারী ছিলেন। বন্ধন-অসহিষ্ণুতা ও নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্যে তাঁর রোম্যাণ্টিক কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কবি, সংগীত রচয়িতা ও সুগায়ক ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা বা গানগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক রসের সঙ্গে সাহিত্যরসের সমন্বয় ঘটেছে। পরবর্তীকালে তাঁর রচিত গানগুলি যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি নামকরণ করেছিলেন—'ফক্‌রে হরের গান'। নামকরণের মধ্যেই তাঁর রসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ফকির হরিনারায়ণের গান তাঁর রসিক মনের স্পর্শ পেয়ে হয়ে উঠল—'ফক্‌রে হরের গান'।

তাঁর রচিত গানগুলি সংখ্যায় বেশী নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। তাঁর গানগুলি পড়লেই রামপ্রসাদের 'প্রসাদী সংগীত' এর কথা মনে পড়ে। সেই একই রকম সহজ সরল ভাষা, সংসার জীবনের অতি পরিচিত উপমা, অলংকার, শ্লেষ, ব্যঙ্গ রঙ্গপূর্ণ তির্যক ভাষা, অথচ গভীর আধ্যাত্মিক ভাব।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় রূপে তাঁর আবির্ভাব এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভয়ানন্দগিরি মহারাজ রূপে তাঁর তিরোভাব। জনৈক ভদ্রেশ্বরবাসিনী তাঁর কন্যার নিকট তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন—"প্রণাম কর্, জীবন্ত ভদ্রেশ্বরনাথ শিব"। সত্যই শিবোপম মহাপুরুষের সাধনস্থল হিসেবে ভদ্রেশ্বর ও এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ধন্য ও কৃতার্থ।

মানকুণ্ডু

মথুরামোহন খাঁ—মানকুণ্ডুর সুসন্তান মথুরামোহন খাঁ মূলত লবণ

ব্যবসায়ী হলেও তাঁর সামাজিক অবদান কম নয়। লোকে তাঁকে আদর করে 'নুনে খাঁ' বলে ডাকতো তাঁর লাবণ্যমণ্ডিত চরিত্রের জন্য। তিনি দুটি শিবমন্দির নির্মাণ করেন। তেলিনীপাড়ার গঙ্গার তীরে পশ্চিম-বাহিনী নামক স্থানে স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য তিনি চাঁদনিযুক্ত পাকাঘাট ও গঙ্গাযাত্রীর ঘর নির্মাণ করে দেন। গঙ্গা-সরস্বতী যোগা-যোগকারী খাঁন রোড সংস্কার তাঁর অন্যতম কীর্তি। বিভিন্ন জনহিতকর কাজে তাঁর অবদান তাঁকে আমাদের নিকট চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

কানাইলাল খাঁ—মানকুণ্ডুর খাঁন পরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান হলেন কানাইলাল খাঁ। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জাতীয়তাবাদী এই ব্যবসায়ী কর্ম ও চরিত্র মাহাত্ম্যে কলিকাতার ব্যবসায়ী সমাজের কর্ণধার হয়েছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদী মনোভাব বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলপথ স্থাপন, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স স্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। শিক্ষা-বিস্তার ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। গঙ্গার ঘাট পুনরুদ্ধার, রাস্তা সংস্কার, বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি নানা সমাজসেবামূলক কাজ তিনি করেন। চন্দননগর বঙ্গবিদ্যালয়, তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ ও তেলিনীপাড়া

তেলিনীপাড়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তথা ঠাকুরবাড়ির সম্পর্ক কত গভীর ছিল সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের বিশেষ ধারণা নেই। চন্দননগরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক সম্বন্ধে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কিন্তু একথা অনেকেই জানেন না যে, তেলিনীপাড়ার সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির চন্দননগরের সঙ্গে সম্পর্ক। বর্তমানে চন্দননগরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে তেলিনীপাড়ার নাম উচ্চারিত হয় মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তেলিনীপাড়ার সম্পর্কের আন্তরিকতা ও গভীরতা সম্বন্ধে ব্যাপক মূল্যায়ন আজও হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তেলিনীপাড়ার সম্পর্ক বংশানুক্রমিক এবং পারিবারিক—আকস্মিক নয়। ফরাসী সরকারের দেওয়ান হিসাবে ঠাকুরবাড়ির পাথুরিয়াঘাটা শাখার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সঙ্গে চন্দননগরের প্রথম যোগাযোগ ঘটে। পরে দর্পনারায়ণ ও তৎপুত্র গোপীমোহনের গঙ্গার পরপারে মূলাজোড়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলে চন্দননগরের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক শিথিল হয়। তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র অভয়াচরণ, কাশীনাথ ও রামধন জমিদার ও ব্যবসায়ী হিসাবে দর্পনারায়ণের পুত্র গোপীমোহনের সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই নব সম্পর্কই পুরুষানুক্রমে প্রসন্নকুমার ও দ্বারকানাথের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটা—উভয় ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তেলিনীপাড়ার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের সুদৃঢ় ও আত্মিক বন্ধনে পরিণত হয়। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য উভয় বংশের বংশতালিকা দেওয়া হল।

পঞ্চানন ঠাকুর (কুশারি)
জয়রাম
দর্পনারায়ণ ১
নীলমণি ১
গোপীমোহন ২
রামমণি ২
প্রসন্নকুমার ৩
দ্বারকানাথ ৩
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ৪
যতীন্দ্রমোহন ৪
দেবেন্দ্রনাথ ৪
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ৫
রবীন্দ্রনাথ ৫
তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা
বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১
অভয়াচরণ ২
রামধন ২
কাশীনাথ ২
অন্নদাপ্রসাদ ৩
সত্যদয়াল ৪
সত্যপ্রসন্ন ৪
সত্যকুমার ৫
সত্যশান্তি ৫
সত্যবিকাশ ৬
সত্যকিশোর ৬
সত্যব্রত ৬
সত্যশরণ ৬

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পুরাতন সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সংবাদটি এইরূপ—
"জমিদারদের সমাজ—জমিদারদের এক সভা স্থাপনার্থে গত সোমবার মান্য জমিদারগণের এক বৈঠক হয়। ঐ সভাতেই উপস্থিত মান্যবরেরা বিশেষতঃ—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত বাহাদুর, সত্যচরণ ঘোষাল, রামকমল সেন, মুন্সী আমীর, কালীনাথ রায়চৌধুরী ও অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, সেযুগের বাংলাদেশের অগ্রগণ্য জমিদার, ব্যবসায়ী ও সমাজের বিশিষ্ট নেতারা জমিদারদের সমস্যা সমাধানের জন্য যে সমাজ (সমিতি) গঠন করেন তাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের ধারণা, অভয়াচরণই প্রথম জমিদার ও ব্যবসায়ী হিসাবে বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে একাসনে বসার সম্মান অর্জন করেন। দ্বিতীয়ত পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরীর সঙ্গে অভয়াচরণই সম্পর্ক স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এই সম্পর্কের সূত্র ধরে অভয়াচরণের পুত্র অন্নদাপ্রসাদের সঙ্গে উভয় ঠাকুরবাড়ি ও টাকীর কালীনাথ রায়চৌধুরীর সম্পর্ক আরো গাঢ় ও ঘনিষ্ঠ হয়।

অভয়াচরণের পুত্র অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয় ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ইতিপূর্বে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তারই সূত্র ধরে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে সম্মিলিত উদ্যোগে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক ক্রিয়াকলাপে ব্রতী হন। শিক্ষাবিস্তার, আত্মীয়সভা তথা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও নানা সমাজসেবামূলক কাজে অন্নদাপ্রসাদের সহযোগী ছিলেন দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার, কালীনাথ ও রামমোহন। আমরা মূল গ্রন্থে এবং 'অঞ্চলের সুসন্তান' অধ্যায়ে ঐ সহযোগিতার বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। দ্বারকানাথের উত্তরপুরুষেরা যেমন দেবেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এবং

অন্নদাপ্রসাদের পুত্র সত্যপ্রসন্ন, সত্যদয়াল ও পরবর্তী বংশধর সত্যশান্তি, সত্যকুমার, সত্যবিকাশ প্রভৃতির সঙ্গে উভয় পরিবারের বংশানুক্রমিক সৌহার্দ্য বজায় ছিল। গ্রন্থমধ্যে সাহিত্য, সংগীত ও নাট্যচর্চায় ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়দের যোগাযোগ ও সম্পর্কের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

রামমোহন, দ্বারকানাথ ও কালীনাথ রায়চৌধুরী অন্নদাপ্রসাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে তেলিনীপাড়ায় অন্নদাপ্রসাদের বসতবাটী "লালকুঠি" তে বহুবার পদার্পণ করেছেন। কলকাতার বাইরে মফঃস্বলে টাকীতেই প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ উদ্যোগের পিছনে ছিলেন রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ ও রাজা রামমোহন রায়। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন কালীনাথ ও তাঁর ভাই বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী। টাকীর ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্নদাপ্রসাদ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বগ্রাম তেলিনীপাড়ায় একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয় স্থাপনের পশ্চাতে বহু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি যথা: প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী এবং রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন পরলোকগমন করেন বলে এই প্রচেষ্টায় তাঁর আশীর্বাদ থাকলেও দৈহিক উপস্থিতি সম্ভব ছিল না।

পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুর ও তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমসাময়িক। চন্দননগরের ফরাসী সরকারের দেওয়ান এবং লবণ ব্যবসায়ীরূপে চন্দননগরে দর্পনারায়ণের সাময়িক বাসস্থান ছিল। দর্পনারায়ণ ও বৈদ্যনাথ সমসাময়িক ও সমপর্যায়ের জমিদার, ব্যবসায়ী ছিলেন। সে কারণে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব থাকার জন্য আমরা সেই সম্পর্ক ধরে অগ্রসর হতে চাই না। বৈদ্যনাথ-পুত্র অভয়াচরণ ও কাশীনাথের সঙ্গে জমিদার ও ব্যবসায়ী হিসাবে উভয় ঠাকুরবাড়ির সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্নদাপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উদাহরণ হিসাবে শ্রীপান্থ 'দেবদাসী' গ্রন্থে জানাচ্ছেন—"সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের আইন পাশ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২৯ খ্রীঃ। বেণ্টিঙ্কের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য পরের বছর ১৬ই জানুয়ারি (১৬।১।১৮৩০) টাউন হলে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন রাজা রামমোহন রায়। একটি বাংলা ও আর একটি ইংরেজি অভিনন্দনপত্র (বিষয়বস্তু এক) দেওয়া হয়। স্বাক্ষরদানকারীদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন মাত্র জনা কয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকির কালীনাথ রায়, তেলিনীপাড়ার জমিদার বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।"—

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর জমিদারগণের সমিতি—"ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের" মাধ্যমে সেযুগের অগ্রগণ্য জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুর, উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ ও তাঁর পুত্র সত্যদয়ালের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, দ্বারকানাথ ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট কাবা, বাঁধা পাগড়ি পরার নিয়ম ভাঙার জন্য রামমোহন নিজে দ্বারকানাথকে ভর্ৎসনা না করে অন্নদাপ্রসাদকে এ ব্যাপারে দ্বারকানাথকে সচেতন হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। দ্বারকানাথ ও অন্নদাপ্রসাদের ঘনিষ্ঠতার জন্যই রামমোহনের এই অনুরোধ।

তেলিনীপাড়ার "লালকুঠি" বাসভবনে রামমোহন, দ্বারকানাথ ও কালীনাথ রায়চৌধুরী নিয়মিত যাতায়াত করতেন। দ্বারকানাথ ও অন্নদাপ্রসাদের বন্ধুত্ব পারিবারিক বন্ধুত্বে পরিণত হয়। অন্নদাপ্রসাদের দুই পুত্র সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই বংশানুক্রমিক পারিবারিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব সূত্রেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যপ্রসন্নের চন্দননগর হাটখোলার 'রিভারভিউ' বাড়িটি দীর্ঘদিন যাবত ভাড়া করে রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি এবং তাঁর পরিবার পরিজনেরা ঐ বাড়িতে বিশ্রাম নেবার জন্য আসতেন।

প্রশান্তকুমার পালের 'রবিজীবনী' গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২৮৫ বঙ্গাব্দে, ইং ১৮৭৯ খ্রীঃ) বৈশাখ

মাসের শুরুতেই চন্দননগরে বাস করতে যান। এই সময় তিনি দুমাসের কিছু বেশি সময় সেখানে কাটান। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন তিনি চন্দননগর, চুঁচুড়া অঞ্চলে কাটান।"

দেবেন্দ্রনাথ চন্দননগরের 'রিভারভিউ' বাড়িতেই বাস করতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে সর্বপ্রথম গঙ্গার ধারে যে বাড়িতে উঠেছিলেন—সেই বাড়ির নাম 'রিভারভিউ' এবং তেলিনীপাড়ার জমিদাররা ঐ বাড়ির মালিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার প্রথম উন্মেষ তেলিনীপাড়ার জমিদারদের 'রিভারভিউ' বাড়িতে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত ঐ 'রিভারভিউ' বাড়িতেই হয়।

রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে বহুবার এসেছেন, কিন্তু তেলিনীপাড়ায় মাত্র তিনবার এসেছেন। প্রথমবার আসেন ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে। প্রবর্তক সংঘ যাত্রাপথে তেলিনীপাড়ায় গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে স্থানীয় জনসাধারণের অভ্যর্থনা গ্রহণের জন্য ক্ষণিকের বিরতি। দ্বিতীয়বার আসেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অথবা ১৬ই ফেব্রুয়ারী, বঙ্গাব্দ ১৩৪২ এর ফাল্গুন। বোলপুর যাত্রাপথে তিনি লালকুঠিতে দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তৃতীয় এবং শেষবার আসেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন। লালকুঠিতে সম্বর্ধনা গ্রহণ অনুষ্ঠানে।

রবীন্দ্রনাথের তেলিনীপাড়া আগমন বসবাসের জন্য নয়। পূর্ব পারিবারিক সম্পর্কের জের হিসাবে সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লালকুঠি' বাড়িতে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের তেলিনীপাড়ায় অবস্থিতি স্বল্পকালীন হলেও তার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য তেলিনীপাড়াবাসীর কাছে কম নয়। রবীন্দ্রনাথ তিনবার তেলিনীপাড়ায় এসেছিলেন। সর্ব-প্রথম ৪ঠা মে, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৩৪ বঙ্গাব্দে) প্রবর্তক সঙ্ঘে যাবার পথে চন্দননগরে প্রবেশের প্রাক্কালে তেলিনীপাড়ার অধিবাসীরা তাঁকে মোটর গাড়ি থেকে নামিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বোলপুর যাবার পথে লালকুঠিতে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিয়েছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন

তারিখে সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে চন্দননগর হতে তেলিনী-পাড়ার লালকুঠিতে সারাদিন ও গভীর রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করেন। রবীন্দ্রনাথের তেলিনীপাড়া আগমন সংক্রান্ত তথ্য হরিহর শেঠ মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা সেই গ্রন্থ হতে তেলিনীপাড়া সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে দিলাম।

হরিহরবাবু 'প্রবর্তক সঙ্ঘে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রসঙ্গে লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমভিব্যাহারে প্রাতে সাড়ে সাত ঘটিকার সময় মটর যোগে চন্দননগরে আগমন করেন। প্রবেশ পথ বারাসাতে এবং অন্যান্য কয়েক স্থানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তোরণ নির্মিত ও সজ্জিত হইয়াছিল।" তেলিনীপাড়াবাসী যেদিন প্রাতঃকালে সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নেতৃত্বে তেলিনীপাড়ার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ রবীন্দ্রনাথকে চন্দননগর প্রবেশের প্রাক্কালে তেলিনীপাড়ার সীমান্তে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেই সম্বর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছিলেন, তা আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। আমাদের গ্রামে রবীন্দ্রনাথের পদস্পর্শ সম্ভবত এই প্রথম। সময়টা ২১শে বৈশাখ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, শুভ অক্ষয়তৃতীয়ার দিন। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তক সঙ্ঘের অক্ষয়তৃতীয়া মেলার দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে চন্দননগরে এসেছিলেন।

দ্বিতীয়বার ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বোলপুর যাবার পথে তেলিনীপাড়ার লালকুঠিতে যে অবস্থান করেছিলেন, তার সংবাদ দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'নবসঙ্ঘ' পত্রিকার ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ১০ই ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—"গত সপ্তাহে বোলপুর যাইবার পথে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিয়া যান। জমিদার শ্রীসত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লালকুঠি'তে তিনি সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন।" আবার 'Daily News' পত্রিকায় সংবাদটি এভাবে প্রকাশিত হয়েছিল—"The poet Tagore on his way to Santiniketan took his midday rest at Lalkuthi." রবীন্দ্রনাথের 'লালকুঠি'তে স্বল্পকালীন বিশ্রামের

একটি সুন্দর চিত্র মৃণাল ঘোষ 'রবি স্মরণিকা' নামক প্রবন্ধে এঁকেছেন। যে প্রবন্ধটি ১৩৬৭ সালের 'প্রবর্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। —"আমাদের মনে পড়ে সেবার শান্তিনিকেতনে যাইবার পথে রবীন্দ্রনাথ ফরাসী চন্দননগরের উপকণ্ঠে 'লালকুঠি'তে তেলিনীপাড়ার জমিদার শ্রীসত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। গৃহস্বামী দ্বিতলের সুসজ্জিত হলঘরে কবির বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উপরে উঠিতে নাচার। ····· গাড়ির মধ্যে বসেই লালকুঠির দক্ষিণ পশ্চিমের সুন্দর শান বাঁধানো ঘাটযুক্ত পুষ্করিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'বাঃ তোমার ঐ লিচুবনের ওপাশে ফুলবাগানের ধারে বেশ সুন্দর সরোবর বানিয়েছ ত'। চলো ঐদিকে গাছতলায় তোমার ঐ ঘনসবুজ কুঞ্জবনের শীতল ছায়ায় এখন বিশ্রাম নেওয়া যাক।' সত্যসত্যই রবীন্দ্রনাথ লতাকুঞ্জের স্নিগ্ধ পরিবেশে সারা দ্বিপ্রহর কাটিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের পদস্পর্শপূত স্থানটিতে একটি বেদি নির্মাণ করান।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন চন্দননগরে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাগুলি লিখেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম 'শোভনার বিবাহ উপলক্ষে' কবিতা। এই কবিতাটি রচনার পিছনে যে ইতিহাস, তার সঙ্গে তেলিনীপাড়ার যোগ আছে। ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথ গঙ্গাবক্ষে পদ্মাবোটে এবং পাতালকুঠিতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর লেখার সুবিধার জন্য একটি টেবিল, একটি সুন্দর বাতিদান তেলিনীপাড়ার জমিদার বাড়ি হতে তাঁর ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছিল। শ্বেত পাথরের টেবিলটি দেন সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাতিদান দেন সত্যশরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনাচক্রে ঐ বাতিদানটি অসাবধানবশত ভেঙে যায়। ঐ ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত লজ্জিত হন। যদিও জমিদারবাবুরা ঘটনাটিকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেন, কিন্তু লজ্জিত রবীন্দ্রনাথ অন্য উপায়ে ক্ষতিপূরণ করার মানসে সত্যশরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী সুধীরা দেবীকে তাঁর ভাইঝি উত্তরপাড়ার জমিদার অবনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী শোভনা দেবীর বিবাহ উপলক্ষে একটি কবিতা লিখে দেন। (১৩ই

আষাঢ়, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ ; ২৬শে জুন, ১৯৩৫ খ্রীঃ) বিবাহ উপলক্ষে কবিতাটি রচিত হলেও কবিতাটি উপলক্ষকে অতিক্রম করে কাব্যরসমণ্ডিত হয়েছে।

১৯৩৫ সালের মে-জুন মাসে যখন রবীন্দ্রনাথ প্রায় দুই মাস পাতাল বাড়িতে অবস্থান করছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসচিব শ্রীঅনিল কুমার চন্দ ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী রাণী চন্দ তাঁর সংগী ছিলেন। ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথ শ্রান্তি দূর করতে ও শান্তি পেতে বিশ্রাম নেবার উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছিলেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রা কেমন চলছিল, তার বিবরণী পাই শ্রীবীরেন নাথ রচিত 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' রচনায়। ঐ রচনায় সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কত স্নেহের সম্পর্ক ছিল, তার কিছু উদাহরণ আছে। সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সরস আলোচনায় রবীন্দ্র চরিত্রের স্নেহমধুর দিকটি ফুটে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কত গভীরভাবে ভালোবাসতেন।

১৯৩৫ সালের মে-জুন মাসে যখন চন্দননগরে গঙ্গাবক্ষে "পদ্মা" বজরায় ও পাতালবাড়িতে অবস্থান করেছিলেন, সেই সময়ের রবীন্দ্রনাথের গতিবিধি সম্বন্ধে হরিহর শেঠ মহাশয় 'রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—"তিনি বিশেষ কোথাও যাইতেন না। তেলিনীপাড়ার সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আহবানে কয়েকদিন 'লালকুঠি' ভবনে গিয়াছিলেন এবং একদিন তাঁহার বহু বন্ধুবান্ধবপূর্ণ বাটীর প্রাঙ্গণে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। তাঁহার বাসস্থানের অতি সন্নিকট শ্রীসত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাটীতে ও কবির পরম স্নেহভাজন শান্তিনিকেতনের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ স্বর্গতঃ গৌরগোপাল ঘোষের বাটীতে তাঁহার বেড়াইতে যাওয়ার কথাও জানা যায়।"

হরিহরবাবুর তথ্য হতে জানা যায় যে, ঐ দুই মাসের অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ সত্যবিকাশবাবুর আমন্ত্রণে কয়েকদিন তাঁর 'লালকুঠি' ভবনে গিয়েছিলেন। ঐ কয়েকদিনের মধ্যে একটি বিশেষ দিনে রবীন্দ্রনাথকে

তেলিনীপাড়ায় অভিনন্দিত করা হয়েছিল। তৃতীয়ত তেলিনীপাড়ার জমিদার সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাড়িতে তিনি প্রায়ই গানবাজনা শুনতে (তেলিনীপাড়াবাসী কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা সূত্রে এই তথ্যটি সমর্থিত হয়) যেতেন।

হরিহর শেঠ উল্লেখিত তেলিনীপাড়ায় রবীন্দ্র সম্বর্ধনার কিছুটা চিত্র পাই মৃণাল ঘোষের 'রবীন্দ্র স্মরণিকা' প্রবন্ধে। তিনি প্রসঙ্গটি এইভাবে বর্ণনা করেছেন— "...... আর একবার এই লালকুঠিতে রবীন্দ্র সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। সেদিন বাংলার অগ্নিযুগের দেশ-বিশ্রুত-কীর্তি শহীদ কানাইলালের গুরু ৺চারুচন্দ্র রায় কবিকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। যতদূর মনে পড়ে রবীন্দ্র-স্নেহ-ধন্যা শ্রীমতী রাণী চন্দও সেদিন লালকুঠিতে উপস্থিত ছিলেন। এই লালকুঠিতেই গৃহস্বামীর শিক্ষাগুরু বর্তমানে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ প্রবোধচন্দ্র সেন কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। এখানে বসেই তিনি রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্বন্ধে 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা' ইত্যাদি মাসিক পত্রিকায় কয়েকটি মূল্যবান আলোচনা প্রকাশ করেন। তখন শুনেছিলাম যে, বিশ্বকবি শান্তিনিকেতনে স্বয়ং ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্রের সহিত তাঁহার ছন্দসৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করেছিলেন। সত্তর বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে কলিকাতার টাউন হলে এবং ইডেন গার্ডেনে যে মনোজ্ঞ রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে (ইডেন গার্ডেনের সভায়) মনীষী প্রবোধচন্দ্র সেন 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' নামক তাঁর সদ্য প্রকাশিত যে গ্রন্থখানি কবিসম্রাটকে 'শ্রদ্ধার্ঘ্য'স্বরূপ নিবেদন করেন, তা এই লালকুঠিতেই রচিত হয়।"

মৃণালবাবুর বক্তব্য থেকে সম্বর্ধনাসভার পূর্ণাঙ্গ না হলেও আংশিক চিত্র পাওয়া গেল। ঐ সম্বর্ধনাসভা সম্বন্ধে আমন্ত্রণকারী গৃহকর্তা সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গোধূলি, শ্রাবণ ১৩৭৭' সংখ্যায় 'লালকুঠিতে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা' শীর্ষক প্রবন্ধে সম্বর্ধনার আরো বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ঐ রচনাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে

আমরা সম্পূর্ণ রচনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

লালকুঠিতে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা

সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইং ১৯৩৫ সালের ৩০শে জুন রবিবার দিন রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করে আমার বাড়ী 'লালকুঠী' তেলিনীপাড়ায় এনে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান হয়। ঐ উৎসবে আমার পক্ষের নিমন্ত্রিত বহু অভ্যাগত ছাড়া কবিগুরুর ইচ্ছামত তাঁর পক্ষের বহু এদেশীয় ও বিদেশীয় রবীন্দ্র বিভূতি মুগ্ধ নর ও নারীগণ আমার আমন্ত্রণে আমার গৃহে এসে আমাকে ও সেইসঙ্গে আমার নগরকে ধন্য করে গেছেন।

আমাদের বংশের এক ভদ্রলোক 'কালোবাবু' নামেই তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি বিখ্যাত টপ্পা গায়ক ও সারেঙ্গী বাদক সরি মিঞার প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এই কালোবাবু কবির সম্বর্ধনাসভায় কবিকে টপ্পা গান শোনান। তাছাড়া এখানে একটি সৌখীন ভদ্রলোকের যাত্রা পার্টি ছিল; তাঁরা অতি চমৎকারভাবে 'বিদ্যাসুন্দর' পালা অভিনয় করে কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। এই উৎসবে কয়েকটি মাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া বেশীরভাগ সময় 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার পালাগানে আসর ভরপুর ছিল। টপ্পা ও 'বিদ্যাসুন্দর' এর বাছাই করা অনেক অংশ ও তাহার অন্তর্গত ৺কালীস্তোত্র ও ৺কালীর গান কবি শুনতে চাওয়ায় এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কবি মন্ত্রমুগ্ধের মত শেষ পর্যন্ত ঐসব গান শুনেছিলেন ও পালা অভিনয় দেখেছিলেন। তখন আমার বাড়ীতে বা নগরে ইলেকট্রিক ছিল না। জুন মাসের দারুণ গরমে আমরা ভীড়ের মধ্যে অস্থির হয়ে উঠলেও কবি তালপাখার হাওয়ার আশ্রয়ে একাসনে স্থিরভাবে বসে তাঁর ধৈর্যের, সঙ্গীতপ্রিয়তার ও আমাদের প্রতি যে গভীর স্নেহের পরিচয় দিয়েছিলেন সে পরিচয় দান তাঁর মত মহামানবের পক্ষেই সম্ভব। কবির মত ধৈর্যশীল গুণী শ্রোতা পাওয়ায় সভাশেষে গায়ক গায়িকারা কবির কাছে গিয়ে তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন যে তাঁদের সাধনা সার্থক হয়েছে, তাঁরা ধন্য

হয়েছেন।

কবি যদিও এবাড়ীর গৃহিনীকে নানারকম মুখরোচক খাদ্যের ও পানীয়ের ফর্মাশ করেছিলেন এবং কৌতুকের জন্য গৃহিনী যখন ফর্মাস মত সবকিছু প্রস্তুত করে তাঁর সামনে হাজির করেছিলেন তখন তো তিনি অবাক! কবি সব দেখে হেসে বললেন "যা চাইব সব পাব জানলে বাঘের দুধের ক্ষীরটা করতে বলতাম।" এরকম হাস্য পরিহাসের মধ্যে ঠাকুরের দৃষ্টি ভোগের মত কবির পান ও ভোজন শেষ হল। অনেক রাত্রে তিনি চন্দননগরে ফিরে গেলেন। শারীরিক কষ্ট ও আমাদের সমস্ত স্নেহের উপদ্রব হাসিমুখে সহ্য করে সেদিন তিনি আমাদের চির স্নেহপাশে বেঁধে গেলেন। ('গোধূলি' সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্যে ও অনুমতিক্রমে 'গোধূলি' শ্রাবণ ১৩৭৭ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

সত্যবিকাশবাবুর বর্ণনা অনুযায়ী ঐ দিনের সম্বর্ধনাসভায় তাঁর পক্ষের আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়াও কবিগুরুর ইচ্ছামত বহু এদেশীয় ও বিদেশীর ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' অধ্যায়ে সংগীত ও নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কালোবাবুর টপ্পা গান প্রীতি ও বিদ্যাসুন্দর পালা দেখার আগ্রহ সম্পর্ক যা উল্লেখ করেছি, তা সত্যবিকাশবাবুর বক্তব্যের দ্বারা সমর্থিত হল। সত্যবিকাশবাবুর রচনায় উল্লিখিত "সৌখীন ভদ্রলোক" হচ্ছেন তেলিনীপাড়া পাইকপাড়া নিবাসী শ্যামাচরণ দাস মহাশয়। যাঁব কথা গ্রন্থমধ্যে অভিনয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

হরিহর শেঠ মহাশয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্থানীয় গ্রন্থকারদের রচিত গ্রন্থের প্রসঙ্গে লিখেছেন যে প্রবোধচন্দ্র সেন তেলিনীপাড়ায় 'লালকুঠি'তে বাসকালে 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' ও 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন খুলনা জেলার দৌলতপুর ব্রজলাল হিন্দু এ্যাকাডেমির অধ্যাপক

হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহশিক্ষক রূপে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুই বৎসর তেলিনীপাড়ায় অবস্থান করেন। সেই সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্বন্ধে 'প্রবাসী' ও 'বিচিত্রা' পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খ্যাতনামা পণ্ডিত ও মনীষী বেনীমাধব বড়ুয়া কিছুদিন চন্দননগরে বাস করেছিলেন। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের আলাপ পরিচয় হয়। সেই পরিচয়ের সূত্রে সত্যবিকাশের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে শ্রীবড়ুয়া তাঁর স্নেহভাজন ছাত্র প্রবোধচন্দ্র সেনকে সত্যবিকাশের গৃহশিক্ষক হিসাবে মনোনীত করেন।

রবীন্দ্রনাথ--প্রবোধচন্দ্র--তেলিনীপাড়ার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। সে সম্বন্ধে প্রবোচন্দ্র সেন "ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন--"রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানের সময় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে "বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান" নামে একটি প্রবন্ধ লিখি (১৩৩৮ সাল / ১৯৩১ খ্রীঃ) .... এই প্রবন্ধ রচনা ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশের সময় আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বিকাশচন্দ্র নন্দীর সাগ্রহ আনুকূল্য নানা কারণে আমার পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই সময়ে হুগলী তেলিনীপাড়াবাসী আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও বহু সহায়তা পেয়েছি।"

রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্র সম্পর্ক স্থাপিত হবার পিছনে তেলিনীপাড়ার ভূমিকা আরো স্পষ্ট হবে প্রবোধচন্দ্রের লিখিত একটি পত্রের মাধ্যমে। পোস্টকার্ডের পত্রটি ২৬শে জুন, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাঁচীর হিনু থেকে প্রবোধচন্দ্র লেখেন তাঁর তেলিনীপাড়াবাসী বন্ধু সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পত্রটির গুরুত্ব বিবেচনা করা আমরা অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে দিলাম।

C-112, Hinoo
P. O.—Hinoo
Ranchi
26.6.35

প্রিয় কালুদা,

আপনার চিঠিখানি পেয়ে খুব সুখী হয়েছি। গগাইর চিঠি পেয়েছি। সে রবিবাবুকে তাব বাড়ীতে আনবে ৩০ এ জুন। সে উপলক্ষে সে আমাকেও যেতে লিখেছে।……গগাইর ঠিকানায় রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি ও একটি প্রবন্ধ পাঠালাম।…… রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি অনিলবাবুর সঙ্গে বুঝি আপনার আলাপ হয়েছে। অনিলবাবু বিকাশের বিশেষ বন্ধু এবং বিকাশের মারফতে আমাকেও জানেন। আরেকবার দেখা হলে তাকে আমার নমস্কার জানাবেন।……… আপনার পত্র পেলে সুখী হব। গগাইর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ কি বলেন ইত্যাদি জানাবেন।……

ইতি
প্রীতিবদ্ধ
প্রবোধচন্দ্র সেন

[পত্রে উল্লেখিত সম্বোধন 'কালুদা'—সরলকুমারের ডাকনাম কালু। বিকাশ (নন্দী) সরলকুমার ও প্রবোধচন্দ্রের বন্ধু। অনিল (চন্দ) ও তাঁর স্ত্রী রানী চন্দের সঙ্গে সরলকুমারেব আলাপ পরিচয় ছিল।]

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখের রবীন্দ্রনাথের 'লালকুঠি' তে (তেলিনীপাড়া) আগমন ও তাঁর সম্বর্ধনা সর্বস্তরে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল নানা রচনা ও পোস্টকার্ডের উদ্ধৃতির মাধ্যমে তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হল।

রবীন্দ্রনাথের মনে জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়দের সঙ্গে তেলিনীপাড়া গ্রামের সাধারণ মানুষের স্থান ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নায়ক মধুসূদনের মায়ের বাড়ী যে তেলিনীপাড়া

সেকথা বলতে তিনি ভোলেন নি। নায়িকা কুমুদিনীর নিকট—"একদিন তেলিনীপাড়ার বুড়ি তিনকড়ি এসে কুমুদিনীর মুখের সামনেই বলে বসল—"হ্যাঁ গা, আমাদের কুমুর কপালে কেমন রাজা জুটল ?"
মেয়েরা উৎসুক হয়ে তিনকড়িকে ধরে বসে বলে—"বরকে জানতে নাকি ?
"জানতুম না ? ওর মা যে আমাদের পাড়ার মেয়ে, পুরুত চক্রবর্তীদের ঘরের।"—(যোগাযোগ)

রবীন্দ্রনাথের মনে তেলিনীপাড়ার স্থান ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তেলিনীপাড়ার সম্পর্কের কথা ভুলতে বসেছি। কালধর্মে যে কোন উজ্জ্বল বস্তু ঔজ্জ্বল্য হারায় যদি না তার নিয়মিত মার্জনা হয়। ম্লান রবীন্দ্রস্মৃতিকে চির উজ্জ্বল করে ধরে রাখতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন রবীন্দ্র-স্মৃতি চর্চা ও রবীন্দ্র-স্মৃতি-পূত স্থানের রক্ষণ। রবীন্দ্র পদার্পণ ধন্য 'লালকুঠি'তে স্মারকফলক ও সংলগ্ন নবনির্মিত পথের "রবীন্দ্র স্মৃতি সরণী" নামকরণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এ বিষয়ে তৎপর হওয়ার জন্য ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের অধিবাসী ও ভদ্রেশ্বর পুরসভার সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১২৫তম বর্ষের আলোকে ভদ্রেশ্বর পৌরসভা

দেবগোপাল চক্রবর্তী
পৌরপ্রধান,
ভদ্রেশ্বর পৌরসভা

আমাদের পৌরসভা ১২৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ফেলে আসা ১২৪ বছরের ঘটনাগুলি স্মরণ করতে হয় এবং একই সঙ্গে আমাদের দেশে পৌরব্যবস্থার সূত্রপাত ও তার ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করতে হয়। অতীতের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে আমরা আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎকে আয়ত্ত করার পথে সার্থকভাবে অগ্রসর হতে পারব —এই বিশ্বাস রেখেই কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনার অবতারণা করছি।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদেশী বণিকেরা জলপথে হুগলী নদী দিয়ে বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে আসে ও নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অল্প সময়ের ব্যবধানে রিষড়া, শ্রীরামপুর, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, হুগলী, ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি স্থানে কুঠি বা ব্যবসার ঘাঁটি নির্মাণ করে। পরবর্তীকালে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিক গোষ্ঠীর হাতে অপ্রত্যাশিত রাষ্ট্র ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। ইতিমধ্যে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমস মাদ্রাজে একটি পৌরসভা গঠনের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। এটাই ভারতবর্ষের পৌরব্যবস্থার সূত্রপাত বলে গণ্য হতে পারে। পরে ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'রয়্যাল চার্টার' এর মাধ্যমে বোম্বাই ও কলিকাতা নগরীর জন্যে অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে "বেঙ্গল অ্যাক্ট-টেন" নামক প্রথম পৌর আইন

তৈরি হয় যা প্রধানত সৈনিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এই আইনটি ভারতীয় আইন হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র বাংলাতেই এর প্রয়োগ হয়। কিন্তু শহরবাসীদের কাছ থেকে কর সংগ্রহের মাধ্যমে এই আইন প্রয়োগ করতে নানা অসুবিধা দেখা দেওয়ায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে "এ্যাক্ট ২৬" নামক সর্বভারতীয় পৌর আইনের সূচনা হয়। এই আইনবলে প্রধানত সৈনিকদের যাতায়াত, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদির সুবিধার জন্য নগর কমিটি গঠিত হয়। শহরবাসীর সম্পত্তির মূল্যায়ন ও করধার্য করার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব এই কমিটিগুলির উপর বর্তায়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'টাউন পুলিশ অ্যাক্ট' চালু করার ভেতর দিয়ে পূর্বতন আইন পরিবর্তিত হয়, যেখানে চৌকিদারদের বেতন দানের জন্য সম্পত্তি মূল্যায়নের ব্যবস্থা ছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পরে ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে নীলচাষকে কেন্দ্র করে সাহেবদের যে অত্যাচার শুরু হয় তাতে কেবলমাত্র চাষীরা নয় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বঙ্গবাসীরাও যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হন। ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের এই নীল বিদ্রোহের জোয়ার বাংলার চেতনায় এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি করে।

এই পটভূমিকায় বিদেশী শাসক ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিল অ্যাক্ট তৈরি করে বিভিন্ন প্রদেশে কাউন্সিল গঠনের কাজ শুরু করে এবং এদেশে সৈন্যবাহিনীর স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে স্থানীয় ভাবেই যাতে অর্থ সংগ্রহ হতে পারে তার জন্য 'আর্মি স্যানিটারি কমিশন' গঠন করে। উক্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী "ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট ১৮৬৪" রচিত হয়। এই আইন পৌরব্যবস্থার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা জাগাতে সাহায্য করে। কিন্তু এই আইনেও নগর কমিটিগুলির ক্ষমতা খুব সীমিত থাকে। পুলিশী ব্যবস্থার জন্য খরচের দায়িত্ব থাকলেও পুলিশী প্রশাসনের দায়িত্ব কমিটির হাতে ছিল না। ইংরাজ শক্তি তাদের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের ইচ্ছায় শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়কে প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। কিছু লোক এরই মধ্যে দেশ ও দশের

সেবা করতে সচেষ্ট হয়।

১৮৫৭ থেকে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উত্তরপাড়া-কোতরং, শ্রীরামপুর, কোন্নগর, ভদ্রেশ্বর, হুগলী প্রভৃতি স্থানে কিছু ধনী জমিদার, প্রগতিশীল সমাজসেবী ও নব্য শিক্ষিত তরুণদের আগ্রহে এবং সহযোগিতায় পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী ইংরাজী ১-৪-১৮৬৯ তারিখে ভদ্রেশ্বর পৌরসভা গঠিত হয়।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হলে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ-এর মতে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কণ্ঠস্বর এতে প্রতিফলিত হয় এবং জাতীয় আন্দোলনের ফলে ইংরেজ সরকার পৌর আইন সংস্কারে বাধ্য হয়। তাই ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত লর্ড রিপনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় আবার পরিবর্তন আসে এবং পৌর প্রশাসনে কিছুটা গতিবেগ আনার চেষ্টা করা হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট' রচিত হয়।

১৮৮২ থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যথা বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন, বিকেন্দ্রীকরণের জন্য কমিশন নিয়োগ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি জাতীয় জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং স্বায়ত্ত শাসনের জন্য সংগ্রামকেও তীব্রতর করে। 'গভঃ অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯১৯' অনুযায়ী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মন্ত্রীসভায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও চিকিৎসা বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে স্থান করে নেন। পরে স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রীবিজয় প্রসাদ সিংহরায় আনীত বিল অনুযায়ী 'বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট ১৯৩২', ১-১২-১৯৩২ তারিখ থেকে চালু হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে পৌর প্রতিষ্ঠান-গুলিকে যাঁরা সফলভাবে ব্যবহার করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নাম স্মরণীয়। দেশের বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত পৌর সংস্থাগুলি তাঁদের ভূমিকাকে অনুসরণ করে জাতীয় আন্দোলনে নতুন উপাদান জুগিয়েছিল।

স্বাধীনোত্তর যুগে নগরজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসার জন্য 'বঙ্গীয় পৌর আইন ১৯৩২' এর আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বারেবারে অনুভূত হলেও ১৯৬৯ সালে এবং ১৯৭৭ সালে কিছুটা সদর্থক চেষ্টার বাইরে আর কিছু হয়নি। অনেক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও গণউদ্যোগকে সুনিশ্চিত করার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী আইনের আমূল পরিবর্তন সাধনে প্রয়াসী হয়েছে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেলে এ আইন কার্যকর হবে। ইতিমধ্যে সংবিধানের ৭৪তম সংশোধনী অনুযায়ী একদিকে যেমন পৌর-ব্যবস্থা সম্পর্কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হয়েছে অপরদিকে তেমনি এই সংশোধনীর মধ্যে কিছু আশঙ্কার দিক থেকে গেছে। নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই পৌর আন্দোলনকে বিকশিত করতে হবে।

আমাদের পৌরসভার ১৯-৬-১৯১০ তারিখের সিদ্ধান্তে পশ্চিমদিকে ঘুঙ্গিরখাল পর্যন্ত পৌর এলাকা সম্প্রসারণের কথা হয়েছিল। কিন্তু কালের আবর্তে তা পরিণতি লাভ করেনি। পরিবর্তে ১৯১৭ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে আমাদের পৌরসভার একটি অংশ চাঁপদানী পৌরসভা নামে পৃথক হয়ে যায়। যুগের প্রয়োজনে এবং মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বর্তমানে পূর্বতন বিঘাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি অংশ আমাদের পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে কোন নাগরিক ১৯১০ সালের উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে মনে করে নিশ্চয় বিস্মিত হবেন।

পশ্চিম বাংলায় ১৯৭৭ সাল থেকে যেভাবে পৌরসভাগুলিকে বিকশিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, তাতে আমাদের বিশ্বাস ১২৫তম বর্ষ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমরা নাগরিকদের সঙ্গে যৌথভাবে এলাকার উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে পারি।

একনজরে ভদ্রেশ্বর পৌরসভা

১৯৯৩-৯৪

আয়তন	৬.৪৭৫ বর্গ কিমি
ওয়ার্ড সংখ্যা	১৬
জনসংখ্যা	৭৩,০০০
যোত সংখ্যা	৯,৬০০
করদাতা	৭,৭৪৩
রাস্তার আলোর সংখ্যা	১,০১৭
নলকূপ	১৬৩
জলকল	৫৭০
যোতের পানীয় জল সরবরাহ সংখ্যা	২,৭০০
গভীর নলকূপ	১৮
আদায়কৃত কর	১২,৯৬,১৩৭-৭৩
চিকিৎসালয়	২
অ্যাম্বুলেন্স	১
হেলথ্ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট	২
বহির্বিভাগীয় বহুমুখী চিকিৎসাকেন্দ্র	১
মাতৃমঙ্গলকেন্দ্র	১
ট্রাক্টর	৪+২
আবর্জনাবাহী শকট	৩
অফিস গাড়ি	১
রিক্সাভ্যান	৩১
পানীয় জলের ট্যাঙ্কার	৫
পৌরভবন পুনর্নির্মাণ	২ বার
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫

সার কারখানা	১
রাস্তা	১৩৯.৬৭৫ কিমি
অবসরভাতাপ্রাপ্ত কর্মচারীর সংখ্যা	৪৪
খেলার মাঠ	৭
নিজস্ব পুকুর	৩
পৌরবাজার	৩
বৈদ্যুতিক চুল্লি	১
শ্মশানঘাট	১
ফেরিঘাট	১

সংযোজন

তথ্য জমা দেওয়ার সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পরে এবং মুদ্রণ কার্যের শেষ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ যথাস্থানে মুদ্রিত করা সম্ভব হয়নি। তথ্যগুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত করা হল।

দ্বাদশ অধ্যায়

খেলাধূলা ও শরীরচর্চা

পূর্বের ধারাবাহিকতা সূত্রে বর্তমান সময় পর্যন্ত খেলাধূলা ও শরীরচর্চা অব্যাহত আছে। ক্রীড়ার বৈচিত্র্য ও ক্রীড়াবিদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়েছে। বিষয় ও সংখ্যার অগ্রগতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিম্নলিখিত তথ্যের সমাবেশ ঘটানো হল।

ভদ্রেশ্বর

কাঁচামিঠা—ভদ্রেশ্বর মানিকনগর অঞ্চলের সার্বজনীন দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরে (১৯৫৭ খ্রীঃ) কয়েকজন তরুণ খেলাধূলা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য 'কাঁচামিঠা' নামে এক সংগঠন গড়ে তোলেন। ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলাধূলার সঙ্গে নাচ, গান, আবৃত্তি ইত্যাদি সংস্কৃতিচর্চা চলতে থাকে। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থার নতুন নামকরণ হয় ইউনাইটেড স্পোর্টিং এ্যাণ্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ হতে শ্রীরামপুর সাবডিভিশ্যানাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ফুটবল ও অন্যান্য ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করে আসছে। ১৯৯১ সালের ২৬শে অক্টোবর থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত সুভাষ ময়দানে সর্বভারতীয় সিনিয়র জাতীয় খো-খো প্রতিযোগিতা এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ২৬টি রাজ্যের পুরুষ ও মহিলা বিভাগে ৪৯টি দল অংশগ্রহণ করে। এই সংস্থার কিছু খেলোয়াড় কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংস্থায় খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে সুনাম অর্জন করেছেন।

অগ্রণী—১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভদ্রেশ্বর ঋষি বঙ্কিম অ্যাভিনিউতে 'অগ্রণী' সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থার ব্যবস্থাপনায় নানা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ভদ্রেশ্বরে মহিলা ও পুরুষ সিনিয়র হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

নিউ অ্যাথলেটিক ক্লাব—ভদ্রেশ্বর ঋষি বঙ্কিম অ্যাভিনিউতে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাব প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। যাঁর সঙ্গে পরিচয়সূত্রে বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী কয়েকবার তাঁর বাসভবনে এসেছিলেন। এই সংস্থা শ্রীরামপুর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত থেকে ফুটবল ও অন্যান্য খেলাধুলার চর্চা করে আসছে। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে থাইল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের পক্ষে যোগদান করেন এই সংস্থার সভ্য গোপীনাথ দাস। শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংস্থার প্রাক্তন খেলোয়াড় ভারতের বিভিন্ন ফুটবল আসরে অংশগ্রহণ করেছেন। সংস্থার তত্ত্বাবধানে একটি যোগব্যায়াম কেন্দ্র আছে। যেখানে প্রায় দুই শত জন ছাত্রছাত্রীকে যোগাসন শিক্ষা দেওয়া হয়।

জাগরণী সংঘ—ভদ্রেশ্বর ঋষি বঙ্কিম অ্যাভিনিউতে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্থা গড়ে ওঠে। শরীরচর্চাই এই সংস্থার মূল লক্ষ্য। সংস্থার সভ্য প্রদীপ দাস ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় স্তরে ও ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রদীপ্ত দাস বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্তরে শরীরচর্চায় সুনাম অর্জন করে। প্রদীপ্ত দাস প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান লাভ করে। বর্তমানে সংস্থার তত্ত্বাবধানে একটি সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

লিচুবাগান ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিষদ—ভদ্রেশ্বর লিচুবাগানে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাটি স্থাপিত হয়। এই সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন হয়।

সঞ্চিতা সব পেয়েছির আসর—এই সংস্থাটি ভদ্রেশ্বর ঋষি বঙ্কিম অ্যাভিনিউতে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ১৫০ জন সোনার কাঠি ভাইবোন এবং ৫০ জন কর্মী ভাইবোন এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। এখানে শরীরচর্চা, যোগাসন, লোকনৃত্য, ব্রতচারী, কুচকাওয়াজ এবং খো-খো খেলা শেখানো হয়। সংস্থার ভাইবোনেরা ১৪০০ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ তারিখে অনুষ্ঠিত সারা ভারত সব পেয়েছির আসর কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল।

ফ্রেণ্ডস এ্যাসোসিয়েশন, ভদ্রেশ্বর—৪৫ বৎসর পূর্বে ভদ্রেশ্বরনাথ মন্দিরের নিকটে এই সংস্থা গড়ে ওঠে। পূর্বে ফুটবল ও ভলিবল খেলার মধ্যেই এর ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল। ফুটবল খেলায় শ্রীরামপুর সাবডিভিশন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাবের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয়েছে এবং ঐ গৃহে খেলাধুলা ছাড়াও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রী ক্লাবের গ্রন্থাগার শাখার উদ্বোধন করেছেন।

নব কিশলয় সংঘ, ভদ্রেশ্বর—১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভদ্রেশ্বর ভট্টাচার্যপাড়া লেনে নব কিশলয় সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। সংস্থার সভ্যগণ নিয়মিত ফুটবল খেলার চর্চা করেন। স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্যে ও সভ্যদের কঠোর পরিশ্রমে বর্তমানে নিজস্ব ক্লাবঘর নির্মিত হয়েছে।

ভদ্রেশ্বর জাতীয় শক্তি সংঘ—১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। সংস্থার নিজস্ব খেলার মাঠ ও ক্লাবগৃহ নির্মিত হয়। খেলাধুলার মাধ্যমে সভ্যসভ্যাদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ নাগরিক হিসেবে গড়ার চেষ্টা করা হয়।

দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাব, ভদ্রেশ্বর—১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ চণ্ডীচরণ চ্যাটার্জী রোডে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় ক্লাবের সভ্যরা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। "খেয়ালী সংঘ" ভদ্রেশ্বর খেলাধুলার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে।

অরবিন্দ সংঘ, পালবাগান—অরবিন্দপল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অরবিন্দ

সংঘ শিক্ষা ও শরীরচর্চার কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত। এরই পাশাপাশি গড়ে উঠেছে বিবেকানন্দ সংঘ ও ছাত্র সংঘ। প্রতিটি সংস্থা শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শরীরচর্চা ও খেলাধূলার অগ্রগতির জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শরীরচর্চা ও খেলাধূলায় ভদ্রেশ্বরের সুনাম যাঁরা বৃদ্ধি করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি শুধু বাংলারই নন, অলিম্পিকেও ফুটবল খেলায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। শ্রীবিমান লাহিড়ী (ইউ, এ, সি,), অজয় লাহিড়ী, হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় (ইউ, এ, সি,), শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিমাই দে (কাঁচামিঠা) ফুটবল খেলায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভদ্রেশ্বরের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ভলিবল খেলায় সুধীন সুর (ইউ, এ, সি, ভদ্রেশ্বর) পশ্চিমবাংলা তথা ভারতীয় দলে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

মানকুণ্ডু / কৃষ্ণপট্টী

মানকুণ্ডু স্পোর্টিং ক্লাব—এই সংস্থা মানকুণ্ডু এলাকায় শতাধিক বর্ষব্যাপী ক্রীড়াচর্চার কেন্দ্র। এখানে প্রধানত ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল খেলা হয়। খেলাধূলা ব্যতীত এ অঞ্চলে সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক নানা কাজকর্মেও সংস্থাটি নিযুক্ত আছে।

বিজয় সংঘ—প্রধানত শরীরচর্চার কেন্দ্র হিসাবে এর পরিচিতি। সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বলাকা স্পোর্টিং সেণ্টার—মানকুণ্ডু মৌজার পালপাড়া এলাকায় ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামপুর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত প্রথম বিভাগে সংস্থার ক্রীড়াবিদগণ ফুটবল খেলে। সংস্থা কুশলী ফুটবল খেলোয়াড় তৈরি করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। সংস্থায় কুশলী কিছু খেলোয়াড় কলকাতার বিভিন্ন ফুটবল ক্লাবে প্রশংসার সঙ্গে খেলাধূলা করে।

এগিয়ে চলো সংঘ—পালপাড়া/চন্ডীতলা এলাকার সংস্থা। খেলাধূলা, সংস্কৃতিচর্চা ও সমাজসেবামূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত।

ইউথ সোসাইটি - শান্তিনগর এলাকায় এই সংস্থাটি অবস্থিত। এলাকার তরুণ সমাজকে ক্রীড়াচর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সমাজসেবামূলক কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে।

নব সংঘ—সংস্থাটি কৃষ্ণপটী অঞ্চলে অবস্থিত। খেলাধূলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সমাজসেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত।

পালপাড়া কল্যাণ সংঘ, মানকুন্ডুর কল্যাণ সংঘ, কৃষ্ণপটী ও পালপাড়ার নেতাজী ব্যায়াম সমিতি, চন্ডীতলার বিবেকানন্দ সংঘ, সরকারপুকুর লেনের মিলনতীর্থ, ডাঃ সি, সি, সি, রোডে ভারতজ্যোতি সংঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি খেলাধূলা, সংস্কৃতিচর্চা এবং সমাজসেবামূলক সংস্থা হিসাবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

আশিস মন্ডল—বিগত কয়েক বৎসর যাবত জাতীয় খেলায় ১১০ মিটার হার্ডলসের প্রথম স্থানটি দখলে রেখেছিলেন কৃষ্ণপটীর আশিস মন্ডল। সাফ গেমসে (বাংলাদেশে) ঐ বিভাগের স্বর্ণপদক আশিস মন্ডল দখল করে আমাদের অঞ্চলের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।

কুমকুম মন্ডল—মানকুন্ডু অঞ্চলের মহিলা ক্রীড়াবিদ ৪০০ মিটার হার্ডলসে একসময় সেরা প্রতিযোগী ছিলেন। ভারতবিখ্যাত পি, টি, ঊষার পর তাঁর নাম বিবেচিত হত। উন্নত ক্রীড়া পারদর্শীতার জন্য তিনি আমাদের অঞ্চলকে খেলাধূলার জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কুন্তল দলুই অ্যাথলেটিক্স বিভাগে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তেলিনীপাড়া

তেলিনীপাড়া অঞ্চলে ফুটবল খেলার উন্নত মানকে যাঁরা বজায় রেখেছিলেন, তাঁদের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাথলেটিক ক্লাবকে কেন্দ্র করে এইসব খেলোয়াড়রা বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হতেই ফুটবল খেলায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁরা

প্রায় সকলেই খালি পায়ে ফুটবল খেলতেন। তাঁদের সংগে ফুটবলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত জুটমিলের সাহেব খেলোয়াড়দের মধ্যে। বুট পরা সাহেব খেলোয়াড়দের খালি পা খেলোয়াড়রা হারিয়ে দিলে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হত।

বিগত যুগের ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দুলালকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, হরিশঙ্কর বটব্যাল, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, দুলালচন্দ্র দাস, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত সরকার, বিমল চট্টোপাধ্যায়, সুনীত মুখোপাধ্যায়, প্রণত মুখোপাধ্যায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, শেখ সিরাজ।

খেলাধুলার জগতে তেলিনীপাড়ার শর্মা পরিবারের অবদান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। রবীন শর্মা কলকাতার প্রথম বিভাগে ফুটবল খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি মোহনবাগানেও খেলাধুলা করতেন। এছাড়া রথীন শর্মা, মণি শর্মা, ফণি শর্মা ও গৌতম শর্মা সকলেই নামী ফুটবলার ছিলেন।

তাঁতীপাড়া হা ডু ডু ক্লাবের মীরা দাস রাজ্যদলের হয়ে কবাডি খেলার যোগ্যতা অর্জন করে অঞ্চলের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন।

তেলিনীপাড়া অন্নপূর্ণা বয়েজ ক্লাবের প্রদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ বটব্যাল ও শম্ভু মিত্র হুগলী জেলা তথা পশ্চিমবাংলার কৃতী ভলিবল খেলোয়াড় ছিলেন। পরবর্তীকালে প্রদীপ বটব্যাল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।

জিমন্যাস্টিক বিভাগে উদয়ন ব্যায়াম সমিতির ক্রীড়াবিদ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য ও জাতীয় রেলদলের হয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় রেলদলের কোচ। তাঁর কোচিংয়ে ভারতীয় রেলদল পরপর সাতবার চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়া উদয়ন ব্যায়াম সমিতির নিম্নলিখিত ক্রীড়াবিদগণ জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বহু পদক পেয়েছেন। এঁরা হলেন রবিশঙ্কর দেবনাথ,

স্বপন বড়াল, তরুণ নো, অরুণ নো, তপন নো, সমর ঘোষ, গৌতম ভারতী, সন্টুচরণ দাস, নাজির হোসেন, গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেফালী মজুমদার, রীণা প্রামাণিক ও দীপঙ্কর সেন।

ভদ্রেশ্বর তরুণ সংঘের বেবি দাস ও ভদ্রেশ্বরের শিপ্রা ভারতী জাতীয় জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় পদক অর্জন করেছেন।

মহিলা ভলিবল খেলোয়াড়—অন্নপূর্ণা বয়েজ ক্লাবের বালিকা বিভাগে তেলিনীপাড়ার দুলাল দাসের দুই কন্যা (বড় মুনি ও ছোট মুনি), শিশির চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা রুপা চট্টোপাধ্যায় ও দাশরথি ঘোষের কন্যা শিখা ঘোষ আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতায় হুগলী জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন।

তেলিনীপাড়া অঞ্চলে ভালো টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ভট্টাচার্য, সন্তোষ দাস, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন—"সবুজ সমিতির" খেলোয়াড়বৃন্দ ও ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশুপতি মুখোপাধ্যায়, অনাথ চট্টোপাধ্যায় ও প্রভাত চট্টোপাধ্যায়।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২	২৫	লেকেরা	লোকেরা
৪২	২৩	পৃষ্ঠাপোষক	পৃষ্ঠপোষক
১০৩	১২	শ্যামাদাস	শ্যামদাস
১২২	২৬	Bengali	Bengal
১৫০	৭	আবাস্হল	আবাসস্হল
১৭৫	২৪	গমমাগমনের	গমনাগমনের
১৭৬	১৮	সৈনানিবাসে	সেনানিবাসে
২০০	৩	লখদ	দখল

সহায়ক গ্রন্থ

বৃহৎ বঙ্গ ১ম, ২য় খন্ড … দীনেশচন্দ্র সেন

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য … ,,

রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর … হরিহর শেঠ

সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয় … ,,

মুক্তিসাধনায় চন্দননগর … ,,

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়
কথায় ও চিত্রে … ,,

সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু উপনিবেশ … ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

বাঙালীর ইতিহাস ১ম, ২য়, ৩য় খন্ড … নীহাররঞ্জন রায়

বেনের মেয়ে … হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

হুতোম প্যাঁচার নকসা … কালীপ্রসন্ন সিংহ

আত্মচরিত … রাজনারায়ণ বসু

আলালের ঘরের দুলাল … প্যারীচাঁদ মিত্র

পুরাতন প্রসঙ্গ … বিপিনবিহারী গুপ্ত

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন
বঙ্গসমাজ … শিবনাথ শাস্ত্রী

জাল প্রতাপচাঁদ … সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গাধিপ পরাজয় … প্রতাপচন্দ্র ঘোষ

যশোর খুলনার ইতিহাস ১ম, ২য় … সতীশচন্দ্র মিত্র

হুগলী জেলার ইতিহাস ১ম, ২য়, ৩য় … সুধীরকুমার মিত্র

হুগলী জেলার দেবদেউল … ,,

হুগলী হাওড়ার ইতিহাস …

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব … বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা—ভবতোষ দত্ত

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি	...	বিনয় ঘোষ
বঙ্গের বীর সন্তান	...	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
সংবাদপত্রে সেকালের কথা	..	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী	...	অতুল সুর
সদ্‌গোপ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য	...	,,
রক্তবিপ্লবের এক অধ্যায়	...	নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নির্বাসিতের আত্মকথা	...	উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বারকানাথ ঠাকুর	...	কৃষ্ণ কৃপলানী
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	অজিত কুমার ঠাকুর
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ	...	সুশীল রায়
রবিজীবনী ২য়, ৩য় খন্ড	...	প্রশান্ত কুমার পাল
আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ	...	রানী চন্দ
কবিমানসী	...	জগদীশ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী	...	পুলিনবিহারী সেন
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি	...	সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ৪র্থ খন্ড	...	অশোক মিত্র
আত্মীয়সভার কথা	...	প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
মোহান্ত এলোকেশী সম্বাদ	...	শ্রীপান্থ
দেবদাসী	...	,,
মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস	...	আশুতোষ ভট্টাচার্য
প্রাচীন ভারতের পথপরিচয়	...	ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়
উত্তর ২৪ পরগণার ইতিবৃত্ত	...	কমল চৌধুরী
দক্ষিণ ২৪ পরগণার ইতিবৃত্ত	...	,,
নদীয়ার সমাজচিত্র	...	মোহিত রায়
শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত	...	
বর্ধমান পরিচিতি	...	নারায়ণ চৌধুরী
শালিখার ইতিবৃত্ত	...	হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘাটালের কথা	...	পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ ও প্রণব রায়

তীর্থপথিক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ১-৪ খন্ড ···· ভূপতিরঞ্জন দাস
ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা ···· সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজসভার কবি ও কাব্য ···· দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গপ্রসঙ্গ—প্রথম বিদেশী নীলকর ···· চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী) ···· সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়
প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় ···· গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
বাংলায় ভ্রমণ ১ম, ২য় খন্ড ···· ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথ কর্তৃক প্রকাশিত।
বন্দর কাশিমবাজার ···· সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
দক্ষিণ ২৪ পরগণার অতীত ১ম, ২য় খন্ড ···· কালিদাস দত্ত
বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস ···· স্বপন বসু
বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি ···· ডঃ আশা দাস
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ···· তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
শাশ্বত কলকাতা—গঙ্গার ঘাট ···· রথীন মিত্র
শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদগণ ···· গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
সতীদাহ ····
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ও গরিফা ··· দীপ্তিময় রায়
গ্রামবাংলার মেলা ও উৎসব ···· শক্তিসাধন রায়
শ্রীচৈতন্যাষ্টক ···· প্রভাত মুখোপাধ্যায়
চৈতন্যচন্দ্রোদয় ···· কবি কর্ণপুর
চৈতন্যভাগবত ···· বৃন্দাবন দাস
চৈতন্যচরিতামৃত ···· ঐ
চৈতন্যমঙ্গল ···· জয়ানন্দ
চণ্ডীমঙ্গল ···· মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
মনসামঙ্গল ···· বিপ্রদাস পিপলাই
রামচরিত ···· সন্ধ্যাকর নন্দী

প্রাচীন রাজমালা … রামপ্রাণ গুপ্ত

স্বামী অভয়ানন্দগিরি মহারাজের জীবন ও সাধনা … সম্পাঃ ধীরেন মুখোপাধ্যায়

সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও কর্ম … স্মৃতিরক্ষা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

ইতিহাস অনুসন্ধান ৩য় খন্ড

প্রবন্ধ—শ্রীখন্ডের দেবদেবী … হিতেশরঞ্জন সান্যাল

৪র্থ খন্ড

প্রবন্ধ—গোহত্যা-তেলিনীপাড়ার শ্রমিক ও ভদ্রলোক … মৃণালকুমার বসু

প্রবন্ধ—গঙ্গাতীরের শহর একটি প্রাথমিক আলোচনা …

প্রবন্ধ—ষোড়শ ও সপ্তদশশতকে ইউরোপীয় বাণিজ্য ও বাংলার পণ্য … অনিল দাস

চর্যাপদ (হাজার বছরের পুরানো বৌদ্ধ গান ও দোঁহা) … ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

চুরাশী সিদ্ধার কাহিনী … অলকা চট্টোপাধ্যায়

দ্বারকানাথ ঠাকুর … কিশোরীচাঁদ মিত্র

রাজা রামমোহন … রমেশচন্দ্র মজুমদার

বাংলা পীর সাহিত্যের কথা … ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম, ২য় … ডঃ সুকুমার সেন

ভূমি রাজস্ব ও জরীপ … টোডরমল (ছদ্মনাম)

শ্রীচৈতন্যের শিষ্য ব্যবহার … বীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার

বাংলা সাহিত্যে বঙ্গেতর ভারত … বরুণকুমার চক্রবর্তী

শান্তিপুর পরিচয় … কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

নদীয়া কাহিনী … কুমুদনাথ মল্লিক

বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি … যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

গঙ্গারিডি বঙ্গভূমি ... ডঃ প্রভাতকুমার ঘোষ
বাংলার ইতিহাসের দুশ' বছর ... সুখময় মুখোপাধ্যায়
রামগোপাল ঘোষ ঃ জীবন ও সাধনা ... বারিদবরণ ঘোষ
প্রাচীন ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য ... তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
আরামবাগের ইতিকথা ... চুণীলাল বসু
হাওড়া জেলার ইতিহাস ... অচল ভট্টাচার্য
সেকালের স্মৃতি ... দীনেন্দ্রকুমার রায়

History of Bengal, Bihar and Orissa under British Rule ... O'Malley
Decesive Battle of India ... Malcome
Changing Face of Bengal ... Radha Kamal Mukhopadhayay
History of Bengal ... Stewart
A History of South-East Asia... D. G. E. Hall
A Bengal Zamindar ... Nilmony Mukherjee
The Salt Industry of Bengal 1757—1800 ... Balai Barui
A Note on a trading Family of Mofussil Bengal—The Khans of Mankundu ... Mrinal K. Basu
Bengal National Chamber of Commerce ... Platinum Jubilee Volume—1962
The Good Old Days of Honorable John Company ... W. H. Carey
Chaitanya and his age ... Dinesh Ch. Sen
West Bengal District Gazetteers, Hooghly ... Amiya K. Banerjee
Mogh Raiders in Bengal ... Jamini Mohan Ghosh

পত্রপত্রিকা ও স্মারকপুস্তিকা

সন্দীপন, হুগলী জেলা সংখ্যা ১৩৮৮—সম্পাঃ কাশীনাথ ঘোষ

সাহিত্যসেতু, হুগলী জেলা পৌরসংখ্যা ১৩৯৭—সম্পাঃ জগবন্ধু কুণ্ডু, অমিয় নন্দী

গোধূলি মন, নভেম্বর ১৯৯৩—বিপ্লবী বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাঃ অশোক চট্টোপাধ্যায় বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

,, মার্চ ১৯৯১—ফেব্রুঃ ১৯৯২—তেলিনীপাড়ার শিল্প ও সঙ্গীতচর্চা—সম্রাট সেন

,, মার্চ-এপ্রিল ১৯৯৩—সম্রাট সেন স্মরণ সংখ্যা

,, নভেম্বর ১৯৯৩—ফেব্রুঃ ১৯৯৪—রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর অঞ্চল—অধ্যাপক শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গোধূলি, শ্রাবণ ১৩৭৭—লালকুঠিতে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা —সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাপ্তাহিক বর্তমান, অক্টোবর '৯৩—অ্যাণ্টনি কবিয়ালের দুর্গোৎসব —রাধারমণ রায়

আজকাল—বাংলার মেঠাই—প্রতিবেদন—সমীরণ মুখোপাধ্যায়

কেয়া, আশ্বিন ১৩৯০—দশভুজা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক, তৃতীয় বর্ষ, ৩য় ৪র্থ সংখ্যা –ফরাসডাঙার তাঁতশিল্প —দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৮৬—আকবর আলি—দেবাশিস ভট্টাচার্য

উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার ১২৫তম বর্ষ স্মরণিকা

তেলিনীপাড়া তাঁতীপাড়া হাডুডু ক্লাব স্মারক পুস্তিকা

হীরক জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, অন্নপূর্ণা পুস্তকাগার

সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পুস্তিকা, মানকুণ্ডু ফ্রি প্রাইমারী স্কুল

,, , বিস প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেলিনীপাড়া

শতবার্ষিকী উৎসব স্মারক পুস্তিকা, তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়
শতবার্ষিকী স্মারক পুস্তিকা, ভদ্রেশ্বর পুরসভা
আমাদের পৌরসভা (ভদ্রেশ্বর)—সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" " —দেবগোপাল চক্রবর্তী
অন্নপূর্ণা মন্দির স্মারক পুস্তিকা -সম্পাঃ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিশতবার্ষিক স্মারক পুস্তিকা, ভদ্রেশ্বর তেঁতুলতলা জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি
ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাথলেটিক ক্লাব (তেলিনীপাড়া) স্মারক পুস্তিকা
উন্মেষ, তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় পত্রিকা ১৯৬০-৬১
রজত জয়ন্তী সংখ্যা, টাকী রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়
রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, এপ্রিল ১৯৮৬—আমার ছেলেবেলা
—হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
" মে ১৯৮৫—আমার ছেলেবেলা
—রামকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভ্রমণবার্তা, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যা
ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাব টাউন লাইব্রেরী, ভদ্রেশ্বর—প্রতিবেদন
রাজকৃষ্ণ দাতব্য চিকিৎসালয়, সম্পাদকীয় বিবৃতি
—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডাঃ সুশীল মুখোপাধ্যায় স্মৃতিসমিতি, সম্পাদকীয় বিবৃতি
—সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়—কার্যবিবরণী ১৯৮০
বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন—রবীন্দ্রনাথের ভাষণ
The Report of Dr. Sushil Kumar Mukherjee Memorial Committee,—Secy. Saral K. Banerje
Hooghly District Teachers' Conference—Presidential Address by Dr. Sushil K. Mukherjee
Report—Director of Land Records and Surveys, West Bengal

তথ্য সংগ্রহের সূত্র : দলিলপত্রাদি

বিক্রয়পত্র—ইং ১৮২১ খ্রীঃ—ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক ক্রীত,
তেলিনীপাড়া

বিষয় বণ্টনপত্র—ইং ১৮২৩ খ্রীঃ—ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণ ও
শম্ভুচন্দ্র তর্কপঞ্চানন।
দলিলের সাক্ষী রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়,
তেলিনীপাড়া

বিক্রয়পত্র—ইং ১৮৩৬ খ্রীঃ—বিক্রেতা হরিমোহন পাঠক, তেলিনীপাড়া

আপোষ বণ্টনপত্র—ইং ১৮৪১ খ্রীঃ—রামেশ্বর ন্যায়রত্ন,
ভৈরবচন্দ্র তর্কবাচস্পতি ও
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, তেলিনীপাড়া

পাট্টাপত্র—ইং ১৮৪৩ খ্রীঃ—দাতা দিগম্বরী দেবী
গ্রহীতা জাদুমণি দেবী ও স্পর্শমণি দেবী
তেলিনীপাড়া

পাট্টাপত্র—ইং ১৮৪৪ খ্রীঃ—দাতা দিগম্বরী দেবী
গ্রহীতা জাদুমণি দেবী ও স্পর্শমণি দেবী
তেলিনীপাড়া

ফারখত ও একরারনামা—ইং ১৮৫০ খ্রীঃ—দাতা ভৈরবচন্দ্র খাঁ, মানকুণ্ডু

Report 1878 From—R. B. Bishayi
Special Deputy Collector,
Hooghly
To—Rameswar Khan and
others, Mankundu

একরারনামা—ইং ১৮৮৫ খ্রীঃ—দাতা রামেশ্বর খাঁ ও অন্যান্যরা, মানকুণ্ডা

Debottar Enquiry Report—1967

—By Officer-on-Special Duty
Director of Land Records and
Surveys, Calcutta, W. B.

পর্চা—ইং ১৯৩৪--৩৫ খ্রীঃ—জগন্নাথ দেব ও ওলাইচণ্ডী মাতা ঠাকুরানীর
দেবোত্তর সম্পত্তি পালপাড়া / চণ্ডীতলা
—মানকুণ্ডু

মেয়াদী পাট্টাপত্র—ইং ১৮৬৭ খ্রীঃ—কৃষ্ণচন্দ্র বাগ, কৃষ্ণপটী, মানকুণ্ডা

ঠিকা পাট্টাপত্র—ইং ১৮৬৯ খ্রীঃ—কৃষ্ণমোহন বাগ, কৃষ্ণপটী

ঠিকা পাট্টাপত্র—ইং ১৮৭৩ খ্রীঃ—মাধবচন্দ্র বাগ / কৃষ্ণচন্দ্র বাগ
বাগপাড়া, কৃষ্ণপটী

এওজ নামাপত্র—ইং ১৮৯৩ খ্রীঃ—কালীচরণ বাগ, কৃষ্ণপটী

হস্তলিখিত প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার

তেলিনীপাড়া

সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের ডায়েরী
(প্রণতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পাঁচু সাধুখাঁ
ভগবানদাস গুপ্তা
তেলিনীপাড়া বড় মসজিদের ইমাম
কাশীনাথ দে
সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
নীলমনি কোলে (চন্দননগর)
প্রীতম বন্দ্যোপাধ্যায়
শুভাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়
ক্ষেত্রপদ নন্দী
পরেশনাথ আদক (চন্দননগর)
অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যয়ে
সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
কল্যাণ চক্রবর্তী
ভূপতি ঘোষ
অমল চট্টোপাধ্যায়
প্রভাত চট্টোপাধ্যায়
অরুণ মুখোপাধ্যায় (চন্দননগর)
হরিপদ মুখোপাধ্যায় ,,
ডঃ সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
সম্পাদক—মিঃ টাউন লাইব্রেরী তেলিনীপাড়া

ভদ্রেশ্বর

শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়
ধর্মদাস ঘোষ
রাধানাথ নিয়োগী
দেবতোষ সেনগুপ্ত
অজয় বসু
সন্দীপকুমার মণ্ডল
সম্পাদক—রবিচক্র
,, —ভবানী সংঘ
,, —ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাব
ভূপতি ঘোষ

মানকুণ্ডু / পালপাড়া / চণ্ডীতলা / কৃষ্ণপটী

শঙ্করনাথ মুখোপাধ্যায়

ভবতোষ পাল

কানাইলাল দাস

সুশীল মুখোপাধ্যায়

ভূপালচন্দ্র বাগ

ধীরেন্দ্রনাথ পাল

মানিকলাল মুখোপাধ্যায়

সুরেশচন্দ্র খাঁ

হারাধন পাল

তপন সাহা

সুনীতিকুমার ভট্টাচার্য

নীরদবরণ মুখোপাধ্যায়

শম্ভুরাম ঘোষ